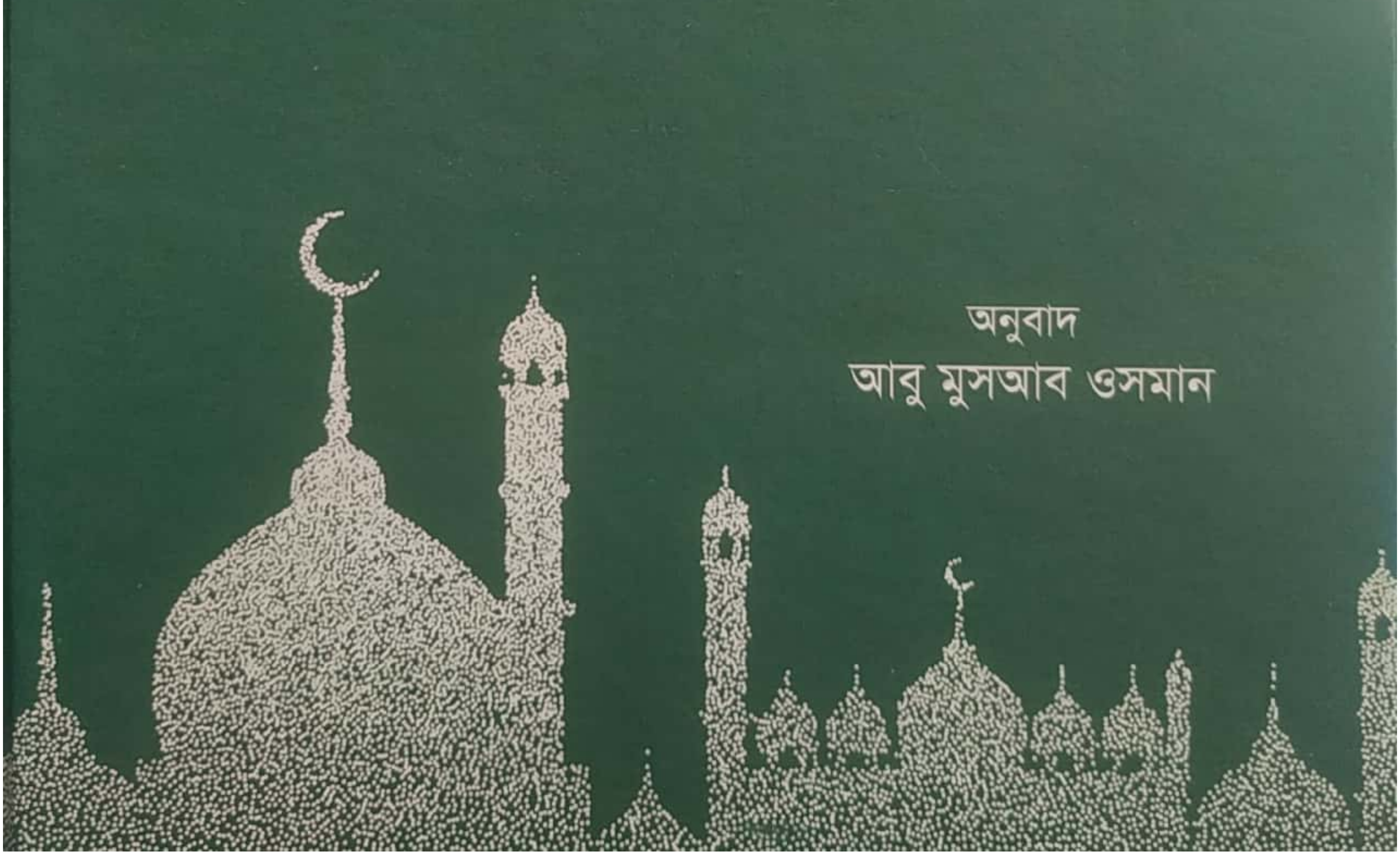
২য়
খণ্ড

ইসলামপূর্ব যুগ থেকে নিকট অতীত

ইসলামি ইতিহাস

সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ

অনুবাদ
আবু মুসআব ওসমান



ইসলামি ইতিহাস

সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ

ইসলামি ইতিহাস

সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ

[ইসলামপূর্ব যুগ থেকে নিকট অতীত]

দ্বিতীয় খণ্ড

অনুবাদ

আবু মুসআব ওসমান

মাকতাবাতুল হাসান

ইসলামি ইতিহাস সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ (২য় খণ্ড)

প্রথম প্রকাশ : মহাররম-১৪৪১/সেপ্টেম্বর-২০১৯

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশ

প্রকাশনায়

মাকতাবাতুল হাসান

গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স

৩৭ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা

✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০

মুদ্রণ : শাহরিয়ার প্রিন্টার্স, ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা

অনলাইন পরিবেশক

rokomari.com - niyamahshop.com - wafilife.

ISBN : 978-984-8012-60-4

Web : maktabatulhasan.com

মূল্য : ৩১০০/- টাকা মাত্র [৫ খণ্ড একত্রে]

Islami Itihash Sonkhipto Bissokosh (2nd Part)

Published by : Maktabatul Hasan. Bangladesh

E-mail : rakib1203@gmail.com Facebook/maktabahasan

* * *

مَلَكْنَا فَكَانَ الْعَفْوُ مِنَّا سَجِيَّةً ❋ فَلَمَّا مَلَكْتُمْ سَالَ بِالدَّمِ أَبْطَحُ

وَحَلَّلْتُمُ قَتْلَ الْأُسَارَى وَطَالَمَا ❋ غَدَوْنَا عَلَى الْأَسْرَى نَعْفُوْ وَنَصْفَحُ

فَحَسْبُكُمُ هٰذا التَّفَاوُتُ بَيْنَنَا ❋ وَكُلُّ إِنَاءٍ بِالَّذِيْ فِيْهِ يَنْضَحُ

আমরা যখন শাসন করেছি, সুবিচার ছিল আমাদের ভূষণ; তোমরা যখন ক্ষমতা পেলে, বয়েছে রক্তের অবাধ প্রস্রবণ!

বন্দিহত্যা বৈধ-কর্ম এটাই বুঝি তোমাদের শিক্ষা; বন্দির প্রতি ক্ষমা-অনুগ্রহ, এটাই মোদের ধর্মের দীক্ষা।

আচরণের এ পার্থক্যই পরিচয়-বৈশিষ্ট্য আমাদের-তোমাদের; ব্যবহারেই বংশপরিচয়, ফল-ফসলে পরিচয় বৃক্ষের।

* * *

—— সংক্ষিপ্ত সূচি ——

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তুর্কি সেলজুক পরিবার-নিয়ন্ত্রিত আব্বাসি খলিফাগণের বিবরণ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তাতারদের আগ্রাসন চলাকালীন আব্বাসি খলিফাগণের বিবরণ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

তাতারদের হাতে বাগদাদের পতন পরবর্তী সময়ে মিশরকেন্দ্রিক আব্বাসি খলিফাগণের বিবরণ

সূচিপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

তৃতীয় অধ্যায়
উমাইয়া খিলাফত

প্রথম পরিচ্ছেদ-২৩
বনু উমাইয়ার খলিফাগণের বিবরণ

বিষয় পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ-৯৫

বনু উমাইয়ার শাসনামলে ইসলামি বিজয়াভিযান

পরিশিষ্ট-১৫৫

শিয়া সম্প্রদায়ের পরিচিতি

চতুর্থ অধ্যায়
আব্বাসি খিলাফত

পূর্বাভাস

প্রথম পরিচ্ছেদ-১৭৫
প্রতাপ ও সমৃদ্ধির আমলের আব্বাসি খলিফাগণের বিবরণ

বিষয় পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ-২৬৩

তুর্কিদের প্রত্যক্ষ প্রভাব-নিয়ন্ত্রিত আব্বাসি খলিফাগণের বিবরণ

বিষয় পৃষ্ঠা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ-৩১৩

তুর্কি সেলজুক পরিবার-নিয়ন্ত্রিত আব্বাসি খলিফাগণের বিবরণ

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ-৩৭৩

তাতারদের হাতে বাগদাদের পতন-পরবর্তী সময়ের মিশরকেন্দ্রিক আব্বাসি খলিফাগণের বিবরণ

বিষয় পৃষ্ঠা

মানচিত্র সূচি

দ্রষ্টব্য সূচি

তৃতীয় অধ্যায়

উমাইয়া খিলাফত

[রবিউল আউয়াল ৪১—জুমাদাল উখরা ১৩২ হিজরি]

[জুলাই ৬৬১—জানুয়ারি ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ]

* * *

«خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ،

ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ»

সর্বোত্তম হলো আমার যুগের লোকেরা। এরপর তাদের নিকটবর্তী যুগের লোকেরা, তারপর তাদের নিকটবর্তী যুগের লোকেরা।[১]

* * *

প্রথম পরিচ্ছেদ

বনু উমাইয়ার খলিফাগণের বিবরণ

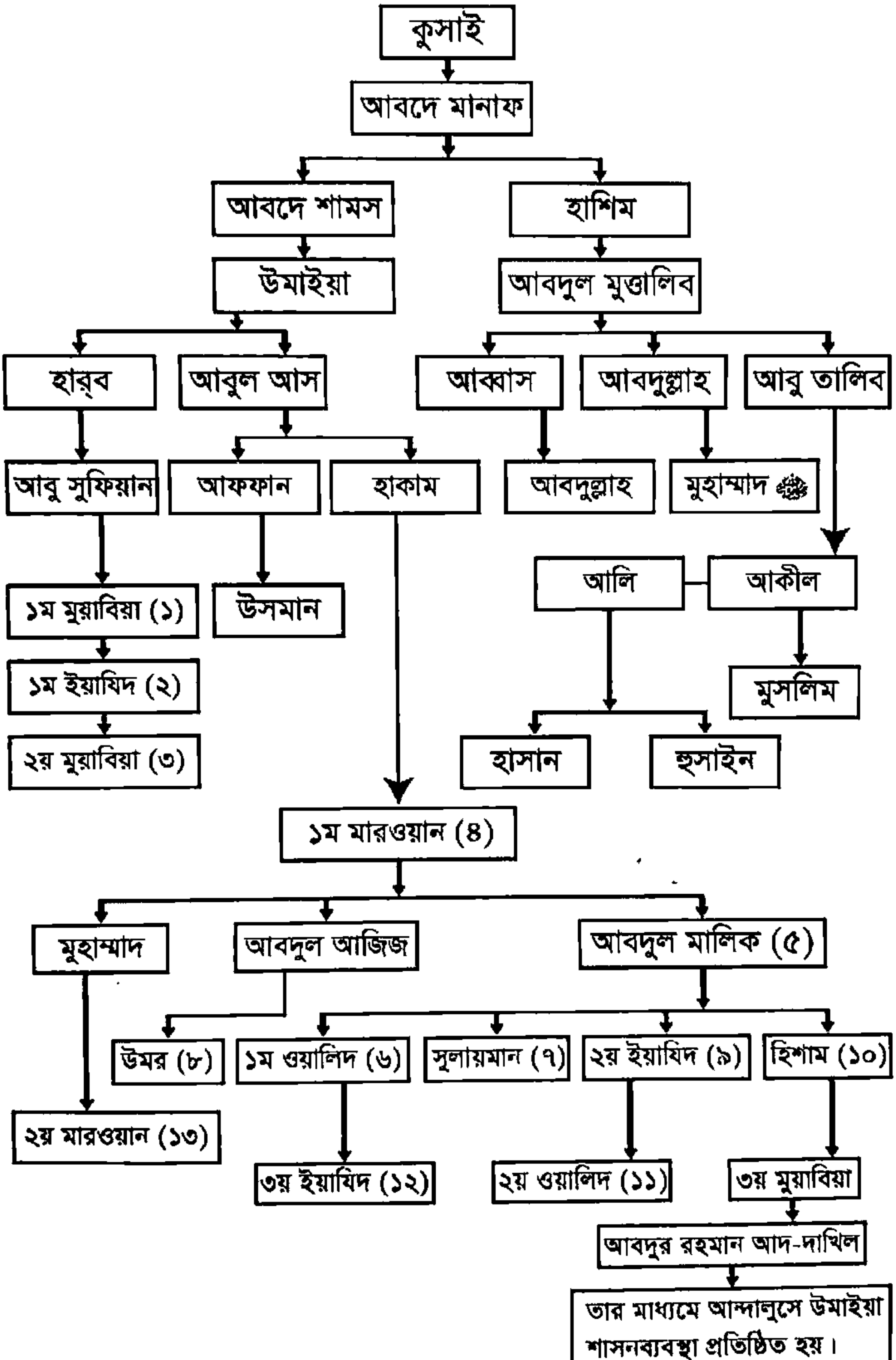
ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন রহ. বলেন,

> হজরত মুয়াবিয়া রাযি.-এর শাসনব্যবস্থা ও ইতিহাসকে খোলাফায়ে রাশিদিনের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করা উচিত। কেননা, কর্ম ও কীর্তি, ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা এবং নবীসংস্পর্শের ক্ষেত্রে তিনি খোলাফায়ে রাশেদিনেরই স্বার্থক অনুসারী ছিলেন।

শায়খ খিযরি বেক রহ. বলেন,

> উপর্যুপরি দুর্যোগ, বিদ্রোহ ও ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েও উমাইয়া সাম্রাজ্য অতি সীমিত সময় বাদে কখনোই সমকালীন অন্যান্য সাম্রাজ্যের সামনে দুর্বল প্রতিপন্ন হয়নি। নিঃসন্দেহে এটি এই সুমহান ও শক্তিশালী সাম্রাজ্যের ইতিহাসে অতি বিস্ময়কর একটি বিষয়।

বনু উমাইয়ার খলিফাগণের বংশধারা বুঝতে সহায়ক কুরাইশ বংশলতিকা



[দ্রষ্টব্য: বন্ধনীতে খলিফাগণের ক্রমধারা উল্লেখ করা হয়েছে]

১ নং উমাইয়া খলিফা

হজরত মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান রাযি.

[রবিউল আউয়াল ৪১ হিজরি—রজব ৬০ হিজরি]
[জুলাই ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ—এপ্রিল ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দ]

হজরত মুয়াবিয়া রাযি.-এর বংশপরিচয় ও কিছু গুণ-বৈশিষ্ট্য

❖ হজরত মুয়াবিয়া রাযি. প্রসিদ্ধ মতানুসারে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তপ্রাপ্তির পাঁচ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। তার উপনাম আবু আবদুর রহমান। পিতার দিক থেকে তার বংশপরম্পরা নিম্নরূপ—

মুয়াবিয়া বিন সখর (আবু সুফিয়ান) বিন হারব বিন উমাইয়া বিন আবদে শামস বিন আবদে মানাফ বিন কুসাই...।

আবদে মানাফ পর্যন্ত এসে তার বংশপরম্পরা নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশপরম্পরার সঙ্গে মিলে গেছে।

❖ হজরত মুয়াবিয়া রাযি. ইসলাম গ্রহণ করেন মক্কা বিজয়ের বছর। তার পিতা আবু সুফিয়ান রাযি. ও মাতা হিন্দা রাযি. তার পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। মুয়াবিয়া রাযি. নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংস্পর্শ লাভ করেছেন এবং নবীজির নির্দেশে ওহি লিপিকারের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি নবীজি হতে একশ তেষট্টিটি হাদিস বর্ণনা করেছেন।

❖ নবীজি একদিন মুয়াবিয়া রাযি.-এর জন্য দোয়া করে বলেন—

«اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا، وَاهْدِ بِهِ»

হে আল্লাহ, তাকে সত্যের পথপ্রদর্শক ও সুপথপ্রাপ্ত বানান এবং তার মাধ্যমে অন্যদেরকেও হিদায়াত দান করুন।[২]

❖ ১৯ হিজরি সনে তার ভাই ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ানের মৃত্যু হলে তৎকালীন খলিফা উমর রাযি. তাকে দামেশকের গভর্নরের দায়িত্ব প্রদান করেন। তখন থেকে নিয়ে উমর রাযি. খিলাফতকালের বাকি অংশ, তৃতীয় খলিফা হজরত উসমান রাযি.-এর পুরো খিলাফতকাল এবং চতুর্থ খলিফা হজরত আলি রাযি. ও হজরত হাসান রাযি.-এর সঙ্গে সংঘাতের সময়কালে তিনি দামেশকের গভর্নর পদে বহাল ছিলেন। অবশেষে ৪১ হিজরি সনে সকলের ঐকমত্যে তিনি ইসলামি সাম্রাজ্যের খলিফা নির্বাচিত হন। সুতরাং গভর্নর ও খলিফাপদ মিলিয়ে তার নেতৃত্বদানের সময়কাল একটানা চল্লিশ বছরেরও বেশি।

❖ হজরত মুয়াবিয়া রাযি.-ই ইসলামি নৌবহরের প্রতিষ্ঠাতা। তৃতীয় খলিফা উসমান রাযি.-এর খিলাফতকালে তিনি এই নৌবহর প্রতিষ্ঠা করেন।

❖ বিশুদ্ধ বর্ণনামতে হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি. তার ফিকহি প্রজ্ঞার স্বীকৃতি দিয়েছেন। ইমাম বুখারি রহ. আপন সনদে হজরত ইবনে আবি মুলায়কা রাযি. হতে উল্লেখ করেছেন—হজরত মুয়াবিয়া রাযি. এশার নামাজের পর এক রাকাত বিতির নামাজ আদায় করলেন। তখন সেখানে ইবনে আব্বাস রাযি.-এর জনৈক ক্রীতদাস উপস্থিত ছিল। সে ইবনে আব্বাস রাযি.-কে বিষয়টি অবগত করলে ইবনে আব্বাস রাযি. উত্তর দিলেন, 'তাকে কিছু বলো না। কেননা, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংস্পর্শ লাভ করেছেন।'[৩] বুখারি শরিফের আরেক বর্ণনায় উল্লেখ আছে—ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, 'কেননা, তিনি (মুয়াবিয়া) তো ফকিহ।'[৪]

---

২. *সুনানে তিরমিজি*, হাদিস নং ৩৮৪২।

৩. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৩৭৬৪।

৪. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৩৭৬৫।

হজরত মুয়াবিয়া রাযি. খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর ধীরে ধীরে পরিস্থিতি অনুকূল হতে থাকে এবং সমকালীন মুসলিম বিশ্বে নতুন করে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়। তার বিরোধীরাও তার হাতে বায়আত গ্রহণ করে এবং তার খিলাফতের ওপর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, সে সময় হজরত মুয়াবিয়া রাযি.-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও ইসলাম গ্রহণে অগ্রবর্তী অনেক সাহাবি বিদ্যমান ছিলেন। যেমন, সাদ বিন আবু ওয়াককাস রাযি., আবদুল্লাহ বিন উমর রাযি.। বিষয়টি মুয়াবিয়া রাযি. নিজেও অস্বীকার করতেন না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তার একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। জনসাধারণের সামনে প্রদত্ত এক ভাষণে তিনি বিষয়টি সুস্পষ্ট করেছেন। তিনি বলেছেন, 'হে লোকসকল, আমি তোমাদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ নই। নিঃসন্দেহে অনেকেই আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। যেমন, আবদুল্লাহ বিন উমর, আবদুল্লাহ বিন আমর প্রমুখ। কিন্তু সম্ভবত নেতৃত্বদানে আমি তোমাদের মাঝে সবচেয়ে কল্যাণকর বিবেচিত হব এবং তোমাদের শত্রুদের চোখে আমি সবচেয়ে অনিষ্টকর বিবেচিত হব।'

উম্মাহর বিদগ্ধ ও গবেষক আলিমগণ এ বিষয়ে একমত যে, শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি বিদ্যমান থাকা অবস্থায়ও তার তুলনায় নিম্নতম ব্যক্তির ইমামত ও নেতৃত্ব বৈধ এবং তার নামে বায়আত গ্রহণ করা শুদ্ধ। তারা এ বিষয়েও একমত যে, শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির উপস্থিতি নিম্নতম ব্যক্তির নেতৃত্বের জন্য অন্তরায় নয়, যদি উক্ত ব্যক্তির মাঝে নেতৃত্বের যাবতীয় শর্ত বিদ্যমান থাকে। অধিকন্তু গুণ-কীর্তির আধিক্য ইমাম ও খলিফা নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারে; কিন্তু কিছুতেই তা নেতৃত্বলাভের মৌলিক শর্তের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর এটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয় যে, হজরত মুয়াবিয়া রাযি. ছিলেন সুমহান এক সাহাবি, যার ব্যক্তিত্বে নানাবিধ বৈশিষ্ট্য-গুণের সমাবেশ ঘটেছিল। যেমন : দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর রাযি. তার খিলাফত-আমলে ইসলামি রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন অঞ্চলে গভর্নরের দায়িত্ব পালনের জন্য সমকালীন মুসলিম জামাতের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিদের নির্বাচন করেছিলেন। এ ক্ষেত্রে তিনি হজরত মুয়াবিয়া রাযি.-কে তার বিভিন্ন গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কারণে বিশেষভাবে নির্বাচন করেছিলেন। কারণ, মুয়াবিয়া রাযি.-এর উন্নত চরিত্র, ইসলামি রাষ্ট্রের সীমান্ত প্রহরা ও সীমানা-রক্ষায় তার প্রশংসনীয় ভূমিকা, সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা রক্ষা ও শত্রুর

মোকাবিলায় তার সবিশেষ দক্ষতা এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ প্রশাসন ও রাজনীতিজ্ঞান খলিফা উমর রাযি.-এর দৃষ্টি আকর্ষণে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. *'মিনহাজুস সুন্নাহ'* গ্রন্থে লিখেছেন—

> ইসলামি ইতিহাসে (খোলাফায়ে রাশিদিন-পরবর্তী যুগে) হজরত মুয়াবিয়া রাযি.-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো শাসক নেই। প্রজাদের সঙ্গে তার আচরণ ছিল শাসকের সদাচরণের শ্রেষ্ঠতম উদাহরণ। জনগণও তাকে ভালোবাসত। আর নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,
>
> «خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُحِبُّوْنَهُمْ وَيُحِبُّوْنَكُمْ، وَيُصَلُّوْنَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّوْنَ عَلَيْهِمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُبْغِضُوْنَهُمْ وَيُبْغِضُوْنَكُمْ، وَتَلْعَنُوْنَهُمْ وَيَلْعَنُوْنَكُمْ»
>
> তোমাদের সর্বোত্তম নেতা ও শাসক তারা, যাদেরকে তোমরা ভালোবাসো, আর তারাও তোমাদেরকে ভালোবাসে। তারা তোমাদের জন্য দোয়া করে, তোমরাও তাদের জন্য দোয়া করো। আর তোমাদের নিকৃষ্ট নেতা হচ্ছে তারা, যাদেরকে তোমরা ঘৃণা করো, তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে। তোমরা তাদেরকে অভিশাপ দাও আর তারাও তোমাদেরকে অভিসম্পাত করে।[৫]

ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন রহ. *'তারিখে ইবনে খালদুন'* গ্রন্থে লিখেছেন—

> হজরত মুয়াবিয়া রাযি.-এর শাসনব্যবস্থা ও ইতিহাসকে খোলাফায়ে রাশিদিনের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করা উচিত। কেননা, কর্ম ও কীর্তি, ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা এবং নবীসংস্পর্শের ক্ষেত্রে তিনি খোলাফায়ে রাশিদিনেরই স্বার্থক অনুগামী ছিলেন।[৬]

হজরত মুয়াবিয়া রাযি. সম্পর্কে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর কয়েকজন মনীষীর পর্যালোচনা উল্লেখ করার পর এবার আমরা মূল আলোচনায়

---

৫. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ১৮৫৫।

৬. ইবনে খালদুন, *তারিখে ইবনে খালদুন*, ২/৬৫০।

প্রবেশ করছি। উম্মাহর বৃহত্তর স্বার্থে হজরত হাসান রাযি. হজরত মুয়াবিয়া রাযি.-এর হাতে খিলাফতের দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার পর সর্বসম্মতিক্রমে হজরত মুয়াবিয়া রাযি.-এর নামে খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করা হয় এবং মুসলিম সমাজে চলমান অস্থিতিশীল পরিস্থিতির অবসান ঘটে।

সমাজে পুনরায় শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা

হজরত মুয়াবিয়া রাযি.-এর খিলাফতকালে জনগণ শান্তি-নিরাপত্তার সঙ্গে নিশ্চিন্তে বসবাস করে। এ সময় মুসলমানদের সামরিক শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পায় এবং বিজয়াভিযানের ধারা বেগবান, গতিশীল ও বিস্তৃত হয়। অবশ্য কুফা, বসরা ও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য এলাকাসহ ইরাক অঞ্চল তখনও ছিল ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ। ইরাকের অধিবাসীগণ বারবার বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলা ও ফিতনা সৃষ্টি করে সমকালীন মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সম্প্রীতি বিনষ্ট করছিল। খলিফা কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে যখন কোনো কোমল স্বভাবের গভর্নর ইরাক অঞ্চলে আগমন করতেন, ইরাকি জনগণ তাকে তুচ্ছজ্ঞান করত এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রচেষ্টা চালাত। আর কঠোর মেজাজের কোনো গভর্নর আগমন করলে তারা তাকে ভয় ও শ্রদ্ধা করত এবং নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তার আনুগত্য করত। এ কারণেই হজরত মুগিরা বিন শুবা রাযি. এ অঞ্চলের গভর্নর থাকাকালে (৪১-৪৯ হিজরি) পরিস্থিতির দাবি অনুযায়ী আপন প্রজ্ঞা ও কৌশলের পাশাপাশি বিচক্ষণতা ও কঠোরতা ব্যবহার করেন এবং ইরাকবাসীকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হন। তার মৃত্যুর পর খলিফা মুয়াবিয়া রাযি. ৫০ হিজরি সনে যিয়াদ বিন আবু সুফিয়ানকে ইরাকের গভর্নর নিযুক্ত করেন। যিয়াদ ছিলেন স্বভাব-কঠোর একজন প্রশাসক। ইরাকবাসীর স্বভাব-প্রকৃতি সম্বন্ধে তিনি সম্যক অবগত ছিলেন। তাই গভর্নরের দায়িত্ব লাভ করার পরই তিনি জনগণের সামনে দণ্ডায়মান হয়ে তার সেই বিখ্যাত ভাষণটি প্রদান করেন, ইতিহাসে যা 'আল-বাতরা' নামে খ্যাতি লাভ করেছে। সেই ঐতিহাসিক ভাষণের চুম্বকাংশ নিম্নে তুলে ধরা হলো—

> আমার উপলব্ধি হলো তোমাদের এই পরিস্থিতির শেষাংশের সংশোধন সে পথেই হবে, যে পথে প্রথমাংশের সংশোধন হয়েছে; অর্থাৎ কোমলতা প্রদর্শন করা হবে; কিন্তু এমন কোমলতা নয়, যাতে দুর্বলতা প্রকাশ পায়, আবার কঠোরতাও করা হবে;

কিন্তু এমন কঠোরতা নয়, যাতে জুলুম ও সীমালঙ্ঘন থাকবে। আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি মনিবের কাছ থেকে ভৃত্যের, মুকিমের কাছ থেকে মুসাফিরের এবং সুস্থ ব্যক্তি হতে অসুস্থ ব্যক্তির প্রতিশোধ গ্রহণ করব। এমনকি তোমাদের কেউ যখন বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, তখন ভয়ে মুখ থেকে কেবল এই প্রবাদ বাক্যই বের হবে—

أُنْجُ يَا سَعْدُ؛ فَقَدْ هَلَكَ سَعِيْدٌ!

হে সাদ, নিজের আত্মরক্ষার চিন্তা করো; সাইদের চিন্তা বাদ দাও। সে তো নিপাত গেছে!

অথবা পরিস্থিতি এমন হবে যে, তোমাদের বর্শা আমার সামনে একেবারে সোজা হয়ে যাবে।

সাবধান! রাহাজানি-ডাকাতির কোনো সংবাদ যেন আমার কানে না আসে। কোনো ডাকাত গ্রেফতার হয়ে আমার সামনে এলে তার পরিণতি একটাই—দুনিয়া থেকে বিদায়। আমি তোমাদেরকে কেবল ততটুকু অবকাশ দেবো, যতটুকু সময়ের মধ্যে সংবাদ কুফায় পৌঁছায় এবং সেখান থেকে আবার বার্তাবাহক আমার কাছে ফিরে আসে। কারও মুখ থেকে যেন জাহিলি কোনো শ্লোগান বের না হয়। কেউ জাহিলি শ্লোগান দিলে আমি তার জিহ্বা কেটে ফেলব। তোমরা এমন সব আচরণ ও ঘটনার জন্ম দিচ্ছ, যা ইতিপূর্বে কেউ করেনি। আমিও প্রত্যেক অপরাধের জন্য যথোপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করেছি। কেউ কাউকে ডুবিয়ে মারলে আমিও তাকে ডুবিয়ে মারব। কেউ অন্যের বাড়িতে আগুন দিলে আমি তাকে আগুনে জ্বালাব। কেউ অন্যের গৃহপ্রাচীর ছিদ্র করলে আমি তার হৃৎপিণ্ড ছিদ্র করে দেবো। কেউ অন্যের জন্য কবর খনন করলে সে কবরে আমি তাকে জীবন্ত দাফন করব। নিজেদের হাত ও বচন আমার দিকে প্রসারিত করো না, আমিও আমার হাত ও শাস্তি প্রসারিত করব না। তোমাদের কারও আচরণে-উচ্চারণে সাধারণ জনগণের জীবনাচার-বিরোধী কোনও কিছু প্রকাশ পেলে আমি তার শিরশ্ছেদ করব।

লোকসকল, আমরা তোমাদের নেতা, তোমাদের নিরাপত্তারক্ষক। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে যে নেতৃত্ব-ক্ষমতা প্রদান করেছেন, তার ভিত্তিতেই আমরা তোমাদের শাসন করব। আল্লাহ আমাদেরকে যে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ দান করেছেন, তা দিয়ে আমরা তোমাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করব। তোমাদের প্রতি আমাদের এই অধিকার আছে যে, তোমরা আমাদের মর্জিমতো আমাদের আনুগত্য করবে। আমাদের প্রতিও তোমাদের এই অধিকার আছে যে, শাসনকার্যে আমরা তোমাদের প্রতি ন্যায়বিচার করব। সুতরাং আমাদের নিঃশর্ত আনুগত্য করে তোমরা নিজেদেরকে সম্পদ ও ন্যায়বিচারের অধিকারী বানাও। আর শুনে রাখো, অন্যান্য বিষয়ে ছাড় দিলেও তিনটি বিষয়ে আমি কখনোই শিথিলতা করব না। গভীর রাতেও অভাবী বা বিপদ্গ্রস্ত কোনো ব্যক্তি আমার দরজায় কড়া নাড়লে আমি তাকে ফিরিয়ে দেবো না। কারও পাওনা অনুদান যথাসময়ে প্রাপ্তিতে আমি বাধা দেবো না। তোমাদের কোনো বাহিনীকে আমি শত্রুভূমিতে আটকে রাখব না। তোমাদের প্রতি দাবি হলো, তোমরা নিজেদের নেতৃবৃন্দের জন্য কল্যাণ ও সততার দোয়া করবে। তারা তোমাদের নেতা, তোমাদের শৃঙ্খলারক্ষক। তারা তোমাদের আশ্রয়স্থল; তাদের কাছেই তোমরা আশ্রয় নেবে। মনে রেখো, তোমরা ভালো মানুষ হয়ে গেলে তারাও তোমাদের সঙ্গে ভালো মানুষ হয়ে যাবেন। অন্তরে তাদের প্রতি বিদ্বেষ ধারণ করবে না, তাহলে সব সময় অস্থিরতা ও কষ্টেই নিপতিত থাকবে। তাদের কাছে এমন কিছু প্রত্যাশা করবে না, যা পূরণ করলে তোমাদের অকল্যাণ হবে।

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের প্রত্যেককে প্রত্যেকের সহায়ক বানান। আমি তোমাদের মাঝে কোনো আইন জারি করলে তা স্বাভাবিকভাবে মেনে নেবে। আল্লাহর শপথ! তোমাদের মধ্যে অনেকেই আমার হাতে মারা পড়বে। সুতরাং প্রত্যেকে আত্মরক্ষা করো। প্রত্যেকে চেষ্টা করো—আমার শিকারের তালিকায় যেন নিজের নাম না ওঠে!

এই কঠোর প্রশাসননীতির মাধ্যমে এবং কখনো কখনো নিষ্ঠুরতার মাধ্যমে যিয়াদ বসরা ও পুরো ইরাক অঞ্চলের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হন। জনগণ যিয়াদকে প্রচণ্ড ভয় করত। সমাজের কেউ কারও দ্বারা নিরাপত্তাহানির আশঙ্কা করত না। পথে কারও কোনো বস্তু পড়ে গেলে অন্যরা ভুলেও সেদিকে তাকাত না। মালিক যথাস্থানে তার বস্তু পেয়ে যেত। মহিলারা ঘরের দরজা বন্ধ না করেই নিশ্চিন্তে রাত্রিযাপন করতে পারত।[৭]

এ প্রসঙ্গে আমরা বহুবার উচ্চারিত সেই চিরন্তন সত্য কথাটিই আবার বলছি—

> জাতির ঐক্য ও সম্প্রীতি এবং শাসকের ন্যায়পরায়ণতা ও প্রভাব-ক্ষমতা একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির ভারসাম্য রক্ষায় এবং বহিঃরাষ্ট্রে বিজয়াভিযানের সূচনায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

আর তাই রাষ্ট্রের শৃঙ্খলাবিধান ও ঐক্যবদ্ধতার প্রচেষ্টায় সফল হওয়ার পরই খলিফা মুয়াবিয়া রাযি. নতুন করে বিজয়াভিযানের ধারা চালু করেন।

হজরত মুয়াবিয়া রাযি.-এর যুগে বিজয়াভিযান একইসঙ্গে বিভিন্ন দিকে অব্যাহত ছিল। ইফ্রিকিয়া ও মাগরিব অঞ্চলে[৮] চলছিল আন্দালুস বিজয়ের প্রচেষ্টা। সমুদ্রপথে ভূমধ্যসাগরের (তখন রোম সাগর নামে

---

৭. অবশ্য আমাদের ধারণা, এ ধরনের কঠোর প্রশাসননীতি জনসাধারণের হৃদয়জগৎকে সংশোধন করতে পারে না; সর্বোচ্চ সাময়িক সময়ের জন্য সমাজ ও জনগণ কিছু কষ্ট থেকে রেহাই পায়। [মূল গ্রন্থের টীকা]

৮. **ইফ্রিকিয়া :** মধ্যযুগে আরবগণ ইফ্রিকিয়া (Ifriqiya) দ্বারা আফ্রিকা মহাদেশের বিস্তৃত একটি অঞ্চলকে বোঝাত। বর্তমান তিউনিসিয়ার উত্তরাঞ্চল, আলজেরিয়ার পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিম লিবিয়ার ত্রিপোলি অঞ্চল এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং ইফ্রিকিয়া দ্বারা বর্তমানের বৃহত্তর আফ্রিকা মহাদেশকে উদ্দেশ্য গ্রহণ করা ঠিক হবে না।

মাগরিব : বর্তমানে আফ্রিকান রাষ্ট্র মরক্কোকে আরবিতে 'মাগরিব' বলা হলেও অতীতে মাগরিব বলে উত্তর আফ্রিকার বিস্তৃত একটি অঞ্চলকে বোঝানো হতো। বর্তমান মরক্কো, আলজেরিয়া ও তিউনিসিয়ার যেসব অংশ সুউচ্চ অ্যাটলাস পর্বতমালার উত্তরে ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত, সেগুলোকে বলা হতো 'মাগরিব'। ব্যাপকতর অর্থে কেউ কেউ লিবিয়া ও মৌরিতানিয়াকেও এর অন্তর্ভুক্ত ধরতেন। অ্যাটলাস পর্বতমালা ও সাহারা মরুভূমির কারণে মাগরিব অঞ্চলটি ছিল আফ্রিকার বাকি অংশ থেকে আংশিকভাবে বিচ্ছিন্ন। সুতরাং অতীত ইতিহাসের মাগরিবকে বর্তমান মরক্কোর পরিসরে সীমাবদ্ধ মনে করাও ঠিক হবে না।

পরিচিত ছিল) বিভিন্ন দ্বীপ ও উপকূলীয় অঞ্চল জয়ের চেষ্টা চলছিল আর পূর্বে ইরাক অঞ্চল হতে মাওয়ারাউন নাহার অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকা জয়ের চেষ্টা চলছিল। ততদিনে যেহেতু পারস্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল, তাই মুসলিম সাম্রাজ্যের মূল প্রতিপক্ষ ছিল রোমান সাম্রাজ্য। আর রোমান সাম্রাজ্য যেহেতু স্থলবাহিনীর পাশাপাশি সমৃদ্ধ নৌ-শক্তিরও অধিকারী ছিল, তাই মুয়াবিয়া রাযি. ইসলামি রাষ্ট্রের নৌ সামরিক শক্তি বৃদ্ধিতেও জোর দেন।

মুয়াবিয়ার রাযি.-এর আমলে মুসলিম নৌবহরের রণতরীর সংখ্যা সতেরোশ-তে পৌঁছেছিল। প্রতিটি রণতরী ছিল পর্যাপ্ত সৈন্য ও যুদ্ধাস্ত্রে সমৃদ্ধ। তিনি প্রথমে আক্কায় একটি শিপইয়ার্ড নির্মাণ করেন, এরপর ৫৪ হিজরি সনে মিশরের রওজা দ্বীপে আরেকটি শিপইয়ার্ড নির্মাণ করেন।

মুয়াবিয়া রাযি.-এর শাসনামলে দুদুবার স্থল ও নৌবাহিনীর সমন্বয়ে কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের প্রচেষ্টা চালানো হয়। অবশ্য দু-বারই মুসলিম অভিযাত্রীদল কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়। এসব অভিযানে প্রবীণ সাহাবিগণসহ বিশিষ্ট সাহাবিদের অনেকেই অংশগ্রহণ করেন।

ইমাম বুখারি রহ. বিশুদ্ধ সনদে হজরত উম্মে হারাম বিনতে মিলহান রাযি. হতে উল্লেখ করেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

> «أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِيْ يَغْزُوْنَ الْبَحْرَ قَدْ أَوْجَبُوْا، ... أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِيْ يَغْزُوْنَ مَدِيْنَةَ قَيْصَرَ مَغْفُوْرٌ لَهُمْ»
>
> আমার উম্মতের প্রথম যে দলটি নৌযুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে, তারা যেন (জান্নাত) অনিবার্য করে ফেলল। ... আমার উম্মতের প্রথম যে দলটি (রোমান সম্রাট) কায়সারের নগরী আক্রমণ করবে, তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে।[৯]

হাদিসে কায়সারের নগরী দ্বারা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল উদ্দেশ্য।

---

৯. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ২৯২৪।

ইমাম আহমাদ রহ. আপন সনদে আবু যিবইয়ান রহ. হতে উল্লেখ করেছেন যে, হজরত আবু আইয়ুব আনসারি রাযি. ইয়াযিদ বিন মুয়াবিয়ার সঙ্গে (কনস্টান্টিনোপল) অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেছিলেন, আমি মারা গেলে তোমরা আমার লাশ নিয়ে শত্রুভূমির অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে এবং যেখানে শত্রুবাহিনীর মুখোমুখি হবে, সেখানেই তোমাদের পদতলে আমাকে দাফন করবে। এরপর তিনি বলেন, আমি নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

«مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، دَخَلَ الْجَنَّةَ»

> যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে যে, সে আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করেনি, সে জান্নাতে যাবে।[১০]

মুয়াবিয়া রাযি.-এর শাসনামলে মুসলিম নৌবাহিনী সিসিলি, জারবা, রোডস ও ক্রিটসহ বেশ কয়েকটি দ্বীপ জয় করে।

খলিফা মুয়াবিয়া রাযি.-এর শাসনামলে পরিচালিত বিজয়াভিযান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সামনে 'উমাইয়া খিলাফতকালে ইসলামি বিজয়াভিযান' শীর্ষক স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে করা হবে।

মুয়াবিয়া রাযি. ইসলামি রাষ্ট্রে ডাকব্যবস্থাও চালু করেছিলেন। ডাকব্যবস্থাকে কার্যকর ও গতিশীল করে তুলতে সুদীর্ঘ পথের নির্দিষ্ট দূরত্ব পরপর একএকটি মনজিল নির্ধারণ করা হয়েছিল। খলিফার বার্তা বিভিন্ন নগরীতে পৌঁছানোর জন্য প্রতিটি মনজিলে বাহনজন্তু প্রস্তুত থাকত। রাজধানী হতে কোনো বার্তা প্রেরণ করা হলে ডাকবিভাগের প্রধান দ্রুত তা প্রথম মনজিলে পৌঁছিয়ে দিতেন। প্রথম মনজিলের দায়িত্বশীল দ্রুত তা পৌঁছিয়ে দিতেন পরবর্তী মনজিলে। এভাবে সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ে বার্তাটি পৌঁছে যেত কাঙ্ক্ষিত গভর্নর বা কর্মকর্তার কাছে। প্রতি দুই মনজিলের মাঝে দূরত্ব ছিল বারো মাইল। এ পরিমাণ দূরত্বকে আরবিতে 'বারিদ' বলা হয়। আর এ কারণেই আরবিতে ডাকব্যবস্থাকেও বলা হয় বারিদ। ডাকব্যবস্থার এ চিন্তাধারা পারসিকদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হয়েছিল।

মুয়াবিয়া রাযি.-এর ব্যক্তিগত সচিব ও লিপিকার ছিলেন (শামীয় খ্রিষ্টান) সারজুন রুমি। যেহেতু তার শাসনামলে শামের দাপ্তরিক কার্যক্রম রোমান

---

১০. *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ২৩৫৯৪।

ভাষায় পরিচালিত হতো, তাই রোমান ভাষায় পারদর্শী সারজুনকেই এ পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। সম্ভবত সারজুন রুমি খারাজ বিষয়ক সচিব ছিলেন। তিনি হজরত মুয়াবিয়া রাযি.-এর উপদেষ্টা ও একান্ত সচিবও ছিলেন।

এভাবেই কেটে যায় মুয়াবিয়ার রাযি.-এর খিলাফত আমলের প্রায় বিশ বছর। একসময় মুয়াবিয়া রাযি. অনুভব করেন যে, তার বিদায়ের সময় ঘনিয়ে এসেছে। দীর্ঘ কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে তিনি পুরো ইসলামি বিশ্বকে বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলামুক্ত একক শক্তিশালী সাম্রাজ্যে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছেন। মুয়াবিয়া রাযি. উপলব্ধি করেন যে, তিনি যদি পরবর্তী খলিফা নির্ধারণের বিষয়টি সমাধান করে না যান, তাহলে মুসলিম উম্মাহ আবারও এক দীর্ঘমেয়াদি ফিতনায় জড়িয়ে যেতে পারে।

তিনি চিন্তা করে দেখেন যে, সার্বিক বিবেচনায় পরবর্তী খলিফা শাম থেকেই নির্বাচন করা শ্রেয়তর হবে। কারণ, তৎকালীন ইরাক ছিল বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার কেন্দ্র। কঠোর শক্তিপ্রয়োগ ব্যতীত ইরাককে নিয়ন্ত্রণ করা যেত না। অপরদিকে ভৌগোলিক দিক থেকে মিশর এমন অবস্থায় ছিল যে, যে কেউ সেখানে গভর্নর হিসেবে একচ্ছত্র শাসন করতে পারত। আর মদিনা যদিও তখনও অনেক সাহাবায়ে কেরাম ও সাহাবা-পুত্রদের কেন্দ্রস্থল ছিল; কিন্তু মদিনাবাসী এক ও একক নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ ছিল না। ফলে সেখান থেকে পরবর্তী খলিফা নির্বাচন করতে গেলে নতুন করে ফিতনা সৃষ্টির আশঙ্কা ছিল। বিপরীতে পুরো শাম অঞ্চল মুয়াবিয়া রাযি.-এর একক নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ ছিল। শামের জনগণ ছিল সুশাসনপ্রিয়, দক্ষ প্রশাসননীতির অনুসারী। পাশাপাশি সামরিক দিক থেকে যথেষ্ট শক্তিশালী শাম অঞ্চল ইসলামি রাষ্ট্রের সীমান্তে অবস্থিত হওয়ায় সেখানে দারুল খিলাফাহ হলে সেখান থেকে শত্রু অঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাও ছিল তুলনামূলক সহজ।

সবদিক বিবেচনা করে মুয়াবিয়া রাযি. উপলব্ধি করেন যে, নিজ পুত্র ইয়াযিদকে পরবর্তী খলিফা নির্বাচিত করা হলে পরিস্থিতি তুলনামূলক অধিক নিয়ন্ত্রণে থাকবে। ইয়াযিদকে পরবর্তী খলিফা ঘোষণা করা হলে শামের দিক থেকে কোনো ধরনের বিদ্রোহের আশঙ্কা ছিল না; ইরাক ও মিশরের গভর্নরদের সমর্থনলাভও ছিল সহজ। মদিনাবাসী যাতে এই নির্বাচনে একাত্মতা পোষণ করে, এ উদ্দেশ্যে তিনি কনস্টান্টিনোপলে

মুসলিম বাহিনী প্রেরণের সময় সাহাবায়ে কেরাম ও সাহাবা-পুত্রদের সঙ্গে তার পুত্র ইয়াযিদকেও প্রেরণ করেন এবং তাকেই বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নির্বাচিত করেন।

মুয়াবিয়া রাযি. ৫০ হিজরি সনে পুত্র ইয়াযিদকে ওলিয়ে আহদ (ভবিষ্যৎ খলিফা)[১১] নির্বাচিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। জনগণকে ইয়াযিদের স্বপক্ষে বায়আত গ্রহণের আহ্বান জানানো হলে জনগণ তার নামে বায়আত গ্রহণ করে। মৃত্যুশয্যায় মুয়াবিয়া রাযি. ইয়াযিদকে চারজন ব্যক্তি সম্পর্কে সতর্ক থাকতে বলেন—হুসাইন বিন আলি রাযি., আবদুল্লাহ বিন উমর রাযি., আবদুল্লাহ বিন যুবায়র রাযি. ও আবদুর রহমান বিন আবু বকর রাযি.।

হজরত মুয়াবিয়া রাযি. ৬০ হিজরি সনের রজব মাসে (৬৮০ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে) আটাত্তর বছর বয়সে দামেশকে ইন্তেকাল করেন। যাহহাক বিন কায়স রাযি. তার জানাজা পড়ান।

মুয়াবিয়া রাযি.-এর জীবদ্দশায়ই সমকালীন মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ অঞ্চলে ইয়াযিদের পক্ষে বায়আত গ্রহণ সম্পন্ন হয়। কিন্তু মদিনার গভর্নর মারওয়ান ইবনুল হাকাম সেখানে বায়আত গ্রহণের উদ্যোগ নিলে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তাতে আপত্তি করেন। তাদের যুক্তি ছিল—একইসঙ্গে দুই ব্যক্তির নামে বায়আত হতে পারে না আর মুয়াবিয়া রাযি. নিজ সন্তানের নামে খিলাফতের বায়আতের নির্দেশ দিতে পারেন না। এ কারণেই মুয়াবিয়া রাযি.-এর ইন্তেকালের পর জনগণ নতুন করে ইয়াযিদের নামে বায়আত গ্রহণ করে। কিন্তু উল্লিখিত চারজন সাহাবি বায়আত গ্রহণে বিরত থাকেন। পরবর্তী সময়ে আবদুল্লাহ বিন উমর রাযি.-ও বায়আত গ্রহণ করেন এবং সবাইকে ইয়াযিদের খিলাফতের বিষয়ে একমত হতে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন—

> 'তোমরা যুক্তি হিসেবে বলছ যে, ইয়াযিদ বিন মুয়াবিয়া তো উম্মতে মুহাম্মাদীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি নয়, সবচেয়ে প্রাজ্ঞ-ফকিহ

---

১১. শাসনকর্তা কর্তৃক রাজপরিবারের কাউকে ভবিষ্যৎ শাসনকর্তা হিসেবে ঘোষণা করা হলে তাকে ওলিয়ে আহদ (ভাবী শাসক) বলা হয়। শাসনকর্তার মৃত্যু, মারাত্মক অসুস্থতা বা বরখাস্তের ঘটনা ঘটলে ঘোষিত ওলিয়ে আহদ তার স্থলাভিষিক্ত হন। রাজতন্ত্রে পরিচালিত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বর্তমানেও ওলিয়ে আহদ ঘোষণার রীতি প্রচলিত আছে।

ব্যক্তিও নয় এবং মহত্ত্ব ও মর্যাদায়ও সর্বশ্রেষ্ঠ নয়। আমিও তা-ই বলি। কিন্তু আল্লাহর শপথ! উম্মতে মুহাম্মাদির ঐক্য ও অবিচ্ছিন্নতা আমার কাছে বিভক্তি ও বিসংবাদের চেয়ে প্রিয়।'

ইয়াযিদের খিলাফতের বায়আত গ্রহণকালে ইবনে উমর রাযি. আরও বলেন—

'সে যদি কল্যাণকর হয়, তাহলে আমরা তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকব। আর যদি মন্দ হয়, তাহলে ধৈর্যধারণ করব।'

আবদুল্লাহ বিন উমর রাযি.-এর পাশাপাশি আবদুর রহমান বিন আবু বকরও ইয়াযিদের নামে বায়আত গ্রহণ করেন। বাকি থাকেন কেবল হুসাইন বিন আলি রাযি. ও আবদুল্লাহ বিন যুবায়র রাযি.।

পাঠকমনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, এভাবে আগাম খলিফা নির্বাচন করে এবং নিজ পুত্রকেই ভাবী খলিফা নির্ধারণ করে হজরত মুয়াবিয়া রাযি. কি সঠিক কাজ করেছেন? এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা দুজন প্রাজ্ঞ ঐতিহাসিকের পর্যালোচনা উল্লেখ করছি।

১. আধুনিক যুগের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক শায়খ খিযরি বেক রহ.[১২] বলেন—

মুসলিম সমাজের শৃঙ্খলারক্ষা এবং বিভক্তি দূর করে পুরো জাতিকে এক সুতায় গাঁথার জন্য ইতিহাসের সেই যুগসন্ধিক্ষণে (মুয়াবিয়া রাযি. কর্তৃক গৃহীত) এই পদ্ধতিই ছিল অবশ্যম্ভাবী ও একমাত্র করণীয়। কেননা, এ সময় খিলাফতের দায়িত্বলাভে আগ্রহী ব্যক্তির সংখ্যা ছিল অনেক আর প্রত্যেকেই এর উপযুক্তও ছিল।

অধিকন্তু তখন একদিকে ইসলামি সাম্রাজ্যের পরিসর চতুর্দিকে বহুগুণে বৃদ্ধি পাওয়ায় পুরো রাষ্ট্রের সকল প্রান্তের মাঝে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ রক্ষা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল, অপরদিকে এমন কোনো নির্দিষ্ট জাতি-গোষ্ঠী ছিল না, খলিফা নির্বাচনের দায়িত্ব যাদেরকে

---

১২. শায়খ খিযরি বেক মিশরের প্রখ্যাত আলিম, গবেষক, খতিব ও ইতিহাসবিদ। জন্ম কায়রোতে ১২৮৯ হিজরি সনে (১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে)। বিভিন্ন বিষয়ে তার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা দশের অধিক। তিনি ১৩৪৫ হিজরি সনের ৮ শাওয়াল (১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দের ১১ এপ্রিল) কায়রোতেই ইন্তেকাল করেন।

প্রদান করা যেতে পারে। ফলে বিষয়টি অমীমাংসিত রেখে যাওয়ার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ছিল বিবাদ ও বিসংবাদ। ইতিহাসের এই স্তরের প্রতি গভীর দৃষ্টিতে তাকালে আমরা লক্ষ করব যে, সংখ্যায় কম হলেও কুরাইশ-শাখা বনু আবদে মানাফ এ সময় পুরো কুরাইশ জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিল এবং জনগণ তাদের এই শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতিও দিত। কিন্তু তারা খিলাফত নিয়ে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় জড়িয়ে পড়েছিল এবং এর ফলে মুসলিম উম্মাহ সমূহ ক্ষতি ও ধ্বংসের শিকার হতে যাচ্ছিল। এ জাতীয় পরিস্থিতিতে জনগণ যদি নির্দিষ্ট কোনো পরিবারের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, তাদের আনুগত্য স্বীকার করে নেয় এবং তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও নেতৃত্ব-অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান করে, তাহলে বিভক্ত জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে তা-ই সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়।

আশ্চর্যের বিষয় দেখুন, হজরত মুয়াবিয়া রাযি. নিজ পুত্র ইয়াযিদকে খলিফা নির্বাচিত করায় তার সমালোচনায় সবচেয়ে মুখর হলো শিয়া সম্প্রদায়। অথচ শিয়াদের আকিদা ও বিশ্বাস হলো— খিলাফত আলি-পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে এবং আলি-পরিবারের প্রত্যেক খলিফার মৃত্যুর পর তার পুত্র উত্তরাধিকার সূত্রে খিলাফতের অধিকার লাভ করবে। অপরদিকে (পরবর্তীকালে বনু উমাইয়ার মূল প্রতিদ্বন্দ্বী) বনু আব্বাসও এ পদ্ধতি সাদরে গ্রহণ করে নিয়েছিল এবং খিলাফতকে নিজেদের পারিবারিক অধিকার গণ্য করে অন্যদের জন্য প্রকারান্তরে তা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। মোটকথা, মুয়াবিয়া রাযি. যা করেছেন, উম্মাহর চলমান পরিস্থিতিতে তা-ই ছিল অবশ্যকরণীয়।[১৩]

২. হিজরি একাদশ শতাব্দীর প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন রহ. বলেন—

প্রকৃতপক্ষে সমকালীন মুসলিম উম্মাহর সম্প্রীতি ও ঐক্যবদ্ধতার কল্যাণ-চিন্তাই হজরত মুয়াবিয়া রাযি.-কে অন্য কারও পরিবর্তে নিজ পুত্র ইয়াযিদকে পরবর্তী খলিফা নির্বাচনে উদ্বুদ্ধ করেছিল। বনু উমাইয়ার বিশিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ তখন ইয়াযিদের

---

১৩. মুহাম্মাদ খিযরি বেক, *আদ-দাওলাতুল উমাবিয়্যাহ*, পৃষ্ঠা : ৪৪৮।

মনোনয়নের বিষয়ে একমত ছিল। আর বনু উমাইয়াই ছিল তখনকার কুরাইশ গোত্রের মূল ও শক্তিশালী অংশ। এ কারণেই মুয়াবিয়া রাযি. যাদেরকে ইয়াযিদের চেয়েও অধিক উপযুক্ত মনে করতেন, তাদের পরিবর্তে ইয়াযিদকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন এবং শরিয়তের দৃষ্টিতে অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 'উম্মাহর ঐক্য ও নিরবচ্ছিন্নতা' বজায় রাখার উদ্দেশ্যে শ্রেষ্ঠতরের পরিবর্তে অন্যকে বেছে নিয়েছিলেন। মুয়াবিয়া রাযি.-এর ধার্মিকতা ও ন্যায়পরায়ণতা এবং নবীসংস্পর্শের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য আমাদেরকে এ ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে নিষেধ করে। অধিকন্তু বিশিষ্ট ও প্রবীণ সাহাবিগণ তখন বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও নীরব ছিলেন, যা এ ক্ষেত্রে কোনো ধরনের সংশয় না থাকার অন্যতম দলিল। কারণ, সাহাবায়ে কেরামের মহান জামাত হক ও ন্যায়ের প্রশ্নে কখনোই আপস বা নমনীয়তা প্রদর্শন করতেন না।[১৪]

* * *

---

১৪. ইবনে খালদুন, *তারিখে ইবনে খালদুন*, ১/২৬৩।

ইয়াযিদ বিন মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান

[রজব ৬০ হিজরি—রবিউল আউয়াল ৬৪ হিজরি]

[এপ্রিল ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দ—নভেম্বর ৬৮৩ খ্রিষ্টাব্দ]

ইয়াযিদের (১ম ইয়াযিদ) জন্ম ২৬ হিজরি সনে। খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণকালে তার বয়স ছিল ৩৪ বছর। খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার পরই ইয়াযিদ হিজাযের গভর্নরের কাছে বার্তা প্রেরণ করে নির্দেশ দেন— কোনোপ্রকার অবকাশ না দিয়ে প্রয়োজনে কঠোরতা অবলম্বন করে হলেও অনতিবিলম্বে যেন হুসাইন বিন আলি রাযি. ও আবদুল্লাহ বিন যুবায়রের কাছ থেকে তার বায়আতের স্বীকৃতি গ্রহণ করা হয়।

ঠিক একই সময় কুফাবাসী হুসাইন রাযি.-এর কাছে এই মর্মে বার্তা প্রেরণ করে যে, কুফায় আমরা সংঘবদ্ধ একটি শক্তি। আপনি নির্দ্বিধায় আমাদের কাছে চলে আসুন। তখন হুসাইন রাযি. তার চাচাতো ভাই মুসলিম বিন আকিলকে কুফার পরিস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে কুফায় প্রেরণ করেন।

মুসলিম বিন আকিল বেশ কিছুদিন কুফায় অবস্থান করেন। এরপর তিনি কুফায় ইয়াযিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রচেষ্টা চালান এবং হুসাইনের বায়আতের পক্ষে ডাক দেন। চার হাজার লোক তার পক্ষে সমবেত হয়। কিন্তু কিছু সময় অতিবাহিত না হতেই তারা মুসলিমের সঙ্গ ত্যাগ করে। অল্প কয়েকদিন পরই নিঃসঙ্গ মুসলিম বন্দি হন এবং কুফার গভর্নর উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের নির্দেশে তাকে হত্যা করা হয়।

মুসলিম বিন আকিল নিহত হওয়ার একদিন পূর্বে হজরত হুসাইন রাযি. মক্কা থেকে কুফার উদ্দেশে রওনা হন। উম্মাহর বৃহত্তর স্বার্থের দাবিতে সাহাবায়ে কেরামের অনেকেই তাকে মক্কা ত্যাগ না করার পরামর্শ দেন। কিন্তু হুসাইন রাযি. আপন ইজতিহাদ ও ব্যক্তি-সিদ্ধান্তে অটল থাকেন।

৬১ হিজরি সনের ১০ মুহাররম (৬৮০ খ্রিষ্টাব্দের ১০ অক্টোবর) হুসাইন রাযি. কারবালার সন্নিকটে ইরাক থেকে আগত উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের বাহিনীর হাতে শহিদ হন। ইরাকি বাহিনী হুসাইন রাযি.-কে আপন মত পরিবর্তনের জন্য সামান্য সুযোগও দেয়নি। এরপর হুসাইন রাযি.-এর কর্তিত মস্তক খলিফা ইয়াযিদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ইয়াযিদের হুসাইন রাযি.-কে হত্যা করার ইচ্ছা ছিল না। হুসাইন হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পেয়ে ইয়াযিদ ব্যথিত হয়ে অশ্রুপাত করেন এবং হুসাইনপরিবারের জীবিত সদস্যদের সঙ্গে সদাচরণ করেন।

শায়খ খিযরি বেক এই মর্মান্তিক ঘটনার পর্যালোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন—

> এভাবে এক মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে এই ঘটনাপ্রবাহের সমাপ্তি ঘটে। মূলত ধৈর্যহীনতা ও সিদ্ধান্তের পরিণতি সম্পর্কে গভীর পর্যবেক্ষণের অভাবই ঘটনাপ্রবাহকে এই মর্মান্তিক পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। হজরত হুসাইন রাযি. হিতাকাঙ্ক্ষীদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং ইরাকবাসীর প্রতি সুধারণা করেছিলেন। দুষ্ট ও চক্রান্তপ্রিয় কিছু লোকের চিঠি পেয়ে তিনি প্রভাবিত ও প্রবঞ্চিত হয়েছিলেন। তিনি তাদের কথা বিশ্বাস করে নিজ পরিবার-পরিজনসহ এমন এক জাতির উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন, যাদের কাছে প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারের কোনো মূল্যই ছিল না। আশ্চর্যের বিষয় দেখুন—হজরত হুসাইন রাযি.-এর বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করেছিল, যারা তাকে হত্যা করেছিল, সেই বাহিনীটি কাদের দ্বারা গঠিত হয়েছিল? বাহিনীটি গঠিত হয়েছিলে ইরাকিদের সমন্বয়ে! দুদিন পূর্বে যারা শ্লোগান তুলেছিল—আমরা 'শীআনে আলি' ও আলির পক্ষাবলম্বী, তারাই শেষ পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। মোটকথা, হুসাইন রাযি.-এর কুফা অভিমুখে রওনা হওয়া ছিল একটি ইজতিহাদি ও সিদ্ধান্তগত ভুল, যা মুসলিম উম্মাহর জন্য আজও পর্যন্ত বিদ্যমান এক বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতার দুর্যোগ টেনে এনেছে। যুগে যুগে অনেকেই এই বিষয়ে কেবল এ উদ্দেশ্যে কলম ধরেছে যে, হৃদয়ে সুপ্ত আগুন যেন আরও উসকে ওঠে এবং বিভেদ ও অনৈক্য যেন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়।

> প্রকৃতপক্ষে হুসাইন রাযি. যা প্রত্যাশা করেছিলেন, তার জন্য না তিনি নিজে প্রস্তুতি নিয়েছিলেন, না বাহিনী প্রস্তুত করেছিলেন। ফলে তার প্রত্যাশাও পূরণ হয়নি; বরং তাকে নির্মমভাবে শহিদ হতে হয়েছে।
>
> মর্মান্তিক এই ঘটনায় বিভিন্নভাবে যারা শরিক ছিল, সকলেই এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। তাদের কৃতকর্মের হিসাব তো আল্লাহই নেবেন। তবে ইতিহাস এ ঘটনা থেকে আমাদের জন্য এক চিরন্তন শিক্ষা সংরক্ষণ করেছে। আর তা হলো—গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ সম্পাদন করতে চাইলে উক্ত কাজের স্বাভাবিক প্রস্তুতি গ্রহণ না করে অগ্রসর হওয়া মোটেও সমীচীন নয়। প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তখনই তরবারি উত্তোলন করতে হবে, যখন বিজয় অর্জনের জন্য যথেষ্ট বা কাছাকাছি শক্তি থাকবে। পাশাপাশি উক্ত কাজে জাতির বৃহত্তর স্বার্থ ও কল্যাণও নিহিত থাকতে হবে। যেমন সমাজে সীমাতিরিক্ত জুলুম-নিপীড়ন চলছে বা অন্যায় শাসনের কারণে জনসাধারণ সহ্যের শেষ সীমায় উপনীত হয়েছে। অপরদিকে হুসাইন রাযি. যখন ইয়াযিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন, তখন সাধারণ জনগণ ইয়াযিদের হাতে বায়আত গ্রহণ করেছিল এবং তখন পর্যন্ত তার থেকে অত্যাচার ও জুলুম-আচরণ প্রকাশ পায়নি।[১৫]

যারা হজরত হুসাইন রাযি.-কে কুফার উদ্দেশে রওনা হতে বারণ করেছিলেন, তাদের একজন হলেন বিশিষ্ট সাহাবি আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি.। তিনি তাকে বলেছিলেন, 'ইরাকিরা প্রতারক জাতি। আপনি কিছুতেই তাদের কাছে যাবেন না। আপনি এখানেই অবস্থান করুন। কারণ, আপনি হলেন হিজাযবাসীর সর্দার। ইরাকবাসী যদি প্রকৃতই আপনাকে কামনা করে থাকে, যেমনটি তারা দাবি করছে, তাহলে তাদেরকে এ বার্তা পাঠান যে, তারা যেন তাদের শত্রুদের এলাকাছাড়া করে। এরপর আপনি রওনা হবেন। আর যদি একান্ত যেতেই চান, তাহলে (কুফায় না গিয়ে) ইয়ামেনে যান। কারণ, একদিকে ইয়ামেনভূমিতে অনেক দুর্গ ও গিরিপথ রয়েছে; অপরদিকে তা সুবিস্তৃত ও সুবিশাল

---

[১৫]. মুহাম্মাদ খিযরি বেক, *আদ-দাওলাতুল উমাবিয়্যাহ*, পৃষ্ঠা : ৪৫৯-৪৬০।

এলাকা। আর সেখানে আপনার পিতার অনেক অনুসারীও আছে। আপনি সেখানে অবস্থান করে অন্যান্য অঞ্চলের জনগণের কাছে বার্তা ও দূত পাঠাতে পারবেন এবং আপনার আহ্বায়কদের দৃঢ়পদ রাখতে পারবেন। আমি মনে করি, তখন আপনি নিরাপদে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারবেন।'[১৬]

বিশিষ্ট তাবেয়ি আবদুল্লাহ বিন মুতি' তাকে বলেন, 'হে আল্লাহর রাসুলের দৌহিত্র! আমি আপনাকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি! আপনি ইসলামের পবিত্রতা লঙ্ঘন করছেন! আল্লাহর দোহাই দিয়ে আপনাকে বলছি, আল্লাহর রাসুলের মর্যাদা রক্ষা করুন! আরব জাতির পবিত্রতা রক্ষা করুন। আল্লাহর শপথ! বনু উমাইয়ার হাতে যা আছে, আপনি যদি তা পেতে চান, তাহলে তারা আপনাকে হত্যা করবে। আর তারা যদি আপনাকে হত্যা করতে পারে, তাহলে এরপর আর কাউকে ভয় করবে না। আল্লাহর শপথ! এ তো ইসলামের মর্যাদা ও পবিত্রতা; আপনি তা নষ্ট করতে যাচ্ছেন। আপনি এ কাজ করবেন না; আপনি কুফায় যাবেন না।'[১৭]

কিন্তু হজরত হুসাইন রাযি. আপন সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। জ্ঞানী-গুণী হিতাকাঙ্ক্ষীগণ তাকে অনুরোধ করতে থাকেন; কিন্তু তিনি তাদের ইজতিহাদের পরিবর্তে আপন ইজতিহাদকেই গ্রহণ করেন। পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহে এ বিষয়টিই প্রতিভাত হয় যে, তার হিতাকাঙ্ক্ষীদের পরামর্শই ঠিক ছিল আর তার সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল না।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. *'মিনহাজুস সুন্নাহ'* গ্রন্থে লিখেছেন—

> হজরত হুসাইন রাযি.-এর কুফা অভিমুখে রওনা হওয়ার মধ্যে ধর্মীয় বা পার্থিব কোনো দৃষ্টিতেই কল্যাণ ছিল না। তার ইরাকে রওনা ও হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে যে অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছিল, তিনি নিজ অঞ্চলেই অবস্থান করলে তা সংঘটিত হতো না। তিনি যে কল্যাণ অর্জন ও অকল্যাণ দমনের প্রত্যাশা করেছিলেন, তার

---

[১৬]. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৪৫৭।

[১৭]. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৪৫৭।

> কিছুই অর্জিত হয়নি; বরং তার এই সফর ও হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে অকল্যাণই বৃদ্ধি পেয়েছে।[১৮]

শায়খ মুহিব্বুদ্দিন আল-খাতিব রহ. লিখেছেন—

> এ ঘটনা যদিও অত্যন্ত নির্মম ও বেদনাদায়ক; কিন্তু বনু উমাইয়া ও তাদের রাষ্ট্রব্যবস্থার পতনের পর এই দুর্যোগপূর্ণ ঘটনাকে এত বিশাল করে দেখার কোনো যৌক্তিক কারণ আমি দেখি না।
>
> হজরত হুসাইন রাযি.-এর শাহাদাতের ঘটনা নিঃসন্দেহে ইসলামি ইতিহাসের একটি দুঃখজনক অধ্যায়; কিন্তু খলিফা উমর রাযি., উসমান রাযি. ও আলি রাযি.-এর শাহাদাত-ঘটনার সঙ্গে তুলনা করলে তা মোটেও উল্লেখযোগ্য নয়। তাহলে প্রতিবছর আশুরার দিন যারা হুসাইন রাযি.-এর শাহাদাতের স্মরণে বিলাপ ও আর্তনাদ করে এবং শোক ও মাতমের 'আয়োজন' করে, খলিফাত্রয়ের মৃত্যুদিবসে তারা কেন তেমনটি করে না?![১৯]

বনু উমাইয়ার সঙ্গে আবদুল্লাহ বিন যুবায়র রাযি.-এর সংঘাতের সূচনা

নবী-দৌহিত্র হজরত হুসাইন রাযি.-এর হত্যাকাণ্ডের সংবাদ হজরত আবদুল্লাহ বিন যুবায়র রাযি.-এর কাছে পৌঁছতেই তিনি ইয়াযিদকে খিলাফতের দায়িত্ব হতে অপসারণের ঘোষণা করেন এবং আপন খিলাফতের স্বপক্ষে জনগণের বায়আত গ্রহণ করেন। সংবাদ পেয়ে ইয়াযিদ মদিনা অবরোধের উদ্দেশ্যে বাহিনী প্রেরণ করে। মদিনাবাসী আত্মসমর্পণ না করে প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত নেয়। ৬৩ হিজরির জিলহজ মাসে (৬৮৩ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে) উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। 'হাররা' নামক এ যুদ্ধে মদিনার অধিকাংশ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি নিহত হয়। আবদুল্লাহ বিন যুবায়র রাযি. তখন মক্কায় অবস্থান করছিলেন। এরপর ইয়াযিদের প্রেরিত বাহিনী মক্কা অবরোধের উদ্দেশ্যে রওনা করে। কিন্তু পথিমধ্যেই ইয়াযিদের মৃত্যুসংবাদ পৌঁছলে তারা ফিরে যায়।

৬৪ হিজরি সনের ১৪ রবিউল আউয়াল (৬৮৩ খ্রিষ্টাব্দের ১০ নভেম্বর) খলিফা ১ম ইয়াযিদের মৃত্যু হয়।

---

১৮. ইবনে তাইমিয়া, *মিনহাজুস সুন্নাহ*, ৪/৫৩০।

১৯. শায়খ মুহিব্বুদ্দিন আল-খাতিব, *আবু বকর ইবনুল আরাবি কৃত 'আল-আওয়াসিম মিনাল কাওয়াসিম'-এর টীকা*, পৃষ্ঠা : ১/২৪৪।

মুয়াবিয়া বিন ইয়াযিদ বিন মুয়াবিয়া

[রবিউল আউয়াল ৬৪ হিজরি—জুমাদাল উলা ৬৪ হিজরি]

[নভেম্বর ৬৮৩ খ্রিষ্টাব্দ—জানুয়ারি ৬৮৪ খ্রিষ্টাব্দ]

তৃতীয় উমাইয়া খলিফা মুয়াবিয়া বিন ইয়াযিদের জন্ম ৪৪ হিজরিতে। ৬৪ হিজরিতে ইয়াযিদ তার জীবদ্দশায়ই নিজ পুত্র মুয়াবিয়ার নামে খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করেন। ইতিহাসে তিনি ২য় মুয়াবিয়া নামে খ্যাত। দ্বিতীয় মুয়াবিয়া একদিকে সৎ ও সদাচারী ছিলেন, অপরদিকে নেতৃত্বগুণে দুর্বল ছিলেন। তিনি খিলাফত-দায়িত্ব থেকে দূরত্ব অবলম্বন করেন এবং খলিফা হওয়ার মাস-তিনেক পরই ইন্তেকাল করেন। দ্বিতীয় মুয়াবিয়ার ইন্তেকালের পর শামের অধিকাংশ গভর্নর আবদুল্লাহ বিন যুবায়র রাযি.-এর খিলাফতের বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করে। উমাইয়া পরিবারের অন্যতম প্রধান পুরুষ মারওয়ান ইবনুল হাকাম[২০] আবদুল্লাহ বিন যুবায়র-এর হাতে বায়আত গ্রহণের জন্য রওনা হন। কিন্তু পথিমধ্যে হুসাইন হত্যার মূল কুশীলব উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়ে যায়। উবায়দুল্লাহ মারওয়ানকে আবদুল্লাহ বিন যুবায়রের হাতে বায়আত গ্রহণ করতে নিষেধ করে তাকেই খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে।[২১] তখন মারওয়ান শামে ফিরে চলে যান। উবায়দুল্লাহর আশঙ্কা

---

২০. উমাইয়া বংশের ঊর্ধ্বতন পুরুষ উমাইয়া বিন আবদে শামসের বড় পুত্রের নাম ছিল আবুল আস। মারওয়ান (বিন হাকাম বিন আবুল আস) ছিলেন আবুল আসের পৌত্র। অপরদিকে উমাইয়ার আরেক পুত্রের নাম ছিল হারব। মুয়াবিয়া রাযি. (বিন আবু সুফিয়ান বিন হারব) ছিলেন হারবের পৌত্র।

২১. এ সময় উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ মারওয়ানের হাতে খিলাফতের বায়আতও গ্রহণ করে। এটি ৬৪ হিজরি সনের জিলকদ মাসের ঘটনা। এরপর মারওয়ান শামে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা=

ছিল, আবদুল্লাহ বিন যুবায়র রাযি.-এর খিলাফতের প্রতি সকলের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হলে তাকে হুসাইন-হত্যার দায়ে প্রাণদণ্ডের সম্মুখীন হতে হবে।

আবদুল্লাহ বিন যুবায়র রাযি.-এর খিলাফত

[মুহাররম ৬১ হিজরি—জুমাদাল উখরা ৭৩ হিজরি]

[অক্টোবর ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দ—নভেম্বর ৬৯২ খ্রিষ্টাব্দ]

বিশিষ্ট সাহাবি আবদুল্লাহ বিন যুবায়র রাযি.-এর জন্ম হিজরতের প্রথম বছর মদিনায়। তিনিই ছিলেন মদিনায় জন্মগ্রহণকারী প্রথম মুহাজির-সন্তান। তার পিতা যুবায়র ইবনুল আওয়াম রাযি. ছিলেন নবীজির ফুফাতো ভাই।

৬৪ হিজরি সনে তৃতীয় উমাইয়া খলিফা মুয়াবিয়া বিন ইয়াযিদের ইন্তেকালের পর ইসলামি রাষ্ট্রের অধিকাংশ নগরীর গভর্নরগণ আবদুল্লাহ বিন যুবায়র রাযি.-এর আনুগত্য স্বীকার করে নিয়ে তার নামে বায়আত গ্রহণ করে। তবে পরিস্থিতি যে পুরোপুরি শান্ত ও বিশৃঙ্খলামুক্ত হয়ে গিয়েছিল, তা কিন্তু নয়। ৬৫ হিজরি সনে শামের মার্‌জ রাহিতের কাছে মারওয়ান ও আবদুল্লাহ বিন যুবায়রের অনুসারীদের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং মারওয়ান শামে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। কিছুদিন পর মারওয়ান ইবনুল হাকামের মৃত্যু হলে শামবাসী তার পুত্র আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের হাতে বায়আত গ্রহণ করে। এরপর শামবাসী ও আবদুল্লাহ বিন যুবায়রের মধ্যে দীর্ঘ সংঘাত চলতে থাকে। ৭১ হিজরি

=করেন এবং শামবাসী তাকেই খলিফা হিসেবে মেনে নেয়। মারওয়ানের মৃত্যুর পর শামবাসী তার পুত্র আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের হাতে বায়আত গ্রহণ করে। ৭৩ হিজরি সনে আবদুল্লাহ বিন যুবায়র রাযি.-এর শাহাদাতের পর আবদুল মালিক বিন মারওয়ান সমগ্র ইসলামি বিশ্বে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। উলামায়ে কেরামের মতে খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করার পর হতে যতদিন আবদুল্লাহ বিন যুবায়র রাযি. জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনিই ছিলেন মুসলিম উম্মাহর স্বীকৃত ও বৈধ খলিফা।

সনে উমাইয়া নেতা আবদুল মালিক বিন মারওয়ান পুরো ইরাকভূমির ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। আবদুল্লাহ বিন যুবায়র রাযি.-এর নিয়ন্ত্রণে থাকে কেবল হিজাযভূমি। এরপর আবদুল মালিক ইরাকের গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সাকাফিকে তার সুবিশাল বাহিনী নিয়ে মক্কায় আবদুল্লাহ বিন যুবায়রকে অবরোধ করার নির্দেশ দেন। হাজ্জাজ-বাহিনী মক্কা অবরোধ করে, মক্কায় বাইরে থেকে রসদসামগ্রী আগমনের পথ বন্ধ করে দেয় এবং মিনজানিক দিয়ে মক্কার অভ্যন্তরে গোলা নিক্ষেপ করতে থাকে। হাজ্জাজ-বাহিনীর প্রবল আক্রমণে মক্কাবাসী ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ইবনে যুবায়রের কাছ থেকে সরে পড়তে থাকে। ইবনে যুবায়রের সঙ্গে থাকেন কেবল তার মা আসমা রাযি.। তিনি আপন পুত্রকে একাকী-সঙ্গীহীন হলেও হকের পথে অবিচল থাকার উপদেশ দিয়ে বিদায় জানান।

হাজ্জাজ-বাহিনীর গোলার আঘাতে কাবার দেয়াল তখন ভগ্নপ্রায় হয়ে পড়েছিল। তাই অবরোধের মধ্যেই আবদুল্লাহ বিন যুবায়র কাবাঘরের পুনর্নির্মাণ সমাপ্ত করেন এবং নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন করেন। নবীজি আম্মাজান আয়েশা সিদ্দিকা রাযি.-কে বলেছিলেন—

«لَوْلَا حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ ، وَلَجَعَلْتُهَا عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ»

> তোমার কওমের লোকদের কুফর পরিত্যাগের সময়কাল নিকটবর্তী না হলে আমি কাবাঘর ভেঙে তা ইবরাহিমের ভিত্তির ওপর পুনর্নির্মাণ করতাম।[২২]

শাহাদাতের কয়েকদিন পূর্বে আবদুল্লাহ বিন যুবায়র তার মায়ের কাছে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন, 'আম্মাজান, সকলে আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। এমনকি আমার দুই পুত্র ও আত্মীয়রাও আজ আমার সঙ্গে নেই। সীমিত যে কয়েকজন এখনো আমার সঙ্গে আছে, তাদের নিয়ে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সামান্য সময়ও টিকে থাকা সম্ভব নয়। আমি যদি পার্থিব কোনোকিছু প্রাপ্তির বিনিময়ে খিলাফত পরিত্যাগ করি, তাহলে

---

২২. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ১৩৩৩।

তারা আমাকে তা দিতে প্রস্তুত আছে। এখন বলুন, এ বিষয়ে আপনার কী মত?'

উত্তরে আসমা রাযি. বলেন, 'প্রিয় বৎস আমার, আল্লাহর শপথ! নিজের কর্তব্য ও করণীয় তো তুমি ভালো করেই জানো। তোমার যদি বিশ্বাস থাকে যে, তুমি হক ও ন্যায়ের পথে আছ এবং মানুষকে সত্যের পথে আহ্বান করছ, তাহলে এ পথেই অটল-অবিচল থাকো। এ ন্যায়ের পথেই তোমার সঙ্গীরা শহিদ হয়েছে। সুতরাং বনু উমাইয়ার দাসদেরকে তোমাকে কাবু করার এবং তোমাকে নিয়ে খেলা করার সুযোগ দিয়ো না। আর যদি তুমি পার্থিব সম্পদ কামনা করে থাকো, তাহলে তো তুমি অতি নিকৃষ্ট এক দাস! তুমি নিজেকে ধ্বংস করেছ, ধ্বংস করেছ তোমার নিহত সঙ্গীদেরকে। আর যদি তুমি বলো যে, আমি তো হকের পথেই ছিলাম; কিন্তু আমার সঙ্গীগণ হীনবল হয়ে পড়ায় আমার সংকল্প দুর্বল হয়ে পড়েছে; তাহলে শোনো, এটি স্বাধীনচেতা বীরের ধর্ম নয়, ধার্মিক ব্যক্তির নীতি নয়। বলো, পৃথিবীতে কি তুমি চিরদিন বেঁচে থাকবে? তাহলে শাহাদাতের মৃত্যুই কি শ্রেয় নয়?'

'আমার আশঙ্কা হয় যে, শামের সৈন্যরা আমাকে হত্যা করার পর লাশ বিকৃত করে ফেলবে।'

'বৎস আমার, মেষকে জবাই করার পর তার চামড়া ছিলে ফেললে কোনো কষ্ট হয় না।' আসমা রাযি. উত্তর দেন।

এরপর ইবনে যুবায়র মায়ের কপালে চুমু খেয়ে বলেন, 'আল্লাহর শপথ! এটিই আমার সিদ্ধান্ত। আজকের দিন পর্যন্ত আমি সবসময় সত্যের পথেই আহ্বান করেছি, কখনো দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকিনি এবং পার্থিব জীবনকে ভালোবাসিনি। আমার জীবদ্দশায় আল্লাহর দ্বীনের মর্যাদা লঙ্ঘিত হচ্ছে, আমি কীকরে তা মেনে নিতে পারি?! একমাত্র এই ধর্মীয় ক্রোধের কারণেই আমি বিদ্রোহ করেছি। কিন্তু আমি আপনার মতামত জানতে চাচ্ছিলাম। আপনার কথা শুনে আমার উপলব্ধি আরও সুদৃঢ় হয়েছে। আম্মাজান, দেখুন, আজই আমি শহিদ হতে যাচ্ছি। এতে আপনার কষ্ট যেন বৃদ্ধি না পায়। আপনি আল্লাহ পাকের ফয়সালা মেনে নিন।'

আসমা রাযি. ছেলেকে বিদায় জানানোর পূর্বে দোয়া করেন—হে আল্লাহ, দীর্ঘ রজনীর সুদীর্ঘ সময় আপনার ইবাদতে দণ্ডায়মান থাকার প্রতি আপনি

রহম করুন, মক্কা-মদিনার মধ্যদুপুরের সেই প্রচণ্ড পিপাসার প্রতি আপনি রহম করুন, তার পিতা ও আমার সঙ্গে তার সদাচরণের প্রতি দয়া করুন। হে আল্লাহ, আপনি তার বিষয়ে যে ফয়সালা করেছেন, তাকে তাতেই সোপর্দ করলাম; আপনার ফয়সালা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করলাম। সুতরাং আবদুল্লাহর বিনিময়ে আমাকে ছবরকারী ও শোকরকারীদের সাওয়াব দান করুন।

মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবদুল্লাহ বিন যুবায়র রাযি. প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং বীরের ন্যায় লড়াই করেন। তিনি তখন আবৃত্তি করছিলেন—

أَسْمَاءُ يَا أَسْمَاءُ لَا تَبْكِيْنِيْ ❋ لَمْ يَبْقَ إِلَّا حَسَبِيْ وَ دِيْنِيْ

وَصَارِمٌ لَانَتْ بِهِ يَمِيْنِيْ

আসমা, ওগো আসমা, কেঁদো নাকো শোকে আর! হাতের তৃপ্তি
তরবারি ছাড়া, মানসম্মান ও ধর্ম ছাড়া কী আছে বলো আমার!

আবদুল্লাহ বিন যুবায়র শহিদ হলে শামের যোদ্ধারা খুশিতে তাকবির দিয়ে ওঠে। এ কথা শোনার পর আবদুল্লাহ বিন উমর রাযি. মন্তব্য করেন, তার জন্মগ্রহণের সংবাদ শুনে তাকবির প্রদানকারীরা তার মৃত্যুতে তাকবির প্রদানকারীদের চেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ ছিল।[২৩] হাজ্জাজ বিন ইউসুফ নিজের ক্ষোভ চরিতার্থ করতে আবদুল্লাহ বিন যুবায়রের মৃতদেহ শূলে চড়ান এবং বার্তাবাহক পাঠিয়ে আসমা রাযি.-কে ডেকে পাঠান। কিন্তু আসমা রাযি. হাজ্জাজের কাছে উপস্থিত হতে অস্বীকৃতি জানান। এরপর হাজ্জাজ নিজেই আসমা রাযি.-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলেন, 'দেখতে পাচ্ছেন—আল্লাহ কীভাবে সত্যকে বিজয়ী করলেন?' আসমা রাযি. উত্তর দেন, 'কখনো কখনো ন্যায় ও ন্যায়ের পথিকদের বিরুদ্ধে অন্যায়কে সাময়িক বিজয় দান করা হয়।' এরপর হাজ্জাজ বলেন, 'দেখেছেন—আমি আল্লাহর শত্রুদের

---

২৩. মুসলমানদের মদিনায় হিজরতের পর মদিনার ইহুদিরা এ কথা প্রচার করেছিল যে, তারা মুসলমানদের জাদু করেছে। তাই মুসলমানরা কিছুতেই সন্তান জন্ম দিতে পারবে না। কিছুদিন পর হজরত আসমা রাযি.-এর সন্তান আবদুল্লাহ বিন যুবায়র রাযি. ভূমিষ্ঠ হন। তিনিই ছিলেন মদিনায় জন্মগ্রহণকারী প্রথম মুসলমান। তখন মদিনাবাসী মুসলমানগণ আনন্দে তাকবির-ধ্বনি প্রদান করেন। [মূল গ্রন্থের টীকা]

কীভাবে পরাভূত করেছি?' আসমা রাযি. উত্তর দেন, 'আমি তো দেখতে পাচ্ছি—তুমি আমার ছেলের দুনিয়া শেষ করেছ আর সে তোমার আখিরাত শেষ করেছে।'

আবদুল মালিক বিন মারওয়ান আসমা রাযি.-এর সঙ্গে হাজ্জাজের অসদাচরণের কথা জানার পর পত্র পাঠিয়ে তাকে ভর্ৎসনা করেন এবং লেখেন, কোথায় তুমি আর কোথায় মহান বুজুর্গ ব্যক্তির কন্যা? তিনি হাজ্জাজকে আসমা রাযি.-এর সঙ্গে সদাচরণের নির্দেশ দেন। এরপর হাজ্জাজ আসমা রাযি.-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলেন, 'আম্মা, আমিরুল মুমিনিন আমাকে আপনার প্রতি খেয়াল রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। আপনার কোনো প্রয়োজন থাকলে আমাকে বলুন।' আসমা রাযি. উত্তর দেন, 'আমি তোমার মা নই; আমি কেবল পাহাড়ি পথে শূলে চড়ানো ওই ছেলেটির মা। আর আমার কোনো প্রয়োজন নেই।'

আবদুল্লাহ বিন যুবায়র রাযি. ৭৩ হিজরি সনের ১৭ জুমাদাল উখরা (৬৯২ খ্রিষ্টাব্দের ৩ নভেম্বর) ইন্তেকাল করেন। তার ইন্তেকালের মধ্য দিয়ে আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের ক্ষমতা সুসংহত হয় এবং পুরো ইসলামি সাম্রাজ্যে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

বনু উমাইয়ার আমলে সংঘটিত উল্লেখযোগ্য বিদ্রোহসমূহ

৬৪ হিজরি সনে ইয়াযিদ বিন মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর থেকে নিয়ে ৮৪ হিজরি সনে আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের শাসনামল শেষ হওয়ার কাছাকাছি সময় পর্যন্ত বনু উমাইয়ার বিরুদ্ধে অনেকগুলো বিদ্রোহ প্রচেষ্টা সংঘটিত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো—

১. তাওয়াবিন বাহিনীর বিদ্রোহ

[রবিউল আউয়াল, ৬৫ হিজরি]
[নভেম্বর, ৬৮৪ খ্রিষ্টাব্দ]

যারা হজরত হুসাইন রাযি.-কে কুফায় আগমনে উদ্বুদ্ধ করেও পরে আর তাকে সহায়তা করেনি, তাদের একটি দল পরবর্তীকালে নিজেদের কৃতকর্মের কারণে অনুতপ্ত হয় এবং একটি সংঘবদ্ধ বাহিনীতে পরিণত হয়। নিজেদেরকে তারা তাওয়াবিন (তাওবাকারী) বাহিনী নামে অভিহিত করত। তাদের নেতৃত্বে ছিলেন সুলায়মান বিন ছারদ রাযি.। তিনি একজন আবিদ ও দুনিয়াবিমুখ সাহাবি ছিলেন। সিফফিনের যুদ্ধে তিনি আলি রাযি.-এর পক্ষে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তার গৃহই ছিল তাওয়াবিন-বাহিনীর মূলকেন্দ্র। ৬৫ হিজরিতে (আইনে ওয়ারদার যুদ্ধে) তাকে ও তার অনুসারীদেরকে হত্যার মাধ্যমে তাওয়াবিন-বিদ্রোহ দমন করা হয়।

২. মুখতার বিন আবু উবায়দ ছাকাফির বিদ্রোহ

তাকে 'মহা ফিতনার পুরোধা' বলে নামকরণ করা হয়। ৬৬ হিজরি সনের রবিউল আউয়াল মাসে (৬৮৫ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে) মুখতার কুফায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। তার দাবি ছিল, আলি বিন আবু তালিবের এক পুত্র মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়া তাকে হুসাইনহত্যার প্রতিশোধ নিতে প্রেরণ করেছেন। বাস্তবে মুহাম্মাদ এ বিষয়ে কিছুই জানতেন না এবং এ বিষয়ে তার সমর্থনও ছিল না। মুখতার একের পর এক কয়েকটি অভিযানে বিজয়লাভে সমর্থ হন। কিন্তু ৬৭ হিজরিতে তিনি নিহত হন এবং মুসআব বিন যুবায়রের হাতে তার আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে।

৩. খারিজিদের বিদ্রোহ

খারিজিরা বেশ কয়েকবার কঠিন বিদ্রোহ করেছিল। খারিজি-ফিতনা দমনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন মুহাল্লাব বিন আবু ছুফরা। ৭৭ হিজরি সনে আবুয যাহ্হাক শাবিব বিন ইয়াযিদ বিন নুআয়ম বিন কায়স শায়বানি খারিজি বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। আবুয যাহ্হাক ছিলেন সমকালীন শ্রেষ্ঠ বীরদের একজন। খারিজিরা তার হাতে খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করে। তিনি বনু উমাইয়ার খলিফাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলেন। আবুয যাহ্হাক একের পর এক যুদ্ধে বনু উমাইয়া বাহিনীকে পরাজিত করতে থাকেন। তার বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা এক হাজারের বেশি ছিল না। বিপরীতে সুসংগঠিত উমাইয়া-বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল কয়েক হাজার। তিনি পানিতে ডুবে মারা যান। তার পূর্বে একই যুদ্ধে তার স্ত্রী (বীরত্ব ও যুদ্ধদক্ষতায় আরব-বিখ্যাত নারী) গাযাল আল-হারুরিয়াও মারা যান।

৪. সিজিস্তানের গভর্নর আবদুর রহমান বিন মুহাম্মাদ ইবনুল আশআছের বিদ্রোহ

ইবনুল আশআছ হাজ্জাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং কুফায় নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। উভয়ের মধ্যে বেশ কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যথা—

ক. যাবিয়ার যুদ্ধ

৮২ হিজরি সনের মুহাররম মাসে (৭০১ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে) বসরায় সংঘটিত হয়। ইবনুল আশআছের বাহিনীতে সাইদ বিন জুবায়র ও শা'বি-সহ অনেক উলামায়ে কেরাম শরিক ছিলেন। ইবনুল আশআছ এ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পালিয়ে কুফায় চলে যান। কুফাবাসী তাকে সাদরে বরণ করে নেয় এবং গভর্নর হাজ্জাজ ও খলিফা আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের অপসারণের বিষয়ে তার হাতে বায়আত গ্রহণ করে।

খ. দিরুল জামাজিমের যুদ্ধ

৮২ হিজরি সনের শাবান মাসে (৭০১ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে) সংঘটিত হয়। হাজ্জাজ তার বাহিনী নিয়ে দিরে কুররায় অবস্থানরত ইবনুল আশআছের মোকাবিলার উদ্দেশ্যে রওনা হন। হাজ্জাজের

সহায়তায় শাম থেকেও প্রচুর সৈন্য এসেছিল। ইবনুল আশআছ দিরুল জামাজিমের কাছে বের হয়ে আসলে উভয় বাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধ দীর্ঘদিন স্থায়ী হওয়ায় খলিফা আবদুল মালিক বিন মারওয়ান তার উপদেষ্টাদের সঙ্গে পরামর্শে বসেন। তারা তাকে পরামর্শ দেয় যে, হাজ্জাজকে অপসারণ করলে যদি ইরাকবাসী আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হয়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ও রক্তপাতের চেয়ে হাজ্জাজকে অপসারণ করাই শ্রেয়তর হবে। তখন আবদুল মালিক তার ভাই মুহাম্মাদ বিন মারওয়ান ও পুত্র আবদুল্লাহ বিন আবদুল মালিককে ডেকে আনেন এবং তাদের সঙ্গে বিরাট এক বাহিনীকে ইরাক অভিমুখে প্রেরণ করেন। তাদেরকে তিনি ইরাকবাসীর উদ্দেশে লিখিত একটি চিঠিও প্রদান করেন। চিঠিতে তিনি লেখেন, যদি তোমাদের গভর্নরের পদ হতে হাজ্জাজকে অপসারণ করলে তোমরা আমার প্রতি সন্তুষ্ট হও, তাহলে আমি তাকে বরখাস্ত করছি আর তোমাদের জন্য শামবাসীর পরিমাণ অনুদান প্রেরণ করছি। ইবনুল আশআছ নিজের পছন্দমতো যেকোনো নগরীর দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। যতদিন আমি ও সে জীবিত থাকবে, ততদিন সে সেখানকার গভর্নর থাকবে। আর ইরাকের দায়িত্ব থাকবে মুহাম্মাদ বিন মারওয়ানের কাছে।

খলিফা তার পত্রে আরও উল্লেখ করেছিলেন যে, ইরাকবাসী যদি তার আহ্বানে সাড়া না দেয়, তাহলে হাজ্জাজ আপন দায়িত্বে বহাল থাকবে এবং যুদ্ধের নেতৃত্বও তার কাছে থাকবে। মুহাম্মাদ বিন মারওয়ান ও আবদুল্লাহ বিন আবদুল মালিক হাজ্জাজের আনুগত্য করবে। যুদ্ধ বা অন্য কোনো বিষয়ে তারা দুজন হাজ্জাজের সিদ্ধান্তের বাইরে যাবে না।

ইবনুল আশআছের কাছে সংবাদ পৌছার পর তিনি তার সেনাপতিদের সমবেত করেন এবং তাদেরকে উক্ত প্রস্তাব মেনে নিতে উদ্বুদ্ধ করেন। কিন্তু তারা চিৎকার করে বলে ওঠে, 'আল্লাহর শপথ! আমরা এ প্রস্তাব গ্রহণ করব না। আমরা সংখ্যায় অধিক; আর তারা আমাদের বশীভূত হয়ে পড়েছে। আল্লাহর শপথ! আমরা কিছুতেই এ প্রস্তাবে সাড়া দেবো না।'

যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠায় খলিফার নির্দেশনা মোতাবেক খলিফার প্রেরিত শামের বাহিনী হাজ্জাজ-বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়। এরপর পুনরায় যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। দিনের পর দিন যুদ্ধ চলতে থাকে; যুদ্ধের মাঝেই সে বছর শেষ হয়। প্রতিদিন বা একদিন পরপরই উভয় বাহিনী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ত। অধিকাংশ দিনই যুদ্ধ-পরিস্থিতি শামের বাহিনীর প্রতিকূলে থাকত।

এরইমাঝে হাজ্জাজ একদিন প্রতিপক্ষের কারিদের (আলিমদের) অংশের ওপর হামলা চালানোর নির্দেশ দেন। কারণ, পুরো বাহিনী তাদেরই অনুসরণ করত এবং তারাই সকলকে যুদ্ধে দৃঢ়পদ রাখতেন।

এ হামলা সফল হলে বহু সংখ্যক আলিম নিহত হয়। ইবনুল আশআছের বাহিনী পরাজিত হয়ে বিভিন্ন দিকে পালিয়ে চলে যায়, অনেকেই বন্দি হয় হাজ্জাজের বাহিনীর হাতে। ইবনুল আশআছ নিজে তুর্কি শাসক রডবিলের রাজ্যে আশ্রয় নেন।

এ সময় হাজ্জাজ রডবিলের কাছে বার্তা পাঠিয়ে হুমকি দেন যে, তিনি রডবিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এমন বিশাল এক বাহিনী প্রেরণ করবেন, যার মোকাবিলা করার মতো শক্তি তার নেই। ভীত রডবিল আশ্রয়গ্রহণকারী ইবনুল আশআছকে হত্যা করে তার কর্তিত মস্তক হাজ্জাজের কাছে প্রেরণ করে। যুদ্ধবন্দিদেরকে হাজ্জাজের কাছে উপস্থিত করা হলে হাজ্জাজ তাদের অল্প কয়েকজনকে ক্ষমা করে দিয়ে অধিকাংশকে হত্যা করেন। বিশিষ্ট তাবেয়ি আলিম সাইদ বিন জুবায়র রহ.-কেও হত্যা করা হয়।

এ ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে শায়খ খিযরি বেক লিখেছেন—

এভাবেই উম্মাহর জীবনে অতিবাহিত হয় প্রায় বিশটি বছর। এ সময় ইসলামি রাষ্ট্রের অধিকাংশ অঞ্চল ফিতনা ও অস্থিরতায় আক্রান্ত ছিল এবং পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও হত্যাযজ্ঞে মেতে ছিল। অব্যাহত ফিতনা এ সময় মুসলিম উম্মাহকে বিজয়াভিযান বিস্তৃত করার এবং শত্রুভূমি সংকুচিত করার সুযোগ দেয়নি। কারণ,

> উম্মাহর অভ্যন্তরীণ বিরোধ ও যুদ্ধই তখন চরমে। নিজেদের দখলে থাকা ভূখণ্ড রক্ষা করতে পারাই তখন যথেষ্ট বিবেচিত হচ্ছিল।[২৪]

তৎকালীন ঘটনাপ্রবাহে শায়খ খিযরি বেকের পর্যবেক্ষণই প্রতিফলিত হচ্ছিল।

৭০ হিজরি সনে আবদুল মালিক বিন মারওয়ান বার্ষিক ট্যাক্স প্রদানের শর্তে রোমানদের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হন।

৭১ হিজরি সনে মাগরিবে যুদ্ধরত মুসলিম মুজাহিদ বাহিনী পিছু হটে এবং কায়রোয়ানের নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দেয়।

অনেক ঘটনার মাঝে এ দুটি দৃষ্টান্তমাত্র। তবে বিস্ময়ের বিষয় হলো, এই ধরনের উপর্যুপরি দুর্যোগ, বিদ্রোহ ও ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েও উমাইয়া সাম্রাজ্য অতি সীমিত সময় বাদে কখনোই সমকালীন অন্যান্য সাম্রাজ্যের সামনে দুর্বল প্রতিপন্ন হয়নি।

৮৪ হিজরি সনে হাজ্জাজ ইরাকের ঘাঁটি ওয়াসিত নগরীর নির্মাণ সমাপ্ত করেন।

৮৬ হিজরির শাওয়াল মাসে (৭০৫ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে) আবদুল মালিক বিন মারওয়ান তার একুশ বছর দেড় মাসের খিলাফত আমল শেষে ইন্তেকাল করেন।

মারওয়ান ইবনুল হাকাম ও তার পুত্র খলিফা আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের কিছু কীর্তি

আলোচনার এ পর্যায়ে আমরা মারওয়ান ও তার পুত্র আবদুল মালিকের অবস্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করছি।

মারওয়ান ছিলেন প্রথম স্তরের একজন তাবেয়ি। তিনি উমর রাযি., উসমান রাযি., যায়দ বিন ছাবিত রাযি.-সহ বিভিন্ন সাহাবি হতে হাদিস বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারি রহ. তার *'সহিহ বুখারি'* গ্রন্থে মারওয়ানের সূত্রে রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন। মারওয়ান তার গভর্নর আমলে সাহাবায়ে কেরামকে সমবেত করে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন এবং তারা যে বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করত, তা বাস্তবায়ন করতেন। উসমান রাযি. নিহত হওয়ার দিন মারওয়ান তার পক্ষে প্রতিরোধ করেছিলেন। উটের যুদ্ধে তিনি আম্মাজান আয়েশা রাযি.-এর পক্ষে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তিনি আলি রাযি.-এর বায়আত গ্রহণ করেন।

তার পুত্র আবদুল মালিকও ছিলেন ইলমপিপাসু ও জ্ঞানানুরাগী। তিনি উসমান রাযি., আবু হুরায়রা রাযি., আবু সাইদ রাযি., উম্মে সালামা রাযি. প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম হতে হাদিস শ্রবণ করেছেন এবং বহু সংখ্যক তাবেয়ি হতে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

আবুয যিনাদ বলেন, 'মদিনার ফকিহ হলেন চারজন—সাইদ ইবনুল মুসাইয়াব, আবদুল মালিক (খিলাফতের পূর্বে), উরওয়া ও কুবায়সা বিন আবু যুআয়ব।'

আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের শাসনামলের বিশেষ দুটি কীর্তির কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

১. ইসলামি রাষ্ট্রের নিজস্ব মুদ্রা চালু

৭৬ হিজরি সনে (৬৯৫ খ্রিষ্টাব্দে) খলিফা আবদুল মালিক ইসলামি রাষ্ট্রের জন্য নিজস্ব মুদ্রাব্যবস্থা চালু করেন। তিনিই ইসলামি রাষ্ট্রে প্রথম মুদ্রা চালু করেন এবং মুসলিম সমাজ এর দ্বারা যথেষ্ট উপকৃত হয়।

তিনি রোমান সম্রাট ২য় জাস্টিনিয়ান (Justinian II)-এর কাছে প্রেরিত একটি পত্রের শুরুতে লিখেছিলেন, ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ 'বলুন, তিনি আল্লাহ, এক।' পত্রে তিনি নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনাও করেছিলেন। রোমান সম্রাট ফিরতি বার্তায় লেখেন, আপনারা এই এই কাজ করেছেন। এগুলো বাদ দিন, নয়তো আপনাদের কাছে আমাদের এমন স্বর্ণমুদ্রা পৌছবে, যাতে আপনাদের নবীর নাম অশোভনীয় ভাষায় উল্লেখ থাকবে।

আবদুল মালিক বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুতর বিবেচনা করে এ বিষয়ে পরামর্শ করার জন্য খালিদ বিন ইয়াযিদ বিন মুয়াবিয়াকে আহ্বান করেন। খালিদ খলিফাকে ইসলামি রাষ্ট্রে রোমান মুদ্রা নিষিদ্ধ করে মুসলমানদের জন্য আল্লাহর নাম অঙ্কিত স্বতন্ত্র মুদ্রা চালু করার পরামর্শ দেন।

আবদুল মালিক খালিদের পরামর্শ বাস্তবায়ন করে ইসলামি দিনারের প্রচলন শুরু করেন। অপরদিকে ইরাকের গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ অঙ্কিত দিরহাম তৈরি করেন। এরপর ইসলামি দিনার ও দিরহাম কালের বিবর্তনে আরও উৎকর্ষ ও উন্নতি সাধন করে। এভাবে খলিফা আবদুল মালিকই প্রথম ইসলামি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য বাস্তবায়ন করেন।

২. দাপ্তরিক কার্যক্রম আরবিকরণ

ইসলামি রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব-কর্মকাণ্ড ও অর্থ লেনদেন-সংশ্লিষ্ট নথিপত্র সংরক্ষণ এবং এসব দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাদের দপ্তরকে 'দিওয়ান' বলা হতো। ইসলামি রাষ্ট্রের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি দপ্তর ছিল দিওয়ানে খারাজ বা খারাজসংক্রান্ত দপ্তর। ইসলামের আবির্ভাবপূর্ব সাবেক সাম্রাজ্যগুলোর মতো ইসলামি রাষ্ট্রের দিওয়ানে খারাজেও তখন পর্যন্ত বিভিন্ন অনারবি ভাষা ব্যবহৃত হতো। কোনো নগরীর দপ্তরে ফার্সি ভাষা, কোথাও গ্রিক ভাষা, আবার কোথাও কিবতি ভাষা প্রচলিত ছিল। দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর রাযি. ইসলামি রাষ্ট্রে প্রথমবারের মতো দিওয়ানব্যবস্থা প্রবর্তনের পর থেকে খলিফা আবদুল মালিকের শাসনামল পর্যন্ত এ অবস্থাই বিরাজমান ছিল। এ কারণে একদিকে যেমন উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অনারব ও অমুসলিম কর্মকর্তা ইসলামি রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করছিল,

অপরদিকে এসব অনারবি ভাষা সরকারি ভাষার মর্যাদায় ইসলামি রাষ্ট্রে প্রচলিত ও ব্যবহৃত হচ্ছিল। দাপ্তরিক কাজের প্রয়োজনে সাধারণ জনগণও এ ভাষাগুলো শিক্ষা ও এসবে ব্যুৎপত্তি অর্জনে মনোনিবেশ করত। সবদিক বিবেচনায় খলিফা আবদুল মালিক সকল দপ্তরকে আরবিকরণের নির্দেশ প্রদান করেন।

উদাহরণস্বরূপ দামেশকের দিওয়ানে খারাজের প্রধান ছিলেন রোমান নাগরিক সারজুন বিন মানসুর রুমি। তিনি মুয়াবিয়া রাযি.-এর আমল থেকেই একটানা এই দায়িত্ব পালন করছিলেন। আবদুল মালিক এবার সুলায়মান বিন সাদ আল-খুশানি (আবু ছাবিত) নামক জনৈক আরব ব্যক্তিকে সমস্ত নথিপত্র রোমান ভাষা হতে আরবিতে রূপান্তরিত করার নির্দেশ দেন। এটি ৮১ হিজরি সনের (৭০০ খ্রিষ্টাব্দের) ঘটনা। এরপর সারজুনকে তার দায়িত্ব হতে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

ইরাকের দিওয়ানের প্রধান ছিলেন পারস্যের নাগরিক যাযান ফররুখ। ইয়াযিদের আমল থেকে তিনি এ দায়িত্ব পালন করছিলেন। (পূর্বে বর্ণিত) আশআছের বিদ্রোহের সময় তিনি নিহত হন। তখন খলিফা আবদুল মালিক তার পরিবর্তে সালিহ বিন আবদুর রহমানকে এ দায়িত্বে নিযুক্ত করেন এবং তাকে ইরাকি দপ্তরের সকল নথিপত্র ফার্সি থেকে আরবিতে রূপান্তরিত করার নির্দেশ দেন।

এভাবে ইসলামি রাষ্ট্রের প্রতিটি প্রধান নগরীর দিওয়ানের নথিপত্র আরবিতে রূপান্তর করা হয়। এর মাধ্যমে ইসলামি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত সকল অঞ্চল ও সম্প্রদায়ের আরবিকরণের পথ সুগম হয়। ইসলামি বিশ্বে আরবি ভাষার প্রচার-প্রসারে খলিফা আবদুল মালিকের গৃহীত এই পদক্ষেপের অনস্বীকার্য ভূমিকা আছে।

৬ নং উমাইয়া খলিফা

ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক বিন মারওয়ান

[শাওয়াল ৮৬ হিজরি—জুমাদাল উখরা ৯৬ হিজরি]

[অক্টোবর ৭০৫ খ্রিষ্টাব্দ—ফেব্রুয়ারি ৭১৫ খ্রিষ্টাব্দ]

আবদুল মালিক বিন মারওয়ানকে পঞ্চম উমাইয়া খলিফা এবং তার পিতা মারওয়ান ইবনুল হাকামকে চতুর্থ উমাইয়া খলিফা গণ্য করা হয়। আবদুল মালিকের মৃত্যুর পর তার পুত্র ওয়ালিদ খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দায়িত্ব গ্রহণকালে ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক (১ম ওয়ালিদ)-এর বয়স ছিল ছত্রিশ বছর।

খলিফা ওয়ালিদ তার শাসনামলে বেশ কিছু মহান ও গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারকর্ম সম্পাদন করেন। অত্যুজ্জ্বল কীর্তি ও অবদানের কারণে তার শাসনামলকে 'বনু উমাইয়ার ললাটশুভ্রতা' হিসেবে অভিহিত করা হয়।

তিনি জামে দামেশক (জামে উমাবি) নির্মাণ করেন। উক্ত মসজিদের নির্মাণকাজ তার পুরো খিলাফতকালজুড়ে অব্যাহত থাকে। ওয়ালিদ কুষ্ঠরোগীদের জন্য ভাতার ব্যবস্থা করেন এবং তাদের জন্য দামেশকের উপকণ্ঠে (আল-ওয়ালিদ হাসপাতাল নামে) একটি বিশেষায়িত হাসপাতাল[২৫] প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি প্রত্যেক বিকলাঙ্গ ও প্রতিবন্ধী

---

[২৫]. ৮৮ হিজরি সনে (৭০৭ খ্রিষ্টাব্দে) খলিফা ওয়ালিদের প্রতিষ্ঠিত এই হাসপাতালটি ইসলামি ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত প্রথম হাসপাতালের মর্যাদা লাভ করে। আল-ওয়ালিদ হাসপাতালে রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হতো এবং চিকিৎসা চলাকালে বিনামূল্যে খাবার সরবরাহ করা হতো। পরবর্তীকালে আব্বাসি খলিফা হারুনুর রশিদ বাগদাদে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর ইসলামি বিশ্বের বিভিন্ন ভূখণ্ডে একের পর এক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে এবং ঐতিহাসিকগণের জরিপ অনুসারে পূর্বে সমরকন্দ ও দিয়ারে বকর হতে পশ্চিমে গ্রানাডা, কর্ডোভা ও ফেজ নগরী পর্যন্ত বিস্তৃত=

নাগরিকের জন্য সরকারিভাবে একজন সেবক এবং প্রত্যেক দৃষ্টিহীন নাগরিকের জন্য একজন পথপ্রদর্শকের ব্যবস্থা চালু করেন।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মৃত্যু

ওয়ালিদের খিলাফত আমলেই ৯৫ হিজরি সনে (৭১৪ খ্রিষ্টাব্দে) ইরাকের গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ছাকাফি ইন্তেকাল করেন।

ঐতিহাসিক ইবনে কাছির রহ. লিখেছেন—

> মোটকথা, হাজ্জাজ ছিল ইরাকবাসীর অতীত অপরাধ, ইমামদের বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহ ও অশালীন আচরণ, অবাধ্যতা ও স্বেচ্ছাচারী আচরণ ইত্যাদি পাপাচারের এক শাস্তি।[২৬]

তিনি আরও লিখেছেন—

> পূর্বেও নবীজির এই হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে যে, ছাকিফ গোত্রে একজন মিথ্যুক ও একজন দুর্ধর্ষ খুনির আবির্ভাব ঘটবে। হাজ্জাজ যখন আসমা রাযি.-এর পুত্র আবদুল্লাহ বিন যুবায়র রাযি.-কে হত্যা করার পর তার কাছে উপস্থিত হয়েছিল, তখন আসমা রাযি. উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেছিলেন, 'মিথ্যুক হলো মুখতার আর দুর্ধর্ষ খুনি হলো হাজ্জাজ বিন ইউসুফ।' হাজ্জাজ ছিল নাসিবিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত; সে আলি রাযি. ও তার অনুসারীদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করত এবং বনু উমাইয়ার মারওয়ান বংশের প্রতি হৃদ্যতা রাখত। সে ছিল স্বেচ্ছাচারী ও জেদি। সামান্য সন্দেহের বশবর্তী হয়ে রক্তপাত ঘটানোয় সে ছিল অগ্রগামী। তার থেকে এমন সব কদর্য ও মারাত্মক কথা বর্ণিত হয়েছে, যার বাহ্যিক দাবি কুফরি ব্যতীত অন্য কিছু নয়। যদি সে সেসব কথা থেকে তাওবা করে থাকে এবং তা পরিহার করে থাকে, তাহলে তো ভালো; অন্যথায় তাকে এসব অন্যায়ে অভিযুক্ত হিসেবেই গণ্য করা হবে। তবে তার দোষ-ত্রুটি বর্ণনায় কিছু অতিরঞ্জনও হয়ে থাকতে পারে। কারণ, শিয়ারা বিভিন্ন কারণে তার প্রতি

=ইসলামি বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে প্রায় চারশ হাসপাতাল গড়ে ওঠে। উল্লেখ্য, আরবিতে এসব হাসপাতালকে بیمارستان (বিমারস্তান) বলা হতো। ফার্সিমূল শব্দটির অর্থ—রোগীনিবাস।

২৬. ইবনে কাছির দিমাশকি, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৯/১২৩।

> অত্যন্ত বিদ্বেষ পোষণ করত। আর তাই তারা তার বিভিন্ন কথা বিকৃত করে প্রচার করত এবং তার থেকে বর্ণনা করার সময় বিভিন্ন নোংরা ও কদর্য বাক্য সংযোজন করত।[২৭]

ইবনে কাছির রহ. আরও লিখেছেন—

> হাজ্জাজের যেসব গর্হিত কর্মকাণ্ডের কথা আমাদের কাছে বিশুদ্ধ বর্ণনায় পৌঁছেছে, তার মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ হলো তার নির্বিচারে রক্তপাত। মহান আল্লাহর দরবারে তার শাস্তি পাওয়ার জন্য এটিই যথেষ্ট। বাকি সে ইসলামি বিজয়াভিযানের প্রতি প্রবল অনুরাগী ছিল। কুরআন চর্চাকারীদের বিপুল অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রেও তার সুখ্যাতি ছিল। এ খাতে সে প্রচুর ব্যয় করত। কথিত আছে, মৃত্যুর সময় হাজ্জাজ মাত্র তিনশ দিরহাম সম্পদ রেখে যায়। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।[২৮]

উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. বলেন—

> আল্লাহর দুশমন হাজ্জাজের আর কোনো কর্মের প্রতি আমার ঈর্ষা হয় না, যেমন ঈর্ষা হয় তার কুরআনপ্রীতি ও কুরআনচর্চাকারীদের জন্য তার বিপুল অনুদানের প্রতি এবং তার মৃত্যুশয্যার এই উক্তির প্রতি—'হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করে দিন; মানুষ তো মনে করে যে, আপনি তা করবেন না।'

মৃত্যুশয্যায় হাজ্জাজ এই পঙ্‌ক্তিদ্বয় আবৃত্তি করছিলেন—

> يَا رَبِّ قَدْ حَلَفَ الْأَعْدَاءُ وَاجْتَهَدُوْا ❋ بِأَنَّنِيْ رَجُلٌ مِنْ سَاكِنِي النَّارِ
>
> أَ يَحْـلِفُـوْنَ عَـلٰى عَمْيَـاءَ وَيْحَـهُـمْ ❋ مَا عِلْمُهُمْ بِعَظِيْمِ الْعَفْوِ غَفَّارِ
>
> মালিক আমার, দুর্ভাগা ওরা শপথ করে বলে—আমি জাহান্নামি, আমি বদকার; অন্ধ ওরা জানে না আমার খোদা দয়ালু, ক্ষমাশীল-গাফফার!

---

২৭. প্রাগুক্ত, ৯/১২৪।

২৮. প্রাগুক্ত, ৯/১২৪।

বিখ্যাত তাবেয়ি হজরত হাসান বসরি রহ.-কে এ কথা অবহিত করা হলে তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! সে যদি নাজাত লাভ করে, তাহলে এ পঙ্‌ক্তিদ্বয়ের কারণেই লাভ করবে।

ইমাম আহমাদ রহ. আপন সনদে যুবায়র বিন আদি রহ. হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, একদিন আমরা হজরত আনাস বিন মালিক রাযি.-এর কাছে উপস্থিত হয়ে হাজ্জাজের জুলুমের বিষয়ে অভিযোগ করলাম। তখন তিনি বললেন, 'তোমরা ধৈর্যধারণ কর। কারণ, তোমাদের জীবনে যে বছর, কাল বা দিন অতিবাহিত হয়, তার পরবর্তী সময় পূর্বের চেয়ে মন্দ হবে, যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হবে। আমি এ কথা তোমাদের নবীজির কাছ থেকে শুনেছি।'

শা'বি রহ. বলেন, 'আল্লাহর শপথ! যদি তোমরা বেঁচে থাকো (এবং হাজ্জাজ-পরবর্তী কাল প্রত্যক্ষ করো), তখন হাজ্জাজের আকাঙ্ক্ষা করবে।'

আসমায়ি রহ. বলেন, হাসান বসরি রহ.-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'আপনি না বলেছিলেন, প্রত্যেক পরবর্তী পূর্ববর্তীর চেয়ে মন্দ হবে। তাহলে এই যে হাজ্জাজের পর এসেছেন উমর ইবনে আবদুল আজিজ?!' তিনি উত্তর দেন, 'মানুষের তো কিছু সময় স্বস্তির নিশ্বাস ফেলার প্রয়োজনও আছে।'

জনৈক ব্যক্তি সুফিয়ান সাওরি রহ.-কে জিজ্ঞেস করেছিল, 'আপনি কি হাজ্জাজ ও আবু মুসলিম খোরাসানি সম্পর্কে এ সাক্ষ্য দেবেন যে, তারা জাহান্নামি?' তিনি উত্তরে বলেন, 'যদি তারা তাওহিদের স্বীকারোক্তি প্রদান করে থাকে, তাহলে আমার উত্তর—না।'

৯৬ হিজরিতে (৭১৫ খ্রিষ্টাব্দে) জামে দামেশকের নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়। সে সময় পৃথিবীতে সৌন্দর্য, কুশলতা ও আভিজাত্যে উক্ত মসজিদের কোনো দৃষ্টান্ত ছিল না। ফিরাযদাক বলেন, 'দামেশকবাসী তাদের দেশে জান্নাতের একটি প্রাসাদে অবস্থান করছেন।' তার উদ্দেশ্য ছিল দামেশকের মসজিদ।

ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন, আব্বাসি খলিফা আমিরুল মুমিনিন আল-মাহদি যখন আল-কুদস জিয়ারতের উদ্দেশ্যে দামেশকে গমন করেন এবং জামে দামেশক প্রত্যক্ষ করেন, তখন তিনি তার সচিব আবু উবায়দ আশআরিকে বলেন, 'বনু উমাইয়া তিনটি বিষয়ে আমাদের চেয়ে অগ্রবর্তী

হয়ে গেছে। এই মসজিদ, আমার জানামতে ভূপৃষ্ঠে এর কোনো দৃষ্টান্ত নেই; মাওয়ালিদের মহত্ত্ব ও আভিজাত্য এবং উমর ইবনে আবদুল আজিজ। আল্লাহর শপথ! আমাদের মাঝে কখনো তার সমতুল্য কেউ হবে না।' এরপর যখন আল-মাহদি বাইতুল মুকাদ্দাসে পৌঁছে কুব্বাতুস সাখরা (The Dome of the Rock) অবলোকন করেন, তখন তার সচিবকে বলেন, আর এটি হলো চতুর্থটি। উল্লেখ্য, কুব্বাতুস সাখরা নির্মাণ করেছিলেন পঞ্চম উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিক বিন মারওয়ান।

খলিফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক ৯৬ হিজরি সনে মৃত্যুবরণ করেন এবং ইন্তেকালের পূর্বেই পরবর্তী খলিফা হিসেবে আপন সহোদর সুলায়মান বিন আবদুল মালিককে মনোনীত করে যান।

৭ নং উমাইয়া খলিফা

সুলায়মান বিন আবদুল মালিক বিন মারওয়ান

[জুমাদাল উখরা ৯৬ হিজরি—সফর ৯৯ হিজরি]
[ফেব্রুয়ারি ৭১৫ খ্রিষ্টাব্দ—সেপ্টেম্বর ৭১৭ খ্রিষ্টাব্দ]

ভাই ওয়ালিদের মৃত্যুর পর তার স্থলাভিষিক্ত হন সুলায়মান বিন আবদুল মালিক। জনগণ নির্বিশেষে তার নামে বায়আত গ্রহণ করে। তবে বিশিষ্ট সেনাপতি কুতায়বা বিন মুসলিম তার ব্যাপারে শঙ্কিত হন[২৯] এবং বায়আত গ্রহণ না করার সংকল্প করেন। তখন সুলায়মান তাকে বরখাস্ত করে তার পরিবর্তে ইয়াযিদ বিন মুহাল্লাবকে ইরাকের গভর্নর নিযুক্ত করেন।

সংবাদ পেয়ে কুতায়বা সুলায়মানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং তাকে অপসারণের উদ্দেশ্যে সৈন্যসমাবেশের চেষ্টা চালান। তিনি বক্তৃতার মাধ্যমে ইরাকবাসীকে সুলায়মান-বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে উদ্বুদ্ধ করলেও তারা তার আহ্বানে সাড়া দিতে অস্বীকৃতি জানায়। তখন তিনি ইরাকবাসীর প্রতি তার অতীত অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করে ইরাকের বিভিন্ন গোত্র ও গোষ্ঠীর নিন্দা ও সমালোচনা শুরু করেন। এতে ইরাকিরা ক্রুদ্ধ হয়ে তার বিরোধিতায় তৎপর হয় এবং তাকে হত্যার চেষ্টা চালায়। ৯৬

---

[২৯]. পূর্বতন খলিফা ওয়ালিদ তার ভাই সুলায়মানকে খিলাফত অধিকার হতে বঞ্চিত করে নিজ পুত্র আবদুল আজিজকে পরবর্তী খলিফা ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন। তখন হাজ্জাজ, কুতায়বা প্রমুখ গভর্নরগণও ওয়ালিদকে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু ওয়ালিদ উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করার পূর্বেই ইন্তেকাল করেন এবং সুলায়মানই খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হন। তখন কুতায়বা আশঙ্কা করেন যে, সুলায়মান নিশ্চয়ই এর প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। দ্রষ্টব্য : প্রাগুক্ত, ৯/১৫৩।

হিজরির জিলহজ মাসে বিরোধীরা সফল হয় এবং কুতায়বাকে তার এগারো ভাই ও ভ্রাতুষ্পুত্রসহ হত্যা করে।

ইবনে কাছির রহ. বলেন—

> কুতায়বা বিন মুসলিম ছিলেন সে যুগের শ্রেষ্ঠতম ও নেতৃস্থানীয় এক গভর্নর। তিনি ছিলেন একজন মহান ও খ্যাতিমান সেনাপতি, সমরকুশলী যোদ্ধা এবং প্রশংসনীয় চিন্তা ও দূরদর্শিতার অধিকারী। গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন যুদ্ধে ও ইসলামি বিজয়াভিযানে তিনি অসামান্য অবদান রেখেছেন। তার হাতে অগণিত মানুষ হিদায়াত লাভ করেছে এবং ইসলাম গ্রহণ করে দ্বীনের আনুগত্য করেছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তার কীর্তি ও কর্মপ্রচেষ্টার মূল্যায়ন করবেন, তার সংগ্রাম ও কর্মসাধনা বিফল করবেন না।
>
> কিন্তু পরিশেষে তিনি এমন এক স্খলনের শিকার হন, যা তার পতন ও মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তিনি খলিফার আনুগত্য বর্জন করেন আর মৃত্যু তাকে দ্রুত পাকড়াও করে নেয়। উম্মাহর ঐক্য ও সংঘবদ্ধতা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে তিনি জাহিলিয়াতের মৃত্যুর শিকার হন। কিন্তু তার অতীত আমল নিশ্চয়ই তার ক্রটি-বিচ্যুতি মোচন করবে এবং পুণ্যসমূহ বহুগুণে সমৃদ্ধ করবে। আল্লাহ পাক তার যাবতীয় ক্রটি উপেক্ষা করুন এবং তাকে ক্ষমা করে দিন।[৩০]

খলিফা সুলায়মান হাজ্জাজের গভর্নর ও সেনাপতিদেরকেও বরখাস্ত করেন। সুলায়মানের লোকজন এসব গভর্নর ও সেনাপতিদের ওপর অমানবিক নির্যাতন চালায়। নির্যাতনের শিকার সেনানায়ক ও গভর্নরদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন—ভারতবর্ষে বিজয়াভিযানের মহান সেনাপতি মুহাম্মাদ বিন কাসিম, সুলায়মানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী ও পরে নিহত মহান বীর কুতায়বা বিন মুসলিম, বন্দিত্বের শিকার মহান বীর সেনাপতি মুসা বিন নুসায়র এবং হত্যার শিকার মুসাপুত্র আবদুল আজিজ বিন মুসা বিন নুসায়র। শেষোক্ত দুজন ছিলেন মাগরিব, উত্তর আফ্রিকা ও আন্দালুসে পরিচালিত ইসলামি বিজয়াভিযানের দুই মহান সেনাপতি।

---

৩০. প্রাগুক্ত, ৯/১৫৪-১৫৫।

খলিফা সুলায়মানের শাসনামলে তার ভাই বিশিষ্ট সেনাপতি মাসলামা বিন আবদুল মালিকের নেতৃত্বে পুনরায় কনস্টান্টিনোপল জয়ের প্রচেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু দীর্ঘ এক বছর অবরোধ করে রাখার পরও শেষ পর্যন্ত মুসলিম বাহিনী কনস্টান্টিনোপল জয় করতে ব্যর্থ হয়। এর বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসবে।

সুলায়মান কর্তৃক উমর ইবনে আবদুল আজিজকে পরবর্তী খলিফা নির্বাচন

ঐতিহাসিক ইবনে জারির তাবারি রহ. বনু উমাইয়ার নিষ্ঠাবান উজির রজা বিন হাইওয়ার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন—অসুস্থ অবস্থায় খলিফা সুলায়মান বিন আবদুল মালিক আমার সঙ্গে পরামর্শ করলেন যে, তিনি তার অপ্রাপ্তবয়স্ক এক পুত্রকে পরবর্তী খলিফা নির্ধারণ করতে চান। আমি তাকে বললাম, 'খলিফা যদি কোনো সৎ ও উপযুক্ত ব্যক্তিকে মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব দিয়ে যান, তাহলে তা মৃত্যুপরবর্তী জীবনে কল্যাণের কারণ হবে।'

এরপর তিনি তার পুত্র দাউদকে খলিফা নির্ধারণ করা যায় কি না, এ বিষয়ে আমার পরামর্শ চাইলেন। আমি বললাম, 'সে তো এখন আপনার কাছ থেকে অনেক দূরে কনস্টান্টিনোপলে যুদ্ধের ময়দানে আছে। এ তথ্যও তো জানা নেই যে, সে বেঁচে আছে, নাকি শহিদ হয়ে গেছে।' খলিফা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে আপনি কাকে ভালো মনে করেন?' আমি উত্তর দিলাম, 'আমিরুল মুমিনিন! আপনিই ভেবে দেখুন।' এরপর তিনি বললেন, 'উমর ইবনে আবদুল আজিজের বিষয়ে আপনার কী মত?' আমি বললাম, 'আল্লাহর শপথ! আমি তাকে ভালো জানি; তিনি গুণী মুসলমান; সততা ও সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন। কিন্তু আমার আশঙ্কা হয় যে, তাকে মনোনীত করা হলে আপনার ভাইয়েরা তা মেনে নেবে না।' খলিফা বললেন, 'আল্লাহর শপথ! তাকেই নির্বাচন করা হবে।'

উজির রজা এরপর খলিফাকে পরামর্শ দেন—তিনি যেন উমর ইবনে আবদুল আজিজকে পরবর্তী খলিফা ঘোষণার পাশাপাশি পরবর্তী দ্বিতীয় খলিফা হিসেবে তার ভাই ইয়াযিদ বিন আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের নামও ঘোষণা করেন। তখন মারওয়ান-পরিবার উমরের মনোনয়নে (আপত্তি না করে) সন্তুষ্ট থাকবে। উজিরের সঙ্গে পরামর্শ শেষে খলিফা সুলায়মান নিম্নোক্ত পত্র লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দেন—

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

এটি আল্লাহর বান্দা সুলায়মান বিন আবদুল মালিকের পক্ষ হতে উমর ইবনে আবদুল আজিজের উদ্দেশে লিখিত পত্র। আমি তাকে আমার অবর্তমানে খিলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করলাম এবং তার মৃত্যুর পর পরবর্তী খলিফা হিসেবে ইয়াযিদ বিন আবদুল মালিকের নাম ঘোষণা করলাম। সকলে তাকে খলিফা হিসেবে মেনে নাও এবং তার আনুগত্য করো। সকলে আল্লাহকে ভয় করো, পরস্পরে বিবাদবিসংবাদের শিকার হয়ো না। অন্যথায় তোমাদের শত্রুরা তোমাদের ওপর হামলা করার দুঃসাহস দেখাবে।

এরপর খলিফা এই শাহি ফরমান মোহরাঙ্কিত করে নিরাপত্তা বিভাগের প্রধান কাব বিন হামিদ আবাসির কাছে পাঠিয়ে দেন। খলিফা তাকে নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন উমাইয়া রাজপরিবারের সকলকে সমবেত করেন এবং সকলের কাছ থেকে উক্ত ফরমানের বিষয়বস্তু মেনে নেওয়ার বায়আত তলব করেন। কেউ বায়আত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে খলিফা তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। নিরাপত্তাপ্রধান খলিফার নির্দেশ কার্যকর করেন।

খলিফার মৃত্যুর পর উজির রজা দৃঢ়তার সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি সকলকে দাবিকের মসজিদে সমবেত হতে নির্দেশ দেন। খলিফা সুলায়মানকে দাবিকের মসজিদের পাশেই দাফন করা হয়েছিল। রজা বিন হাইওয়া ফরমানের লিখিত বক্তব্য সকলকে পাঠ করে শোনালে মারওয়ান-পরিবারের সদস্যগণ একে একে উঠে বায়আত গ্রহণ করতে থাকে। উমর ইবনে আবদুল আজিজ মসজিদের পেছন দিকে বসে ছিলেন। তিনি যখন নিশ্চিত হন যে, তাকেই পরবর্তী খলিফা নির্ধারণ করা হয়েছে, তখন তিনি বলে ওঠেন, 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।' দায়িত্বভারে নতুন খলিফার পদযুগল যেন ভারী হয়ে গিয়েছিল। উপস্থিত লোকজন তাকে ধরে মিম্বরে বসিয়ে দেয়। এরপর তিনি সকলের উদ্দেশে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী এক ভাষণ প্রদান করেন। মসজিদ থেকে বের হওয়ার পর তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য শাহি বাহন উপস্থিত করা হলে তিনি তাতে আরোহণ করতে অস্বীকৃতি জানান এবং নিজের সাধারণ বাহনে চড়ে সকলের সঙ্গে দামেশকে প্রত্যাবর্তন করেন।

খলিফা সুলায়মান বিন আবদুল মালিক ৯৯ হিজরি সনের সফর মাসে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ.

[সফর ৯৯ হিজরি—রজব ১০১ হিজরি]

[সেপ্টেম্বর ৭১৭ খ্রিষ্টাব্দ—ফেব্রুয়ারি ৭২০ খ্রিষ্টাব্দ]

খলিফা উমর বিন আবদুল আজিজ রহ.-এর জন্ম ৬১ হিজরি সনে মদিনায়। দায়িত্ব গ্রহণকালে তার বয়স ছিল আটত্রিশ বছর। তার পিতা আবদুল আজিজ ছিলেন মারওয়ান ইবনুল হাকামের পুত্র; অর্থাৎ খলিফা উমর বিন আবদুল আজিজ ছিলেন তার পূর্বতন দুই খলিফা সুলায়মান ও ওয়ালিদের চাচাতো ভাই। অপরদিকে তার মাতা ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি.-এর পুত্র আছিমের কন্যা।

উমর ইবনে আবদুল আজিজ পূর্বতন খলিফা সুলায়মান বিন আবদুল মালিকের অত্যন্ত আস্থাভাজন ছিলেন। সুলায়মান উমরের গুণ-বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা সম্পর্কে অবগত ছিলেন বলেই তাকে নির্বাচিত করেছিলেন।

একবার হজের সফরে উমর ইবনে আবদুল আজিজ খলিফা সুলায়মানের সঙ্গে ছিলেন। আরাফায় অবস্থানকালে সুলায়মান যখন বিশাল জনসমাবেশের দিকে তাকিয়ে ছিলেন, তখন উমর তাকে বলেন, 'এরা আজ আপনার প্রজা; আগামীকাল আপনি তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবেন।' আরেক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন, 'এরা আজ আপনার প্রজা আর কিয়ামতের দিন তারা আপনার প্রতিপক্ষ হবে।' উমরের কথা শুনে সুলায়মান কাঁদতে থাকেন এবং বলেন, 'আল্লাহর কাছেই আমি সাহায্য প্রার্থনা করছি।'

একদিন প্রচণ্ড বৃষ্টি ও বজ্রপাত হচ্ছিল। সুলায়মান তখন ভীত হয়ে পড়েন আর উমর ইবনে আবদুল আজিজ হাসছিলেন। সুলায়মান বললেন, 'তুমি

হাসছ?!' উমর বললেন, 'হ্যাঁ, এখন আমরা পৃথিবীতে আছি; আর এটি হলো "তাঁর" দয়ার বহিঃপ্রকাশ, তাহলে পরকালে যখন আমরা থাকব বিচারের কাঠগড়ায়, তখন তার ক্রোধ ও শাস্তির বহিঃপ্রকাশ কেমন হবে?'

ইমাম মালিক রহ. বর্ণনা করেন—একদিন সুলায়মান ও উমর ইবনে আবদুল আজিজ কোনো বিষয়ে কথা বলছিলেন। একপর্যায়ে সুলায়মান বলে বসলেন, 'তুমি মিথ্যা বলেছ।' উমর বললেন, 'আপনি বলছেন, আমি মিথ্যা বলেছি?! আল্লাহর শপথ! যেদিন আমি প্রথম জেনেছি যে, মিথ্যা বললে মিথ্যাবাদীর ক্ষতি হয়, সেদিন থেকে আমি কোনো মিথ্যা বলিনি।' এরপর ক্রুদ্ধ উমর সুলাইমানের সঙ্গ ত্যাগ করে মিশরে চলে যাওয়ার সংকল্প করলেন। কিন্তু সুলায়মান তাকে সে সুযোগ দিলেন না। তিনি তার কাছে লোক পাঠিয়ে তার সঙ্গে সন্ধি করে নিলেন এবং তাকে বললেন, 'যখনই আমি কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সম্মুখীন হয়েছি, (পরামর্শ করার জন্য) আমার মনে তোমার কথা উদিত হয়েছে।'

উমর ইবনে আবদুল আজিজের খলিফা হওয়া ছিল একটি ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবায়ন। বর্ণিত আছে, আবদুল্লাহ বিন উমর রাযি. বলেন, 'কী আশ্চর্য! মানুষ মনে করে যে, দুনিয়া ততদিন ধ্বংস হবে না, যতদিন না উমর-বংশের এক ব্যক্তি শাসনক্ষমতা লাভ করবে। সে উমরের ন্যায় শাসনকার্য পরিচালনা করবে আর তার চেহারায় একটি চিহ্ন থাকবে।'

মানুষ মনে করত যে, বিলাল বিন আবদুল্লাহ বিন উমরই হবেন সেই কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি। তার চেহারায় ক্ষতচিহ্ন ছিল। কিন্তু তিনি সেই কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন না; কাঙ্ক্ষিত সেই ব্যক্তিটি ছিলেন উমর ইবনে আবদুল আজিজ। উমর ইবনে আবদুল আজিজের মা ছিলেন খলিফা উমর রাযি.-এর পুত্র আছিমের কন্যা।

ইমাম বায়হাকি রহ. আপন সনদে উল্লেখ করেন—উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. বলেছেন, 'আমার বংশধরদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি আসবে, যার চেহারায় ক্ষতচিহ্ন থাকবে; সে শাসনদায়িত্ব লাভ করবে এবং পৃথিবীকে ন্যায়ে পূর্ণ করে দেবে।'[৩১]

---

[৩১]. সূত্র : প্রাগুক্ত, ৯/১৮০।

ইমাম আবু দাউদ রহ. তার সুনান গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

«إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ لِهٰذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِئَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا»

> আল্লাহ তাআলা এ উম্মতের জন্য প্রতি একশ বছরের মাথায় এমন কোনো মহান ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন, যিনি উম্মাহর দ্বীনি পরিস্থিতির সংস্কার করবেন।[৩২]

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ.-সহ একদল উলামায়ে কেরামের মত হলো, উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. ছিলেন হিজরি প্রথম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ও সংস্কারক।

জনসাধারণের বায়আত গ্রহণ ও পূর্বতন খলিফা সুলায়মানের জানাজা শেষে উমর ইবনে আবদুল আজিজ যখন প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন তাকে দুশ্চিন্তা ও বিষণ্নতায় ভারাক্রান্ত মনে হচ্ছিল। তখন তার ভৃত্য তাকে জিজ্ঞেস করে, 'আপনার কী হয়েছে? আপনাকে এমন দেখাচ্ছে কেন?' উমর ইবনে আবদুল আজিজ উত্তর দেন, 'কী বলছ তুমি? আমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হব না? পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত সুবিশাল ইসলামি সাম্রাজ্যে বিদ্যমান মুসলিম উম্মাহর এমন কোনো সদস্য নেই, যে আমার কাছে তার প্রাপ্য অধিকার আদায় করে দেওয়ার দাবি করছে না; চাই সে আমাকে তা পত্রের মাধ্যমে অবহিত করুক কিংবা না করুক।'

খলিফা হওয়ার পর উমর ইবনে আবদুল আজিজ স্ত্রী ফাতেমাকে এই ইচ্ছাধিকার প্রদান করেন যে, তিনি চাইলে স্বামীর সঙ্গে থাকতে পারেন; সে ক্ষেত্রে তার সান্নিধ্যে সময় কাটানোর অবকাশ খলিফার থাকবে না, আবার চাইলে তিনি তার পিতৃগৃহেও চলে যেতে পারেন। তার এ কথা শুনে ফাতেমা কান্নায় ভেঙে পড়েন। তার কান্না দেখে দাসীরাও কাঁদতে থাকে। মহীয়সী এই নারী সর্বাবস্থায় স্বামীর সঙ্গে অবস্থান করাকেই পছন্দ করেন। আল্লাহ তাআলা তার প্রতি দয়ার আচরণ করুন।

খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর উমর ইবনে আবদুল আজিজ উপস্থিত জনগণের সম্মুখে দণ্ডায়মান হন এবং প্রথমে আল্লাহ পাকের হামদ ও ছানা পাঠ করেন। এরপর তিনি বলেন,

---

৩২. *সুনানে আবি দাউদ*, হাদিস নং ৪২৯১।

> হে লোকসকল, যারা আমাদের সাহচর্য কামনা করে, তারা যেন অবশ্যই পাঁচটি বিষয় অবলম্বন করে। যারা এসব বিষয় অবলম্বন করতে পারবে না, তারা যেন আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

- তারা যেন আমাদেরকে সেসব অসহায় মানুষের প্রয়োজনের কথা অবহিত করে, যারা নিজেরা তা অবহিত করতে পারে না।
- তারা যেন আমাদেরকে কল্যাণকাজে সহযোগিতা করতে সর্বোচ্চ সচেষ্ট থাকে।
- যেসব কল্যাণক্ষেত্রের নির্দেশনা আমাদের কাছে নেই, তারা যেন সেসব বিষয়ে আমাদের পথনির্দেশ করে।
- তারা যেন আমাদের কাছে পরনিন্দা ও দোষচর্চা না করে।
- তারা যেন অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় কোনো বিষয়ে প্রবৃত্ত না হয়।

তার এ ভাষণ শুনে কবি ও বক্তার দল তার কাছ থেকে সরে পড়ে আর ফকিহ ও দুনিয়াবিমুখ ব্যক্তিগণ তার দরবার-সাহচর্য গ্রহণ করে।

খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. ইলম ও ফিকহ, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং নসিহত ও সদুপদেশের মাধ্যমে ইসলামি সাম্রাজ্য পরিচালনা করতে থাকেন। তিনি ছিলেন একজন আদর্শ শাসক। জনসাধারণ তার সুশাসনে প্রভাবিত হয় এবং জনপরিস্থিতির আমূল সংস্কার সাধিত হয়।

জীবনের শেষ ভাষণে তিনি আল্লাহ তাআলার হামদ ও ছানা পাঠের পর বলেন—

> হামদ ও ছানার পর, নিঃসন্দেহে তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করা হয়নি আর তোমাদেরকে এমনিই ছেড়ে দেওয়াও হবে না। তোমাদের জন্য রয়েছে এক প্রত্যাবর্তনস্থল, যেখানে আল্লাহ তাআলা তোমাদের মাঝে বিচার ও ফয়সালা করার জন্য অবতরণ করবেন। সুতরাং যে আল্লাহর রহমত হতে বেরিয়ে গেছে এবং বঞ্চিত হয়েছে সেই জান্নাত থেকে, যার ব্যাপ্তি আসমান-জমিনের ন্যায়, নিঃসন্দেহে সে ব্যর্থ ও বিফল হয়েছে। তোমরা কি জানো না যে, ওই ব্যক্তি ছাড়া কেউ আগামী দিন নিরাপদ নয়, যে শেষ দিবস সম্পর্কে সতর্ক ও ভীত হয়েছে এবং অবিনশ্বরের বিনিময়ে নশ্বরকে, অনিঃশেষের বিনিময়ে নিঃশেষকে, অধিকের বিনিময়ে

> স্বল্পকে ও নিরাপত্তার বিনিময়ে ভয়কে বিক্রি করেছে। তোমরা কি লক্ষ করছ না যে, তোমরা মৃতদের পরিত্যক্ত সম্পদই ভোগ করছ আর তোমাদের মৃত্যুর পর তা ভোগ করবে তোমাদের পরবর্তীগণ। এভাবে একসময় তা পৌঁছে যাবে চূড়ান্ত মালিকানা গ্রহণকারীর কাছে। তারপর দেখো, তোমরা প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় কাউকে না কাউকে আল্লাহর পথে বিদায় জানাচ্ছ। সে আর কখনো ফিরে আসবে না। কারণ, সে তো তার 'আজাল' ও আয়ু পূর্ণ করে ফেলেছে। তোমরা তাকে বিছানা-বালিশ ছাড়া মাটির কোলে জমিনের এক ফাটলে অদৃশ্য করে দিচ্ছ। সে তার প্রিয়জনদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে; তার সামনে কেবল মাটি আর হিসাবের ঘাঁটি! সে তার আমলের সঙ্গে আবদ্ধ। পৃথিবীতে যা সে রেখে গেছে, তা তার কোনো প্রয়োজন নেই; তার প্রয়োজন কেবল তা-ই, যা সে অগ্রে প্রেরণ করেছে। সুতরাং চূড়ান্ত বিচারের পূর্বেই আল্লাহকে ভয় করো; মৃত্যুর পূর্বেই খোদাভীতি অর্জন করো। শুনে রাখো, আমি এ কথা বলছি।

বক্তব্য শেষ করে খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ আপন চাদরের প্রান্ত মুখের ওপর রেখে কাঁদতে থাকেন, উপস্থিত শ্রোতারাও কাঁদতে থাকে।

খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. তার অতি সংক্ষিপ্ত শাসনামলে ন্যায় প্রতিষ্ঠার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন; আপন কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে জুলুম ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করেছেন, প্রত্যেক হকদারকে তার হক ফিরিয়ে দিয়েছেন। প্রতিদিন তার পক্ষ হতে ঘোষক ঘোষণা করত, ঋণগ্রস্তরা কোথায়? বিবাহ ইচ্ছুকরা কোথায়? দরিদ্ররা কোথায়? এতিমরা কোথায়? খলিফা তাদের সকলের প্রয়োজন পূরণ করতেন।

খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ.-এর কীর্তিময় জীবনের কয়েকটি খণ্ডচিত্র

[এক]

একদিন তিনি তার স্ত্রীর কাছে উপস্থিত হয়ে কিছু আঙুর কেনার জন্য এক দিরহাম চাইলেন। কিন্তু স্ত্রীর কাছে এক দিরহামও ছিল না। খলিফাপত্নী প্রশ্ন করলেন, 'আপনি আমিরুল মুমিনিন; আপনার কোষাগারে কিছু আঙুর কেনার অর্থও নেই?'

খলিফা উত্তর দিলেন, 'কাল (কিয়ামতের দিন) বেড়ি ও শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হওয়ার চেয়ে এই নিঃস্ব অবস্থাই আমার জন্য সহজ।'

[দুই]

খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজের কাছে দুটি প্রদীপ ছিল। তিনি একটি প্রদীপ ব্যবহার করতেন ব্যক্তিগত লেখালেখির সময়, আরেকটি ব্যবহার করতেন রাষ্ট্রীয় নথিপত্র লেখার সময়। দ্বিতীয় প্রদীপটি রাষ্ট্রীয় কোষাগারের তেল ব্যবহার করে জ্বালানো হতো। সেই প্রদীপটির আলোয় তিনি ব্যক্তিগত একটি বর্ণও লিখতেন না।

[তিন]

তিনি রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভাতা বৃদ্ধি করেছিলেন। তিনি বলতেন, 'তাদের যদি সংসারের ব্যয় নির্বাহের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকে, তাহলে তারা নিশ্চিন্তে উম্মাহর খেদমতে আত্মনিয়োগ করতে পারবে।'

[চার]

উজির রজা বিন হাইওয়া বলেন, একদিন রাতে আমি উমর ইবনে আবদুল আজিজের সঙ্গে কথা বলছিলাম। হঠাৎ প্রদীপ নিভে গেল। আমি বললাম—'আমিরুল মুমিনিন, ভৃত্যকে ডেকে দিই; সে বাতিটি ঠিক করে দিক।'

তিনি উত্তর দিলেন—'না, ওকে ঘুমোতে দিন। আমি তার ওপর একসঙ্গে দুটি কাজ চাপাতে চাই না।'

'তাহলে আমিই ঠিক করে দিই'।

'না, অতিথির সেবাগ্রহণ মানবিক শিষ্টাচারবিরোধী।' খলিফা উত্তর দিলেন। তিনি নিজেই উঠে প্রদীপটি ঠিক করলেন এবং তাতে তেল ভরলেন। এরপর এসে আমাকে বললেন, 'আমি যখন উঠেছি, তখন যেমন উমর ইবনে আবদুল আজিজ ছিলাম; এখন বসার সময়ও সেই উমর ইবনে আবদুল আজিজই আছি।'

[পাঁচ]

একবার তিনি সংবাদ পেলেন—তার জনৈক সঙ্গী মৃত্যুবরণ করেছে। তিনি মৃত ব্যক্তির পরিজনের কাছে গিয়ে তাদেরকে সান্ত্বনা জানালেন। মৃত ব্যক্তির পরিবারস্থ লোকেরা তখন শোকে চিৎকার করে কাঁদছিল। তিনি তাদেরকে বললেন, 'থামো; তোমাদের এই আত্মীয় তোমাদেরকে রিজিক প্রদান করতেন না; তোমাদের যিনি রিজিক দান করেন, তিনি তো চিরঞ্জীব, তার মৃত্যু নেই। তোমাদের এই আত্মীয় তোমাদের কারও গর্ত পূরণ করেননি; তিনি কেবল নিজের গর্তই পূরণ করেছেন। মনে রেখো, তোমাদের প্রত্যেকের জন্যই আছে একটি করে গর্ত; আল্লাহর শপথ! সে অবশ্যই তা পূর্ণ করবে। সুতরাং কেউ যদি কাঁদতে চায়, সে যেন নিজের জন্য কাঁদে। কারণ, আজ তোমাদের সঙ্গী যে গন্তব্যে গমন করেছেন, আগামীকাল সবাই সেখানেই গমন করবে।'

[ছয়]

তিনি তার গভর্নরদের উদ্দেশে প্রেরিত পত্রে লিখতেন, নামাজের সময় হলে সব ধরনের ব্যস্ততা পরিহার করবে। কারণ, যে নামাজে অবহেলা করে, সে ইসলামের অন্যান্য বিধানে আরও বেশি অবহেলা করে তা বিনষ্ট করবে।

[সাত]

তিনি তার গভর্নরদের কাছে উপদেশমূলক বিভিন্ন পত্র প্রেরণ করতেন। কখনো এমনও হতো যে, পত্রপাঠ করে গভর্নর আপন দায়িত্ব হতে অব্যাহতি প্রদান করত। আবার কখনো তার প্রদত্ত উপদেশমালার প্রভাব-তীব্রতার কারণে কর্মকর্তাদের কেউ কেউ দায়িত্বে অব্যাহতি দিয়ে দূর পথ পাড়ি দিয়ে ফিরে আসত। প্রকৃতপক্ষে এর রহস্য হলো—নসিহত ও

উপদেশ যখন বক্তার হৃদয়-গহীন থেকে নিষ্ঠাপূর্ণ আবেগে নিঃসৃত হয়, তখন তা শ্রোতার হৃদয়গভীরে প্রবেশ করে।

একবার তিনি জনৈক গভর্নরকে লিখলেন, আমি তোমাকে জাহান্নামে জাহান্নামিদের অনন্তকাল দীর্ঘ বিনিদ্র রজনীর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। নিজেকে নিয়ে তোমার ব্যস্ততা যেন তোমাকে আল্লাহ হতে বিমুখ না করে আর এরূপ উদাসীন অবস্থা যেন তোমার অন্তিম মুহূর্ত এবং আমাদের আশাভঙ্গের কারণ না হয়।

বর্ণনাকারীগণ বলেন, পত্র পাঠ করার পর সেই গভর্নর নিজেই দায়িত্বে অব্যাহতি প্রদান করে উমর ইবনে আবদুল আজিজের নিকট চলে এলেন। খলিফা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে?!'

'আমিরুল মুমিনিন! আপনি তো আপনার পত্র দ্বারা আমার হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। আল্লাহর শপথ! আমি আর কখনো কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করব না।' গভর্নর উত্তর দিলেন।

[আট]

একবার জনৈক ব্যক্তি তাকে বলল, 'আল্লাহ আপনাকে ইসলামের পক্ষ থেকে উত্তম বিনিময় দান করুন।' উত্তরে তিনি বললেন, 'বরং আল্লাহ ইসলামকে আমার পক্ষ থেকে উত্তম বিনিময় দান করুন।'

খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ.-এর মৃত্যু

ঐতিহাসিকগণ উমর ইবনে আবদুল আজিজের মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, তার জনৈক ক্রীতদাস বনু উমাইয়ার পক্ষ হতে ষড়যন্ত্র করে তার খাবার বা পানীয়তে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল। বনু উমাইয়ার প্রতি খলিফার কঠোর আচরণ এবং জনগণের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে আত্মসাৎকৃত সম্পদ তাদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করে জনগণকে ফেরত প্রদান ইত্যাদি বিষয় বনু উমাইয়াকে তার প্রতি বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল।

উমর বিন আবদুল আজিজের বারোজন সন্তান ছিল। মৃত্যুর পূর্বে তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনার সন্তানরা তো দরিদ্র ও নিঃস্ব। তাদের জন্য কিছু অসিয়ত করে যাবেন না?

উত্তরে তিনি বলেন,

﴿إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ﴾

> আমার অভিভাবক তো আল্লাহ; যিনি কিতাব নাজিল করেছেন আর তিনি পুণ্যবানদের অভিভাবকত্ব করেন।
>
> [সুরা আরাফ : ১৯৬]

আল্লাহর শপথ! আমি তাদেরকে অন্য কারও হক প্রদান করব না। তারা তো দুই অবস্থা হতে মুক্ত নয়। যদি তারা সৎ হয়, তাহলে চিন্তা কীসের! আল্লাহই তো সৎকর্মশীলদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আর যদি তারা অসৎ হয়, তাহলে আমি তাদের পাপাচারে সহযোগিতা করতে পারি না।

এরপর তিনি তার পুত্রদেরকে ডেকে এনে অন্তিম বিদায় জানান এবং তাদেরকে সান্ত্বনা দেন। সবশেষে তিনি তাদেরকে বলেন, 'যাও, আল্লাহই তোমাদের রক্ষা করবেন এবং তোমাদের উত্তম তত্ত্বাবধান করবেন।'

> বর্ণনাকারীগণ উল্লেখ করেছেন, আমরা উমর ইবনে আবদুল আজিজের জনৈক পুত্রকে আল্লাহর রাস্তায় আশিটি ঘোড়ায় পূর্ণ যুদ্ধসরঞ্জাম দান করতে দেখেছি। বিপরীতে পূর্বতন খলিফা সুলায়মান বিন আবদুল মালিক তার সন্তানদের জন্য প্রচুর সম্পদ রেখে গিয়েছিলেন। তার জনৈক পুত্রকে আমরা উমর ইবনে আবদুল আজিজের সন্তানদের কাছে হাত পাততে দেখেছি। এর রহস্য হলো—উমর ইবনে আবদুল আজিজ তার সন্তানদের মহান আল্লাহর হাওয়ালা করে গিয়েছিলেন; তাই আল্লাহ তাদেরকে অমুখাপেক্ষী করে দিয়েছেন। আর সুলায়মান ও অন্যান্য শাসক তাদের সন্তানদের রেখে গিয়েছিল সম্পদের হাওয়ালা করে; সন্তানরা তাদের সম্পদ নষ্ট করেছে আর সম্পদ ধ্বংস হয়েছে সন্তানদের প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণে।

এরপর তিনি উপস্থিত পরিবারস্থ লোকদেরকে কামরা হতে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন। সকলে বের হয়ে গেলেও খলিফাপত্নী ফাতিমা ও তার ভাই মাসলামা বিন আবদুল মালিক দরজায় বসে থাকেন। এ সময় তারা খলিফাকে বলতে শোনেন, 'উজ্জ্বল অবয়ববিশিষ্টদের স্বাগতম! এগুলো তো কোনো মানুষ বা জিনের অবয়ব নয়'!

এরপর তিনি তেলাওয়াত করেন—

﴿تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْاَرْضِ وَ لَا فَسَادًا ؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ﴾

ওই পরকালীন নিবাস তো আমি সে সকল লোকের জন্যই নির্ধারণ করব, যারা পৃথিবীতে বড়ত্ব দেখাতে ও ফাসাদ সৃষ্টি করতে চায় না। শেষ পরিণাম তো মুত্তাকিদেরই অনুকূলে থাকবে। [সুরা কাসাস : ৮৩]

এরপর খলিফার কণ্ঠস্বর স্তিমিত হয়ে আসে। সকলে ভেতরে প্রবেশ করে দেখতে পায়—তার চক্ষুযুগল বন্ধ, তিনি কিবলামুখী হয়ে আছেন এবং ইন্তিকাল করেছেন।

খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. চল্লিশ বছর বয়সে ১০১ হিজরি সনের ২৫ রজব (৭২০ খ্রিষ্টাব্দের ১০ ফেব্রুয়ারি) হিমসের দাইরে সিমআন এলাকায় ইন্তেকাল করেন। তাঞ্জিয়া

ইয়াযিদ বিন আবদুল মালিক বিন মারওয়ান

[রজব ১০১ হিজরি—শাবান ১০৫ হিজরি]

[ফেব্রুয়ারি ৭২০ খ্রিষ্টাব্দ—জানুয়ারি ৭২৪ খ্রিষ্টাব্দ]

খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণকালে ইয়াযিদ বিন আবদুল মালিকের (২য় ইয়াযিদ) বয়স ছিল উনত্রিশ বছর। খিলাফতের দায়িত্ব লাভের পূর্বে ইয়াযিদ নিয়মিত উলামায়ে কেরামের সাহচর্য গ্রহণ করতেন। দায়িত্ব গ্রহণ করার পর তিনি পূর্ববর্তী খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ.-এর পদাঙ্ক অনুসরণের সংকল্প করেন। কিন্তু তার চারপাশে সঙ্গী হিসেবে যারা ছিল, তারা মোটেও সৎ ছিল না। তারা খলিফাকে ভুল পথে পরিচালিত করে এবং তার সামনে অন্যায়-অনাচারকে সুদৃশ্যরূপে উপস্থাপন করে।

ইয়াযিদ বিন মুহাল্লাবের বিদ্রোহ (১০১ হিজরি)

ইয়াযিদ বিন মুহাল্লাব ছিলেন উমাইয়া রাজপরিবারের অন্যতম নিষ্ঠাবান ও অনুগত সেনাপতি। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তাকে হঠাৎ করেই খোরাসানের গভর্নরের দায়িত্ব হতে বরখাস্ত করেন। অথচ তিনি হাজ্জাজের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। এরপর সুলায়মান বিন আবদুল মালিকের খিলাফতকালে তাকে ইরাকের গভর্নর নিয়োগ করা হয়। উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ.-এর যুগে দ্বিতীয়বার তাকে বরখাস্ত করা হয়। উমর ইবনে আবদুল আজিজ তাকে কারাবদ্ধ করে রাখেন এবং তার কাছ থেকে সরকারি কোষাগারের অর্থ উদ্ধার করেন। ইয়াযিদ বিন মুহাল্লাব রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে প্রচুর সম্পদ আত্মসাৎ করেছিলেন। ইয়াযিদ বিন আবদুল মালিকের শাসনামলে তিনি জেলখানা থেকে পালাতে সক্ষম হন এবং ইরাকে পৌঁছে উমাইয়া খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ডাক দেন।

বসরাবাসী ইবনে মুহাল্লাবের হাতে তার পূর্ণ আনুগত্যের এবং কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণের বায়আত গ্রহণ করে। তারা আরও অঙ্গীকার করে যে, বাইরের কোনো শক্তিকে তারা ইরাকে যুদ্ধ করার সুযোগ দেবে না এবং ইরাকে নতুন কোনো ফাসেক হাজ্জাজের আগমনের সুযোগও তারা দেবে না।

হাসান বসরি রহ.-এর বিরোধিতা

এ সময় বসরার বিশিষ্ট তাবেয়ি আলিম হাসান বসরি রহ. বসরাবাসীকে ইবনে মুহাল্লাবের আহ্বানে সাড়া দিতে কঠোরভাবে নিষেধ করেন এবং এর সমূহ ক্ষতির আশঙ্কা সবার সামনে তুলে ধরেন। তিনি সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, ইতিপূর্বে ইবনুল আশআছের বিদ্রোহের সময় দীর্ঘকাল ধরে ইরাকজুড়ে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি বিরাজ করেছিল এবং প্রচুর প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছিল। হাসান বসরি ভাষণ ও বক্তৃতার মাধ্যমে মানুষের সামনে ফিতনার ভয়াবহতা তুলে ধরেন এবং তাদেরকে নিবৃত্ত থাকার নির্দেশ দেন।

কিন্তু বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলা যেন ইরাকবাসীর অস্থিমজ্জায় মিশে ছিল! যখনই কেউ বিদ্রোহের ডাক দিত, ইরাকবাসী অতি উৎসাহের সঙ্গে তাতে সাড়া দিত। তারপর প্রতিপক্ষ যখন বিদ্রোহ দমনে শক্তি প্রয়োগ করত, তখন তারা নেতাকে ফেলে দ্রুত ছত্রভঙ্গ হয়ে যেত। ইবনে মুহাল্লাবের আহ্বানেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে।

খলিফা ইয়াযিদ বিন আবদুল মালিক ইবনে মুহাল্লাবের বিদ্রোহ দমন করার জন্য মাসলামা বিন আবদুল মালিকের নেতৃত্বে শামের সৈন্যদের একটি বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন। বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল এক লক্ষ বিশ হাজার। যুদ্ধের শুরুর দিকে ইরাকের বিদ্রোহী বাহিনী ধৈর্য ও অবিচলতার পরিচয় দিয়ে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করায় ইবনে মুহাল্লাব নিজের বিজয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন। কিন্তু সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতিও বদলে যেতে থাকে এবং যুদ্ধপরিস্থিতি মাসলামার বাহিনীর অনুকূলে চলে যায়। এ সময় ইরাকি বাহিনীর মাঝে গুজব ছড়িয়ে পড়ে—যে সেতুটি পাড়ি দিয়ে তারা যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছে, তা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। তখন তারা পরাজয় মেনে নিয়ে দ্রুত পলায়ন করতে থাকে। পলায়নরত সৈন্যদের ইয়াযিদ ইবনে মুহাল্লাব জিজ্ঞেস করেন, কী হয়েছে? তোমরা এভাবে পালাচ্ছ কেন? যুদ্ধক্ষেত্র তো আমাদের নিয়ন্ত্রণেই আছে। তাকে

জানানো হয় যে, আমাদের প্রত্যাবর্তনের পথ রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। কারণ, পেছনের সেতুটিতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। ক্রুদ্ধ ইবনে মুহাল্লাব তাদেরকে অভিসম্পাত করতে থাকেন এবং অবশিষ্ট সঙ্গীদের নিয়ে যুদ্ধ অব্যাহত রাখেন। কিছুক্ষণ পর আরও কিছু সৈন্য চুপিসারে সরে পড়ে। ইবনে মুহাল্লাব গুটিকয়েক সঙ্গীকে নিয়ে তারপরও সামনে অগ্রসর হতে থাকেন এবং প্রতিপক্ষের যাকেই সামনে পান, তাকেই পরাভূত করতে থাকেন। একপর্যায়ে তিনি মাসলামার বাহিনীর এক সৈন্যের হাতে নিহত হন। তার কর্তিত মস্তক খলিফার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

ইয়াযিদ বিন মুহাল্লাবের বিদ্রোহ দমনকে খলিফা ইয়াযিদ বিন আবদুল মালিকের চার বছর ব্যাপ্ত খিলাফতকালের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কীর্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

খলিফা ইয়াযিদ বিন আবদুল মালিক ১০৫ হিজরি সনের শাবান মাসে ইন্তেকাল করেন। এ সময় তার বয়স ছিল তেত্রিশ বছর।

১০ নং উমাইয়া খলিফা

হিশাম বিন আবদুল মালিক বিন মারওয়ান

[শাবান ১০৫ হিজরি—রবিউস সানি ১২৫ হিজরি]

[জানুয়ারি ৭২৪ খ্রিষ্টাব্দ—ফেব্রুয়ারি ৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দ]

ইন্তেকালের পূর্বে ইয়াযিদ বিন আবদুল মালিক পরবর্তী দুইজন খলিফার নাম ঘোষণা করে যান। তিনি ঘোষণা করেন—তার মৃত্যুর পর খলিফা হবেন তার ভাই হিশাম বিন আবদুল মালিক বিন মারওয়ান এবং হিশামের মৃত্যুর পর খলিফা হবেন তার নিজের পুত্র ওয়ালিদ। ঘোষণা মোতাবেক ইয়াযিদের মৃত্যুর পর হিশামের নামে বায়আত গ্রহণ সম্পন্ন হয়।

খলিফা হিশাম বিন আবদুল মালিকের জন্ম ৭২ হিজরি সনে। খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণকালে তার বয়স ছিল তেত্রিশ বছর। তার পূর্বে তার তিন ভাই ওয়ালিদ, সুলায়মান ও ইয়াযিদ খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

ঐতিহাসিক ইবনে কাছির রহ. হিশাম সম্পর্কে বলেন, 'তিনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং যথার্থতার সঙ্গে সে দায়িত্ব পালন করেন।'

খলিফা হিশাম বিন আবদুল মালিক তার দুই পুত্র মুয়াবিয়া ও সুলায়মানসহ অন্য পুত্রদেরকে, ভাই মাসলামা বিন আবদুল মালিককে[৩৩] এবং চাচাতো ভাই মারওয়ান বিন মুহাম্মাদকে রোমান সাম্রাজ্যে বিজয়াভিযানে ব্যস্ত রাখতেন।

তিনি মারওয়ান-পরিবারের সদস্যদেরকে বিজয়াভিযানে অংশগ্রহণ না করা পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় অনুদান প্রদান করতেন না। আবদুল্লাহ বিন আলি বিন

---

৩৩. মাসলামা বিন আবদুল মালিক ছিলেন উমাইয়া রাজপরিবারের সেই মহান বীর সেনাপতি, বিজয়াভিযান ও যুদ্ধাভিযানে যার অধিক অংশগ্রহণ ও বীরত্বপূর্ণ অবদান বীর সাহাবি খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি.-এর সময়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিত।

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস[৩৪] বলেন, 'আমি বনু উমাইয়ার সকল খলিফার নথিপত্র সংগ্রহ করে পর্যবেক্ষণ করেছি। হিশামের নথিপত্রের চেয়ে অধিক বিশুদ্ধ-নিখুঁত ও জনবান্ধব কোনো নথিপত্র আমি পাইনি।'

নথিপত্রের নির্ভুলতা, বিশুদ্ধতা, উপযোগিতা ও কার্যকারিতা খলিফাদের পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচিত হয়। এখানে নথিপত্র দ্বারা খারাজ (কর) সংক্রান্ত নথিপত্র উদ্দেশ্য। আধুনিক অর্থনীতির ভাষায় একে বাজেট বলে, যা দ্বারা একটি রাষ্ট্রের আয়-ব্যয়ের সঠিক চিত্র উপলব্ধি করা যায়।

খলিফা হিশাম বিন আবদুল মালিকের আংটিতে اَلْحُكْمُ لِلْحَكَمِ الْحَكِيْمِ (শাসনকর্তৃত্ব একমাত্র মহাপ্রজ্ঞাবান মহাবিচারক সত্তার) বাক্যটি খচিত ছিল।

খলিফা হিশাম বিন আবদুল মালিকের মৃত্যু

খলিফা হিশাম বিন আবদুল মালিক ১২৫ হিজরি সনের রবিউস সানি মাসে তেপ্পান্ন বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুশয্যায় তিনি তার সন্তানদের ক্রন্দনরত দেখে বলেন, 'হিশাম তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছে দুনিয়া দিয়ে আর তোমরা তার প্রতি অনুগ্রহ করছ ক্রন্দন দ্বারা! সে যা সঞ্চয় করেছিল, তা তোমাদের জন্য রেখে যাচ্ছে আর যা সে অর্জন করেছিল, তোমরা তা তার জন্য ছেড়ে দিচ্ছ। আল্লাহ যদি ক্ষমা না করেন, তাহলে হিশামের পরিণতি কতই-না মন্দ হবে!'

ঐতিহাসিক ইবনে কাছির রহ. বলেন—

> আমার মতে হিশাম বিন আবদুল মালিকের মৃত্যুর সঙ্গে বনু উমাইয়ার শাসনব্যবস্থার পতনঘণ্টাও বেজে ওঠে, জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর ধারা স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং উমাইয়া রাজপরিবারের অবস্থা দুর্বল ও বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে; যদিও এরপরও প্রায় সাত বছর বনু উমাইয়ার শাসনক্ষমতা টিকে ছিল।[৩৫]

---

৩৪. তিনি ছিলেন প্রথম দুই আব্বাসি খলিফা আস-সাফফাহ ও আল-মানসুরের চাচা। খলিফা আল-মানসুর তাকে বন্দি করেন এবং বন্দি অবস্থায়ই তার মৃত্যু হয়। এর বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসবে।

৩৫. ইবনে কাছির দিমাশকি, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৯/৩২৮।

১১ নং উমাইয়া খলিফা

ওয়ালিদ বিন ইয়াযিদ বিন আবদুল মালিক

[রবিউস সানি ১২৫ হিজরি—জুমাদাল উখরা ১২৬ হিজরি]

[ফেব্রুয়ারি ৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দ—এপ্রিল ৭৪৪ খ্রিষ্টাব্দ]

খলিফা ওয়ালিদ বিন ইয়াযিদের (২য় ওয়ালিদ) জন্ম ৯০ হিজরি সনে। খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণকালে তার বয়স ছিল পঁয়ত্রিশ বছর।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তার পিতা ইয়াযিদ বিন আবদুল মালিক তাকে পরবর্তী দ্বিতীয় খলিফা ঘোষণা করে গিয়েছিলেন। কিন্তু হিশামের শাসনামলেই ওয়ালিদের বিভিন্ন অন্যায় আচরণ প্রকাশ পেতে থাকে। ওয়ালিদের অন্যায়-অশ্লীল কর্মকাণ্ডে খলিফা হিশাম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং একে কেন্দ্র করে উভয়ের সম্পর্ক শীতল হয়ে ওঠে। ওয়ালিদের আচরণে ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে খলিফা হিশাম তাকে ভবিষ্যৎ খিলাফত-অধিকার হতে অপসারণ করে নিজ পুত্র মাসলামাকে ভবিষ্যৎ খলিফা ঘোষণা করার মনস্থ করেন। কিন্তু জনরোষ ও সেনাবাহিনীর বিদ্রোহের আশঙ্কায় হিশাম তার এই ইচ্ছা বাস্তবায়ন করতে পারেননি। খলিফা হিশামের বিরাগের কথা জানতে পেরে ওয়ালিদ পালিয়ে বিরান মরুভূমি অঞ্চলে চলে যান। উভয়ের মধ্যে পত্রবিনিময় চলে এবং একে অপরকে কঠিন ভাষায় শাসাতে থাকেন। হিশাম পত্রযোগে ওয়ালিদকে কঠিন হুমকি প্রদান করেন।

হিশামের মৃত্যুর পর ওয়ালিদ বিন ইয়াযিদ খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। খিলাফতের দায়িত্ব ওয়ালিদকে আরও বেপরোয়া করে তোলে। তার পাপাচারের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পায়। খলিফা হওয়ার পরও তিনি প্রবৃত্তি-চাহিদা পূরণে অন্যায় পথে অকাতরে সময়-সম্পদ ব্যয় করতে থাকেন।

ওয়ালিদের একমাত্র চিন্তা ছিল—উমাইয়া রাজপরিবারের যেসব রাজপুত্র ও সদস্য তার বিরুদ্ধে হিশামকে সহায়তা করেছে, তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করা। তার এই আচরণের কারণে রাজপরিবার ও সাধারণ জনগণ সকলেই তার প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত তিনি ১২৬ হিজরি সনে ছত্রিশ বছর বয়সে তার চাচাতো ভাই ইয়াযিদ বিন ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিকের বাহিনীর হাতে নিহত হন।

১২ নং উমাইয়া খলিফা

ইয়াযিদ বিন ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক

[জুমাদাল উখরা ১২৬ হিজরি —জিলহজ ১২৬ হিজরি]

[এপ্রিল ৭৪৪ খ্রিষ্টাব্দ—সেপ্টেম্বর ৭৪৪ খ্রিষ্টাব্দ]

দ্বাদশ উমাইয়া খলিফা ইয়াযিদ বিন ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিকের (৩য় ইয়াযিদ) জন্ম ৮৬ হিজরি সনে। তিনি ১২৬ হিজরি সনে চল্লিশ বছর বয়সে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার পিতা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক ছিলেন ষষ্ঠ উমাইয়া খলিফা।

খলিফা তৃতীয় ইয়াযিদ ছিলেন একজন সৎ ও ন্যায়পরায়ণ শাসক। কিন্তু বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতি ছিল তার প্রতিকূলে। তিনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে এবং মারওয়ান-পরিবারে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করে। ১২৬ হিজরি সনের ৭ জিলহজ (৭৪৪ খ্রিষ্টাব্দের ২০ সেপ্টেম্বর) প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর মাধ্যমে তার অতি সংক্ষিপ্ত খিলাফতকালের সমাপ্তি ঘটে। ইয়াযিদ বিন ওয়ালিদকে 'আন-নাকিছ' বা হ্রাসকারী ডাকা হতো।[৩৬]

---

৩৬. পূর্ববর্তী খলিফা ওয়ালিদ সেনাবাহিনীর রাষ্ট্রীয় ভাতা যে পরিমাণ বৃদ্ধি করেছিলেন, তিনি তা হ্রাস করে দিয়েছিলেন। এ কারণে তাকে 'আন-নাকিছ' বা হ্রাসকারী বলা হতো। দ্রষ্টব্য: ইবনে কাছির দিমাশকি, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ১০/১৩।

সুপ্রসিদ্ধ প্রবাদবাক্য হলো—আশাজ (কপালে ক্ষতচিহ্নবিশিষ্ট) ও নাকিছ (হ্রাসকারী) ছিলেন বনু উমাইয়ার সবচেয়ে ন্যায়বান শাসক। আশাজ দ্বারা উমর ইবনে আবদুল আজিজ এবং নাকিছ দ্বারা ইয়াযিদ বিন ওয়ালিদ উদ্দেশ্য।

বর্ণিত আছে যে, তিনি বলতেন, 'হে বনু উমাইয়া, তোমরা সংগীত পরিহার করো। কারণ, তা লজ্জা হ্রাস করে, প্রবৃত্তি-চাহিদা বৃদ্ধি করে এবং মানবিকতা ও মনুষ্যত্ববোধ বিলুপ্ত করে। সংগীত মদের মতো ক্ষতিকর। সংগীতে আসক্ত ব্যক্তি মাদকাসক্ত ব্যক্তির ন্যায় যা ইচ্ছা তাই করে। যদি একান্তই তা করতে চাও, তাহলে অন্তত নারীদেরকে তা থেকে দূরে রাখবে। কারণ, সংগীত ব্যভিচারের প্রতি প্ররোচিত করে।'

তৃতীয় ইয়াযিদের মৃত্যুর পর ১২৭ হিজরি সনের শুরুতে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তার ভাই ইবরাহিম বিন ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক। কিন্তু মারওয়ান বিন মুহাম্মাদ তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং তার অনুসারীদের নিয়ে দামেশক অবরোধ করেন। তখন ভীত খলিফা ইবরাহিম বিন ওয়ালিদ দামেশক ছেড়ে পালিয়ে যান। তার খিলাফতকাল মাত্র সত্তর দিন স্থায়ী হয়। যেহেতু তিনি পূর্ণ খিলাফতের অধিকারী হতে পারেননি এবং দামেশক বাদে অবশিষ্ট ইসলামি বিশ্ব তার বায়আত গ্রহণ করেনি, তাই ঐতিহাসিকগণ তাকে খলিফা হিসেবে গণ্য করেন না।

১৩ নং ও দামেশকের শেষ উমাইয়া খলিফা

মারওয়ান বিন মুহাম্মাদ বিন মারওয়ান

[রবিউল আউয়াল ১২৭ হিজরি—জুমাদাল উখরা ১৩২ হিজরি]
[ডিসেম্বর ৭৪৪ খ্রিষ্টাব্দ—জানুয়ারি ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ]

খলিফা মারওয়ান বিন মুহাম্মাদের (২য় মারওয়ান) জন্ম ৭২ হিজরি সনে। ১২৭ হিজরি সনে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণকালে তার বয়স ছিল পঞ্চান্ন বছর। তার পিতা মুহাম্মাদ ছিলেন চতুর্থ উমাইয়া খলিফা মারওয়ান ইবনুল হাকামের পুত্র।

ইবরাহিম বিন ওয়ালিদ দামেশক ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার পর মারওয়ান বিন মুহাম্মাদ খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার খিলাফতকাল ছিল ১২৭ হিজরি হতে ১৩২ হিজরি পর্যন্ত। যুদ্ধে অতি দুঃসাহসিকতার কারণে তার উপাধি ছিল 'আল-হিমার' (গাধা)।

তিনি তার পূর্বতন দুই খলিফা ইয়াযিদ বিন ওয়ালিদ ও ইবরাহিম বিন ওয়ালিদের বায়আত প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তার শাসনামলে উমাইয়া সাম্রাজ্য ব্যাপক নৈরাজ্য ও অরাজকতার শিকার হয়। ১৩২ হিজরি সনের জুমাদাল উখরা মাসে (৭৫০ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে) উত্তর ইরাকে জাব নদীর তীরে আব্বাসিদের বিরুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধে তিনি পরাজিত হলে কার্যত উমাইয়া খিলাফতের সমাপ্তি ঘটে। এরপর তিনি পালিয়ে মিশরে চলে যান। অবশেষে ১৩২ হিজরি সনের জিলহজ মাসে (৭৫০ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে) তিনি আব্বাসিদের হাতে নিহত হন এবং এর মাধ্যমে কাগজে-কলমেও উমাইয়া শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটে। এর বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসবে, ইনশাআল্লাহ।

দামেশক-কেন্দ্রিক[৩৭] উমাইয়া খলিফাগণের তালিকা

০১	মুয়াবিয়া রাযি. বিন আবু সুফিয়ান রাযি.	:	রবিউল আউয়াল ৪১-রজব ৬০ হি. জুলাই ৬৬১-এপ্রিল ৬৮০ খ্রি.
০২	ইয়াযিদ বিন মুয়াবিয়া রাযি.	:	রজব ৬০-রবিউল আউয়াল ৬৪ হি. এপ্রিল ৬৮০-নভেম্বর ৬৮৩ খ্রি.
০৩	মুয়াবিয়া বিন ইয়াযিদ (২য় মুয়াবিয়া)	:	রবিউল আউয়াল ৬৪-জুমাদাল উলা ৬৪ হি. নভেম্বর ৬৮৩-জানুয়ারি ৬৮৪ খ্রি.
⊙	আবদুল্লাহ বিন যুবায়র রাযি.	:	মুহাররম ৬১-জুমাদাল উখরা ৭৩ হি. অক্টোবর ৬৮০-নভেম্বর ৬৯২ খ্রি.
০৪	মারওয়ান ইবনুল হাকাম বিন আবুল আস	:	জিলকদ ৬৪-রমজান ৬৫ হি. জুন ৬৮৪-এপ্রিল ৬৮৫ খ্রি.
০৫	আবদুল মালিক বিন মারওয়ান ইবনুল হাকাম	:	রমজান ৬৫-শাওয়াল ৮৬ হি. এপ্রিল ৬৮৫-অক্টোবর ৭০৫ খ্রি.
০৬	ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক বিন মারওয়ান	:	শাওয়াল ৮৬-জুমাদাল উখরা ৯৬ হি. অক্টোবর ৭০৫-ফেব্রুয়ারি ৭১৫ খ্রি.
০৭	সুলায়মান বিন আবদুল মালিক বিন মারওয়ান	:	জুমাদাল উখরা ৯৬-সফর ৯৯ হি. ফেব্রুয়ারি ৭১৫-সেপ্টেম্বর ৭১৭ খ্রি.
০৮	উমর বিন আবদুল আজিজ বিন মারওয়ান	:	সফর ৯৯-রজব ১০১ হি. সেপ্টেম্বর ৭১৭-ফেব্রুয়ারি ৭২০ খ্রি.
০৯	(২য়) ইয়াযিদ বিন আবদুল মালিক বিন মারওয়ান	:	রজব ১০১-শাবান ১০৫ হি. ফেব্রুয়ারি ৭২০-জানুয়ারি ৭২৪ খ্রি.
১০	হিশাম বিন আবদুল মালিক বিন মারওয়ান	:	শাবান ১০৫-রবিউস সানি ১২৫ হি. জানুয়ারি ৭২৪-ফেব্রুয়ারি ৭৪৩ খ্রি.
১১	(২য়) ওয়ালিদ বিন ইয়াযিদ বিন আবদুল মালিক	:	রবি. সানি ১২৫-জুমা উখরা ১২৬ হি. ফেব্রুয়ারি ৭৪৩-এপ্রিল ৭৪৪ খ্রি.

[৩৭]. যেহেতু পরবর্তীকালে আন্দালুস-কেন্দ্রিক উমাইয়া খিলাফত গড়ে উঠেছিল, তাই পার্থক্যকরণের জন্য আলোচ্য উমাইয়া খিলাফতকে দামেশকের প্রতি সম্বন্ধ করা হয়েছে।

১২	(৩য়) ইয়াযিদ বিন ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক	:	জুমাদাল উখরা ১২৬-জিলহজ ১২৬ হি. এপ্রিল ৭৪৪-সেপ্টেম্বর ৭৪৪ খ্রি.
⊙	ইবরাহিম বিন ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক	:	জিলহজ ১২৬-রবি. আউয়াল ১২৭ হি. সেপ্টেম্বর ৭৪৪-ডিসেম্বর ৭৪৪ খ্রি.
১৩	২য় মারওয়ান বিন মুহাম্মাদ বিন মারওয়ান	:	রবি. আউ. ১২৭-জুমা. উখরা ১৩২ হি. ডিসেম্বর ৭৪৪-জানুয়ারি ৭৫০ খ্রি.

বি. দ্র. ১

প্রথম উমাইয়া খলিফা হজরত মুয়াবিয়া রাযি. হতে শুরু করে দ্বাদশ উমাইয়া খলিফা ৩য় ইয়াযিদ পর্যন্ত সকল উমাইয়া খলিফার দারুল খিলাফাহ ও রাজধানী ছিল দামেশক। একমাত্র শেষ উমাইয়া খলিফা মারওয়ান বিন মুহাম্মাদ-এর দারুল খিলাফাহ ছিল 'হাররান'।

বি. দ্র. ২

কারবালা-প্রান্তরে নবী-দৌহিত্র হুসাইন রাযি.-এর মর্মান্তিক শাহাদাত-ঘটনার পরই মক্কা-মদিনাবাসী আবদুল্লাহ বিন যুবায়র রাযি.-এর হাতে খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করে এবং ইয়াযিদের খিলাফত প্রত্যাখ্যান করে। তখন থেকে আবদুল্লাহ বিন যুবায়র রাযি.-এর শাহাদাতের পূর্ব পর্যন্ত ইসলামি বিশ্ব খিলাফত প্রশ্নে দু-ভাগে বিভক্ত ছিল। অবশ্য আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর মতে তখন আবদুল্লাহ বিন যুবায়র রাযি.-ই ছিলেন একমাত্র বৈধ খলিফা। আবদুল্লাহ বিন যুবায়র রাযি.-এর শাহাদাতের পর পুনরায় পুরো ইসলামি বিশ্ব উমাইয়া খিলাফতের একক নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। অবশ্য ৩য় উমাইয়া খলিফা মুয়াবিয়া বিন ইয়াযিদের ইন্তেকালের পর প্রায় ছয় মাস উমাইয়া পরিবারের কেউ খিলাফত দাবি করেনি। এরপর ৬৪ হিজরি সনের ৩ জিলকদ বনু উমাইয়া মারওয়ান ইবনুল হাকামের হাতে খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করে। যতদিন আবদুল্লাহ বিন

যুবায়র রাযি. জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনিই ছিলেন বৈধ খলিফা। এ হিসেবে মারওয়ান ইবনুল হাকাম শাম অঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করলেও বৈধ খলিফা ছিলেন না।

বি. দ্র. ৩

ইবরাহিম বিন ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক যেহেতু পূর্ণ খিলাফতের অধিকারী হতে পারেননি এবং দামেশক বাদে অবশিষ্ট ইসলামি বিশ্ব তার বায়আত গ্রহণ করেনি, তাই ঐতিহাসিকগণ তাকে স্বতন্ত্র খলিফা গণ্য করেন না।

দ্রষ্টব্য

শাসকের বিরুদ্ধাচরণের বিধান

বনু উমাইয়ার শাসনামলে খলিফাগণের বিরুদ্ধে প্রচুর বিদ্রোহ-প্রচেষ্টা সংঘটিত হয়েছিল। আর তাই বিষয়গুরুত্বের বিবেচনায় আমরা এখানে শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বিধান সম্পর্কে সংক্ষেপে হাদিসের বিবরণ ও পূর্বসূরি উলামায়ে কেরামের মতামত তুলে ধরছি।

[এক]

ইমাম মুসলিম রহ. সাইদ বিন জুনাদা বিন আবু উমাইয়া হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন—

আমরা একদা উবাদা বিন ছামিত রাযি.-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি তখন অসুস্থ ছিলেন। আমরা তার জন্য সুস্থতার দোয়া করলাম। এরপর বললাম, আপনি আমাদেরকে নবীজির জবাননিঃসৃত কোনো হাদিস শোনান, যেন আল্লাহ তা দ্বারা আমাদেরকে উপকৃত করেন। তখন তিনি বললেন, নবীজি আমাদেরকে (ইসলামের পথে) আহ্বান করার পর আমরা তার হাতে বায়আত গ্রহণ করেছি। নবীজি যেসব বিষয়ে আমাদের কাছ থেকে বায়আত গ্রহণ করেন, তার মধ্যে ছিল—আমরা অনুরাগে ও বিরাগে, দরিদ্রতা ও সচ্ছলতায়; এমনকি আমাদের ওপর কাউকে প্রাধান্য দেওয়া হলেও সর্বাবস্থায় নবীজির পূর্ণ

আনুগত্য করব এবং নেতৃত্ব নিয়ে যোগ্যপাত্রের সঙ্গে বিরোধিতা ও বিবাদ করব না। তিনি বলেন, যতক্ষণ না তোমরা তার মধ্যে এমন সুস্পষ্ট কুফর দেখতে পাবে, যে বিষয়ে (অর্থাৎ যা কুফরি হওয়ার বিষয়ে) তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট দলিল আছে।[৩৮]

[দুই]

ইমাম মুসলিম রহ. হজরত আওফ বিন মালিক রাযি. হতে বর্ণনা করেন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

«خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُحِبُّوْنَهُمْ وَيُحِبُّوْنَكُمْ، وَيُصَلُّوْنَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّوْنَ عَلَيْهِمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُبْغِضُوْنَهُمْ وَيُبْغِضُوْنَكُمْ، وَتَلْعَنُوْنَهُمْ وَيَلْعَنُوْنَكُمْ»

তোমাদের সর্বোত্তম নেতা ও শাসক তারা, যাদেরকে তোমরা ভালোবাসো, আর তারাও তোমাদেরকে ভালোবাসে। তারা তোমাদের জন্য দোয়া করে, তোমরাও তাদের জন্য দোয়া করো। আর তোমাদের নিকৃষ্ট নেতা হচ্ছে তারা, যাদেরকে তোমরা ঘৃণা করো, তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে। তোমরা তাদেরকে অভিশাপ দাও আর তারাও তোমাদেরকে অভিসম্পাত করে।

নবীজিকে জিজ্ঞেস করা হলো, আল্লাহর রাসুল! আমরা কি তাদেরকে তরবারির মাধ্যমে প্রতিরোধ করব না? নবীজি উত্তর দিলেন—

«لَا، مَا أَقَامُوْا فِيْكُمُ الصَّلَاةَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُوْنَهُ، فَاكْرَهُوْا عَمَلَه، وَلَا تَنْزِعُوْا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ»

না, যতক্ষণ তারা তোমাদের সমাজে নামাজ কায়েম করে। যখন তোমরা তোমাদের শাসকদেরকে কোনো অপছন্দনীয় কাজ

---

[৩৮]. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ১৭০৯।

করতে দেখবে, তখন তাদের সেই কাজকে অপছন্দ করবে; কিন্তু তাদের আনুগত্য পরিহার করবে না।[৩৯]

[তিন]

ইমাম মুসলিম রহ. ফিতনাকালে মুসলিম জামাতকে আঁকড়ে থাকার অপরিহার্যতাসংক্রান্ত অধ্যায়ে নিম্নোক্ত হাদিসটিও উল্লেখ করেছেন—

«مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيْرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُه فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّه مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا، فَمَاتَ، فَمِيْتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ»

যে ব্যক্তি তার শাসকের মাঝে অপছন্দনীয় কিছু প্রত্যক্ষ করে, সে যেন ধৈর্যধারণ করে (নিবৃত্ত থাকে)। কেননা, যে ব্যক্তি জামাত থেকে এক বিঘত (কিঞ্চিৎ) পরিমাণ সরে যায় এবং এ অবস্থায়ই মারা যায়, সে 'জাহিলি মৃত্যু'র শিকার হয়।[৪০]

[চার]

হজরত আরফাজা বিন শুরাইহ রাযি. বর্ণনা করেন, আমি নবীজিকে বলতে শুনেছি—

«إِنَّه سَتَكُوْنُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هٰذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيْعٌ، فَاضْرِبُوْهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ»

অচিরেই নানা ধরনের ফিতনা-ফাসাদের উদ্ভব ঘটবে। সুতরাং যে ব্যক্তি সংঘবদ্ধ উম্মতের মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে চেষ্টা করবে, তাকে তরবারি দিয়ে হত্যা করো; সে যে-ই হোক না কেন।[৪১]

উল্লিখিত হাদিসের ভাষ্যমতে যে ব্যক্তি ন্যায়বান শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে কিংবা মুসলিম উম্মাহর ঐক্য বিনষ্ট করতে চায়, তাকে হত্যা করা বৈধ। যদি হত্যা করা ছাড়া তাকে নিবৃত্ত

---

৩৯. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ১৮৫৫।

৪০. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ১৮৪৯।

৪১. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ১৮৫২।

করা এবং তার ক্ষতি রোধ করা সম্ভব না হয়, তাহলে তাকে হত্যা করার কারণে কোনো শাস্তি হবে না।

[পাঁচ]

আল্লামা নববি রহ. বলেন—

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআ এ বিষয়ে একমত যে, অন্যায় ও পাপাচারের কারণে শাসককে বরখাস্ত করা যাবে না। ফাসেক শাসককে অপসারণ না করা এবং তার বিরুদ্ধাচরণ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হলো, একে কেন্দ্র করে পরবর্তী সময়ে ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা, রক্তপাত ও পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়। সুতরাং তাকে বহাল রাখার চেয়ে অপসারণের মধ্যে ক্ষতির দিক বেশি।[৪২]

[ছয়]

কাজি ইয়ায রহ. বলেন—

এ বিষয়ে আলিমগণের ঐকমত্য রয়েছে যে, কোনো কাফিরকে শাসক হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না এবং বিদ্যমান শাসক হতে কোনো কুফরি আচরণ-উচ্চারণ প্রকাশ পেলে সে অপসারিত হবে। তদ্রূপ শাসক যদি নামাজ পরিত্যাগ করে বা নামাজের প্রতি আহ্বান পরিত্যাগ করে, তাহলেও সে অপসারিত হবে। শাসক যদি কুফরি করে, শরিয়তে বিকৃতি সাধনের চেষ্টা করে কিংবা বিদআতের প্রচলন করে, তাহলে তার কর্তৃত্ব শেষ হয়ে যাবে, তার আনুগত্য বাতিল হয়ে যাবে এবং মুসলিম উম্মাহর কর্তব্য হবে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, তাকে অপসারণ করা এবং সম্ভব হলে কোনো ন্যায়বান শাসক নিয়োগ করা। যদি এ দায়িত্ব (ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব না হয়ে) কেবল একটি দলের পক্ষে সম্ভব হয়, তাহলে উক্ত দলের দায়িত্ব যেকোনো মূল্যে কাফির শাসককে অপসারণ করা। অপরদিকে বিদআতে লিপ্ত শাসকের ক্ষেত্রে অপসারণের সামর্থ্য আছে বলে মনে হলে তাকে অপসারণ

৪২. আবু জাকারিয়া ইয়াহইয়া নববি, *শরহু সহিহ মুসলিম*, ১২/২২৯।

করা ওয়াজিব; আর সামর্থ্যহীনতা সুনিশ্চিত হলে এ চেষ্টা করা ওয়াজিব নয়।[৪৩]

[সাত]

উলামায়ে কেরাম আরও বলেন, এর মাধ্যমে (ফাসেক শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করা) অনুপযুক্ত স্থানে মুসলিম উম্মাহর শক্তি ব্যয় থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। উম্মাহর ওপর দ্বীন কর্তৃক আরোপিত আনুগত্যের কারণে দায়িত্বশীল শাসক উম্মাহর দিক থেকে নিশ্চিন্ত থাকেন। তিনি উম্মাহর নিরাপত্তাচিন্তা করতে পারেন; উম্মাহর কাছ থেকে আত্মরক্ষার চিন্তা তাকে করতে হয় না। অপরদিকে জনগণও আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদিরে সন্তুষ্ট থাকে এবং ধৈর্যধারণ করে। যদিও এ ক্ষেত্রে জনগণকে সমূহ ক্ষতি পোহাতে হয়; কিন্তু তাদের ব্যস্ততা থাকে আপন দ্বীন নিয়ে এবং তাদের লক্ষ্য থাকে শত্রুর সম্মুখে ঐক্যবদ্ধ থাকা।

ওপরের আলোচনার সারনির্যাস হলো—

- শাসকের আচরণ-উচ্চারণে সুস্পষ্ট কুফরি পাওয়া গেলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে।
- অন্যায়-পাপাচার, জুলুম-নিপীড়ন ইত্যাদি কারণে শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না। তবে জালিম শাসকের সামনে হকের কথা বলতে হবে। এ সময় দ্বীনের দাবি বিদ্রোহ নয়; বরং নসিহত ও কল্যাণকামিতা।
- শাসকের সুস্পষ্ট কুফরি প্রকাশ পেলে বিদ্রোহ করা বৈধ হবে, যদি বিদ্রোহ করার শক্তিসামর্থ্য থাকে। বিদ্রোহে সফল হওয়ার সুচিন্তিত ও সুনিশ্চিত শক্তি থাকতে হবে, যেন বিদ্রোহের কারণে আরও বড় কোনো ফিতনা সৃষ্টি না হয়।
- ফাসেকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ অবৈধ হলেও তার অন্যায় ও পাপকাজের আনুগত্য করা যাবে না এবং জুলুম-নির্যাতনের ক্ষেত্রে তাকে সহায়তা করা যাবে না।

---

[৪৩]. প্রাগুক্ত, ১২/২২৯।

বনু উমাইয়ার শাসনামলে ইসলামি বিজয়াভিযান

ঐতিহাসিক ইবনে কাছির রহ. বলেন,

উমাইয়া রাজপরিবারের সদস্যদের মধ্যে জিহাদের প্রেরণা সর্বদা উজ্জীবিত ছিল। তাদের যেন জিহাদ ছাড়া অন্য কোনো ব্যস্ততাই ছিল না। তাদের শাসনামলে পৃথিবীর পুবে-পশ্চিমে, জলে-স্থলে সর্বত্র ইসলামের কালিমা সমুন্নত হয়। তারা কুফর ও কুফরি শক্তিকে পর্যুদস্ত করেছেন। উমাইয়া শাসনামলে কাফির-মুশরিকদের অন্তরাত্মা মুসলিম জাতির প্রভাব-ভীতিতে প্রকম্পিত থাকত। মুসলিম অভিযাত্রীগণ যে অঞ্চলেই অভিযান পরিচালনা করত, তা-ই জয় করত। প্রতিটি অভিযাত্রীদলে থাকত মহান বুজুর্গ, বিদগ্ধ আলিম ও বিশিষ্ট তাবেয়িগণ। প্রতিটি বাহিনীতেই মহান ব্যক্তিবর্গের এমন একটি জামাত থাকত, যাদের উসিলায় আল্লাহ তার দ্বীনকে বিজয়ী করতেন।

উমাইয়া শাসনামলে সুবিস্তৃত অঞ্চলজুড়ে বিজয়াভিযানের প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল। মৌলিকভাবে এসব অভিযানকে তিনটি ক্ষেত্রে ভাগ করা যায়।

১. রোমান সাম্রাজ্যের কেন্দ্রমুখী অভিযান।

২. ইসলামি রাষ্ট্রের পশ্চিমে অবস্থিত অঞ্চলে পরিচালিত অভিযান।

৩. ইসলামি রাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত অঞ্চলে পরিচালিত বিজয়াভিযান।

সমকালীন ইসলামি বিশ্বের পশ্চিমে অবস্থিত ইফ্রিকিয়া, মাগরিব ও আন্দালুস অঞ্চল ছিল খ্রিষ্টান অধ্যুষিত। এসব অঞ্চল ছিল রোমান সাম্রাজ্যের অধিভুক্ত কিংবা করদরাজ্য। অপরদিকে ইসলামি বিশ্বের উত্তর-পূর্ব দিকে বসবাসকারী অধিকাংশ সম্প্রদায় ছিল পৌত্তলিক বা মূর্তিপূজারি।

উল্লিখিত প্রতিটি ক্ষেত্রে উমাইয়া শাসনামলে পরিচালিত বিজয়াভিযান সম্পর্কে সামনে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হচ্ছে।

এক. রোমান সাম্রাজ্যের কেন্দ্রমুখী অভিযান

বর্তমান তুরস্ক তখন আনাতোলিয়া নামে পরিচিত ছিল। অঞ্চলটিকে এশিয়া মাইনর নামেও অভিহিত করা হয়। ভূমধ্যসাগর ও কৃষ্ণসাগরের মাঝে অবস্থিত এশিয়া মহাদেশের এই অঞ্চলটিই ছিল তৎকালীন রোমান (বাইজান্টাইন) সাম্রাজ্যের কেন্দ্রভূমি। উমাইয়া শাসনামলে মুসলিম অভিযাত্রীদল বারবার এ অঞ্চলে অভিযান পরিচালনা করলেও তোরোস পবর্তমালা তাদের সামনে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হয়ে দাঁড়াত। মার্সিন (Mersin) নগরীর নিকটবর্তী ভূমধ্যসাগরের উপকূলীয় অঞ্চল থেকে শুরু হয়ে উত্তর-পূর্বে আর্মেনিয়ান মালভূমিতে কৃষ্ণসাগরের নিকটবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত তোরোস পর্বতমালা রোমান সাম্রাজ্যের প্রাকৃতিক প্রহরীরূপে কাজ করত।

মুসলমানরা যদিও এ অঞ্চলে একের পর এক ধারাবাহিক অভিযান পরিচালনা করত; কিন্তু তারা এ অঞ্চলে অবস্থান না করে নিজেদের সীমান্ত এলাকায় ফিরে আসত। খলিফা মুয়াবিয়া রাযি. আনাতোলিয়া অঞ্চলে অভিযান পরিচালনার জন্য শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন দুটি বাহিনী প্রস্তুত করেছিলেন। এক বাহিনী অভিযান শেষে ফিরে আসতেই অপর বাহিনী বিশ্রাম শেষে শত্রুভূমিতে অগ্রসর হতো। এসব অভিযানের মূল টার্গেট ছিল রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল। হাদিসে বর্ণিত কনস্টান্টিপোল বিজেতা কাফেলার মর্যাদা অর্জন করার জন্য মুসলিম বাহিনী প্রবল উদ্যমে অভিযান পরিচালনা করত। কখনো মুসলিম বাহিনী কনস্টান্টিনোপলের কাছাকাছি পৌঁছে যেত, আবার কখনো আম্মুরিয়া পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হতো।

কনস্টান্টিনোপল অভিমুখে মুসলিম বাহিনীর প্রথম অভিযান পরিচালিত হয় ৪৯ হিজরি (৬৬৯ খ্রিষ্টাব্দে) মতান্তরে ৫০ হিজরি সনে (৬৭০ খ্রিষ্টাব্দে)। মুয়াবিয়া রাযি. তার পুত্র ইয়াযিদকে কনস্টান্টিনোপল অভিযানের সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করেন। অবশ্য ইয়াযিদ প্রথমে মূল বাহিনীর সঙ্গে অভিযানে বের হননি। কনস্টান্টিনোপল অভিমুখে পরিচালিত এই প্রথম অভিযানে মুসলিম বাহিনী স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল। স্থলবাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন সুফিয়ান বিন আওফ আল-আযদি রাযি. আর নৌবাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন বুছর বিন আরতাত রাযি.। মুসলিম বাহিনী কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করার পর উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ ও

প্রচুর প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। এরপর খলিফা মুয়াবিয়া রাযি. ইয়াযিদের নেতৃত্বে বিশাল সহায়তা বাহিনী প্রেরণ করেন। হজরত আবু আইয়ুব আনসারি রাযি., আবদুল্লাহ বিন উমর রাযি., আবদুল্লাহ বিন যুবায়র রাযি. ও আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি.-সহ বিশিষ্ট অনেক সাহাবি এই অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। সহায়ক বাহিনী পৌঁছলে মুসলিম বাহিনীর মনোবল বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। তারা অবরোধ আরও কঠিন করে তুলে রোমানদের সমূহ ক্ষতিসাধন করতে সক্ষম হয়। অবশ্য এই অভিযানে কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের প্রচেষ্টা সফল হয়নি। হজরত আবু আইয়ুব আনসারি রাযি. এই অভিযান চলাকালেই ইন্তেকাল করেন এবং তাকে কনস্টান্টিনোপলের কাছে দাফন করা হয়।[৪৪]

৫৩ হিজরিতে দ্বিতীয়বার কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের প্রচেষ্টা চালানো হয়। এবারের অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন ফুযালা বিন উবায়দ আল-আনসারি রাযি.। এ অভিযানে মুসলিম বাহিনী ৫৭ হিজরি সন পর্যন্ত একটানা প্রায় পাঁচ বছর কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করে রাখে; কিন্তু একদিকে প্রচণ্ড ঝড়ে মুসলিম নৌবহর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, অপরদিকে ইউরোপের বিভিন্ন এলাকা থেকে কনস্টান্টিনোপলের প্রতিরক্ষায় প্রচুর সামরিক সাহায্য পৌঁছে যাওয়ায় মুসলিম বাহিনী কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জন না করেই প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হয়।

মুসলিম নৌবাহিনীও হজরত মুয়াবিয়া রাযি.-এর আমলে সদা তৎপর ছিল। ৪৮ হিজরি সনে মুসলিম নৌবাহিনী সিসিলি দ্বীপ জয় করে। ৪৯ হিজরিতে বিজিত হয় জারবা দ্বীপ। ৫০ হিজরি সনে মুসলিম নৌবহর কনস্টান্টিনোপল অভিযানে অংশগ্রহণ করে। এরপর ৫৩ হিজরি সন হতে ৫৭ হিজরি সন পর্যন্ত ব্যাপ্ত কনস্টান্টিনোপল অবরোধেও মুসলিম নৌবহর অংশ নেয়। ৫৩ হিজরি সনে জুনাদা বিন আবু উমাইয়ার নেতৃত্বে মুসলিম নৌবাহিনী রোডস দ্বীপ জয় করে। ৫৫ হিজরি সনে বিজিত হয় ক্রিট

---

[৪৪]. ৫২ হিজরী সনে হজরত আবু আইয়ুব আনসারি রাযি. ইন্তেকাল করেন। এর ৮০৫ বছর পর ৮৫৭ হিজরী সনে উসমানি খলিফা মুহাম্মাদ আল-ফাতিহের হাতে কনস্টান্টিনোপল বিজিত হয় এবং তারও পাঁচ বছর পর ৮৬২ হিজরী সনে (১৪৫৮ খ্রিষ্টাব্দে) হজরত আবু আইয়ুব আনসারি রাযি.-এর সমাধির পাশে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়। 'জামে আবু আইয়ুব আনসারি' (The Eyüp Sultan Mosque) নামে খ্যাত এই মসজিদটি কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের পর সেখানে মুসলমানদের নির্মিত প্রথম মসজিদ।

দ্বীপ। দু-বছর পর মুসলিম নৌবহর এজিয়ান সাগরে (The Aegean Sea) অবস্থিত কনস্টান্টিনোপলের নিকটবর্তী বিভিন্ন দ্বীপ জয় করে নতুন করে কনস্টান্টিনোপল অবরোধের পথ সুগম করতে সক্ষম হয়।

রোমান সাম্রাজ্যের কেন্দ্রমুখী বিভিন্ন স্থল ও নৌ অভিযানে যেসব মুসলিম বীর যোদ্ধা বীরত্ব ও রণকুশলতার অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—আবদুর রহমান বিন খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি., মালিক বিন হুবায়রা রাযি., ফুযালা বিন উবায়দ আল-আনসারি রাযি., সুফিয়ান বিন আওফ আল-আযদি রাযি., মাআন বিন ইয়াযিদ আস-সুলামি রাযি., জুনাদা বিন আবু উমাইয়া আল-আযদি রাযি., বুসর বিন আরতাত রাযি., আবু আবদুর রহমান আল-কুবায়নি, আবদুল্লাহ বিন কুবায়স আল-ফিযারি, মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আস-সাকাফি, আমর বিন মুররা আল-জুহানি, মুনযির বিন যুহায়র প্রমুখ।

খলিফা আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের শাসনামলে রোমানরা শামে হামলা চালানোর জন্য বিশাল সৈন্যসমাবেশ ঘটায়। সংবাদ পেয়ে খলিফা তার পুত্র মাসলামা বিন আবদুল মালিকের নেতৃত্বে একটি বাহিনী রোমান সাম্রাজ্য অভিমুখে প্রেরণ করেন। রোমান সাম্রাজ্যের তুয়ানা নগরীতে উভয় বাহিনী মুখোমুখি হয় এবং মুসলিম বাহিনী নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে।[৪৫] তুয়ানা জয় করার পর মাসলামা বিন আবদুল মালিক তার বাহিনী নিয়ে আম্মুরিয়া[৪৬] অভিমুখে রওনা হন। সংবাদ পেয়ে আম্মুরিয়ার প্রশাসক শ্যামন প্রথমে চল্লিশ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী প্রেরণ করেন, এরপর নিজে আশি হাজার সৈন্য নিয়ে রওনা হন। মাসলামা রোমানদের অগ্রবর্তী বাহিনীর মোকাবিলা করার জন্য বাত্তাল বিন আমরের নেতৃত্বে দশ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী প্রেরণ করলে তারা রোমানদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। এরপর মাসলামার নেতৃত্বে মূল মুসলিম বাহিনী রোমানদের মূল বাহিনীকে পরাজিত করে। রোমান সেনাপতি শ্যামন

---

৪৫. ঐতিহাসিক বালাযুরি ও ইবনে আছাম আল-কুফির মতে তুয়ানা ও আম্মুরিয়া অভিযান খলিফা আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের শাসনামলে সংঘটিত হয়। অপরদিকে অন্যান্য অনেক ঐতিহাসিকের মতে অভিযানদুটি খলিফা আবদুল মালিকের পুত্র ওয়ালিদের শাসনামলে ৮৮ ও ৮৯ হিজরি সনে সংঘটিত হয়।

৪৬. **তুয়ানা ও আম্মুরিয়া :** তুয়ানা (Tyana) আধুনিক তুরস্কের সেন্ট্রাল আনাতোলিয়া অঞ্চলে অবস্থিত, অপরদিকে আম্মুরিয়া তুরস্কের ফ্রিজিয়া অঞ্চলে অবস্থিত। আম্মুরিয়ার বর্তমান নাম আমোরিয়াম (Amorium)।

বাত্তাল বিন আমরের হাতে নিহত হন। যুদ্ধ শেষে মুসলিম বাহিনী আম্মুরিয়া নগরীতে প্রবেশ করে প্রতিরোধকারীদের পর্যুদস্ত করে এবং নগরীটি জয় করে নেয়।

এরপর মাসলামা বিন আবদুল মালিক নাকফুরিয়া অভিমুখে রওনা হন। সংবাদ পেয়ে নাকফুরিয়ার প্রশাসক নাকফুর সত্তর হাজার সৈন্য নিয়ে মুসলিম বাহিনীর মোকাবিলায় অগ্রসর হয়। যুদ্ধের প্রথমদিকে নাকফুরের আঘাতে মাসলামা আহত হওয়ায় মুসলিম বাহিনী হতোদ্যম হয়ে পড়লেও এরপর মাসলামার প্রচেষ্টায় সকলে নবোদ্যমে রোমান বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং রোমানদের কচুকাটা করতে থাকে। যুদ্ধক্ষেত্রের বিভিন্ন স্থানে টিলার ন্যায় রোমানদের লাশের স্তূপ জমা হতে থাকে। সেনাপতি নাকফুরও এ যুদ্ধে নিহত হয়। এরপর মুসলিম বাহিনী সামনে অগ্রসর হয়ে নাকফুরিয়া নগরীও জয় করে নেয়।

নাকফুরিয়া জয় করার পর মাসলামা যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ দামেশকে প্রেরণ করে বাকি সম্পদ সৈন্যদের মাঝে বণ্টন করে দেন। এ সময় গণনা করে দেখা যায়—তুয়ানা, আম্মুরিয়া ও নাকফুরিয়া জয় করতে মোট আটশ মুসলিম সৈন্য শহিদ হয়েছে।

এরপর মুসলিম বাহিনী বিজয়াভিযান অব্যাহত রেখে রোমান সাম্রাজ্যের আরও গভীরে প্রবেশ করে। এ সময় তারা সামাওয়াতুল কুবরা অঞ্চলে পৌঁছায়। ইফরিতুন নামক জনৈক ধর্মযাজকের নেতৃত্বে সেখানে আশি হাজার রোমান সৈন্য সমবেত হয়েছিল। মুসলিম বাহিনীর আগমনসংবাদ পেয়ে রোমানরা ব্যাপক যুদ্ধপ্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং নগরপ্রাচীরের ওপর বিশটি মিনজানিক ও ত্রিশটি তিরনিক্ষেপক যন্ত্র স্থাপন করে। সেখানে পৌঁছে সেনাপতি মাসলামার নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনীও তাদের মিনজানিক স্থাপন করে গোলা নিক্ষেপ শুরু করে। একটানা চল্লিশ দিন দিবসরজনী উভয় পক্ষের মধ্যে গোলা বিনিময় ও যুদ্ধ চলতে থাকে।

চল্লিশতম দিন রাতে জনৈক রোমান যাজক মাসলামার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলে, 'মহান মুসলিম সেনাপতি! সামাওয়া অত্যন্ত সুরক্ষিত একটি দুর্গ আর দুর্গের অভ্যন্তরে প্রচুর সৈন্যও রয়েছে। ভেতর থেকে কেউ যদি দুর্গদ্বার খুলে না দেয়, তাহলে আপনারা ভেতরে প্রবেশ করতে পারবেন না, বিজয়ও অর্জন করতে পারবেন না। সামাওয়ার প্রশাসক ইফরিতুন আমার সঙ্গে অসদাচরণ করেছে এবং আমার কন্যাকে জোরপূর্বক ছিনিয়ে

নিয়েছে। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আমি আগামীকাল ভোরে আপনাদের জন্য আপনাদের সামনের এই নগরদ্বারটি খুলে দেবো। আপনি আগে থেকেই সেখানে সৈন্যসমাবেশ করে রাখবেন।'

কথামতো মাসলামা পরদিন ভোরে নির্দিষ্ট দ্বারের কাছে সৈন্যসমাবেশ করে প্রচণ্ড হামলা শুরু করেন। সুযোগমতো খ্রিষ্টান যাজক ফটকটি খুলে দিলে মুসলিম বাহিনী নগরীতে প্রবেশ করে এবং প্রবল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ে রোমান সৈন্যদের হত্যা করতে থাকে। পরাজিত রোমান সেনাপতি ইফরিতুন বেশকিছু সৈন্য নিয়ে অন্য আরেকটি ফটক দিয়ে পালিয়ে মাসিহিয়া নগরীতে চলে যায়।

এরপর মাসলামা মাসিহিয়া ও বাদরুক নগরীও জয় করেন। মাসিহিয়া অভিযানের সময় (উমর বিন আবদুল আজিজ রহ.-এর ভাই) মুহাম্মাদ বিন আবদুল আজিজ বিন মারওয়ানের হাতে ইফরিতুন নিহত হয়।

মুয়াবিয়া রাযি.-এর ইন্তেকালের পর প্রথমে হজরত হুসাইন রাযি. এবং পরে হজরত আবদুল্লাহ বিন যুবায়র রাযি.-এর বিদ্রোহ চলাকালে দীর্ঘকাল ধরে কনস্টান্টিনোপল অভিমুখে অভিযানের ধারা স্থগিত ছিল। অবশেষে ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক খলিফা হওয়ার পর পুনরায় কনস্টান্টিনোপলে অভিযান পরিচালনার মনস্থ করেন। এ সংবাদ জানতে পেরে তৎকালীন বাইজান্টাইন সম্রাট ২য় আনাসতাসিয়াস (Anastasius II) কনস্টান্টিনোপলের নিরাপত্তাব্যবস্থা আরও মজবুত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি প্রাচীন প্রাচীরগুলোর পুনর্নির্মাণ করেন, প্রাচীরের ওপর মিনজানিক স্থাপন করেন এবং উমাইয়া নৌবহরকে বাধা প্রদানের জন্য বিশেষ নৌবহর প্রতিষ্ঠা করেন। এর পাশাপাশি রোমান সম্রাট কনস্টান্টিনোপলের প্রত্যেক নাগরিককে কমপক্ষে তিন বছরের আহারদ্রব্য ও রসদসামগ্রী মজুদ করার নির্দেশ দেন।

৯৬ হিজরি সনে খলিফা ওয়ালিদের মৃত্যু হলে সুলায়মান বিন আবদুল মালিক তার স্থলাভিষিক্ত হন। ওদিকে রোমান সম্রাট আনাসতাসিয়াস এক বিদ্রোহ প্রচেষ্টায় ক্ষমতাচ্যুত হন এবং ৩য় থিওডোসিয়াস (Theodosius III) নতুন সম্রাট নির্বাচিত হন।

সুলায়মান বিন আবদুল মালিক খলিফা হওয়ার পরই রোমানরা হিমসে আক্রমণ করে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। সংবাদ পেয়ে খলিফা সুলায়মান বিন আবদুল মালিক কনস্টান্টিনোপলে অভিযান চালানোর লক্ষ্যে তার

ভাই মাসলামা বিন আবদুল মালিকের নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন। মুসলিম বাহিনী পূর্ণ এক বছর কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করে রাখে। কিন্তু তীব্র শীত, তুষারপাত ইত্যাদি কারণে মাসলামার পক্ষে কনস্টান্টিনোপল বিজয় কঠিন ও দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। মূল মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল এক লক্ষ বিশ হাজার। এ ছাড়াও তাদের সহায়তার জন্য আটশ নৌযান ও এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্যের এক বিশাল নৌবহর ছিল।

পুরো অভিযানটি খলিফা সুলায়মানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। খলিফা উত্তর শামের দাবিক নগরীতে অভিযান পরিচালনার মূল ঘাঁটি নির্ধারণ করেন এবং শপথ করেন যে, কনস্টান্টিনোপলের বিজয় বা মৃত্যু আসার পূর্বে তিনি প্রত্যাবর্তন করবেন না।

অবরোধের একপর্যায়ে রোমানরা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সন্ধির আবেদন জানায়। কিন্তু তাদের প্রদত্ত শর্তে মাসলামা সন্ধি করতে অস্বীকৃতি জানান। এরপর শীতের মৌসুমে প্রচণ্ড তুষারপাত শুরু হলে মুসলিম বাহিনী কঠিন সংকটের মুখোমুখি হয়। ঘাসের অভাবে বাহনজন্তুকে অতিরিক্ত খাবার সরবরাহ করায় একসময় মুসলিম বাহিনীর রসদ ফুরিয়ে যায়। ফলে তারা মাটি ছাড়া অন্য সবকিছু খেতে বাধ্য হয় এবং একপর্যায়ে এতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এরইমধ্যে মুসলিম বাহিনীর কাছে খলিফা সুলায়মানের মৃত্যু ও উমর ইবনে আবদুল আজিজের দায়িত্বগ্রহণের সংবাদ পৌঁছলে (নতুন খলিফার নির্দেশে) মুসলিম বাহিনী শামে ফিরে আসে। অবশ্য সেনাপতি মাসলামা প্রত্যাবর্তনের পূর্বে রোমানদেরকে কনস্টান্টিনোপলে একটি মসজিদ নির্মাণের শর্তে সন্ধি করতে বাধ্য করেন।

প্রিয় পাঠক! ভেবে দেখুন, বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের জন্য কেমন ছিল মুসলমানদের ত্যাগ ও নিষ্ঠা! স্বয়ং খলিফা সুলায়মান অভিযান পরিচালনা করতে রাজধানী ছেড়ে বের হয়ে এসেছিলেন। কনস্টান্টিনোপলের উদ্দেশে পরিচালিত বিভিন্ন অভিযানে বিশিষ্ট অনেক সাহাবি ও তাবেয়িও শহিদ হন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বিশিষ্ট সাহাবি আবু আইয়ুব আনসারি রাযি.। ইতিপূর্বে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দুই. পশ্চিমে (ইফ্রিকিয়া, মাগরিব ও আন্দালুসে) বিজয়াভিযান

সমকালীন ইসলামি ভূখণ্ড হতে পশ্চিমমুখী অভিযান মূলত উমাইয়া শাসনামলের পূর্বে খোলাফায়ে রাশিদিনের আমলেই শুরু হয়েছিল। তাই প্রথমে আমরা সংক্ষেপে খোলাফায়ে রাশিদিনের যুগের অভিযান সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করব; এরপর উমাইয়া শাসনামলের বিজয়াভিযান সম্পর্কে আলোচনা করব।

ক. খলিফা উমর রাযি. ও উসমান রাযি.-এর আমলে ইফ্রিকিয়ায় বিজয়াভিযান

একদল ঐতিহাসিকের মতে ইফ্রিকিয়া মাগরিব অর্থে ব্যবহৃত হতো।[৪৭] তাদের মতে এর দ্বারা উদ্দেশ্য বর্তমান মরক্কোর পূর্বাঞ্চল। বিস্তৃত এ অঞ্চল মূলত বিভিন্ন বার্বার (আমাজিঘ)[৪৮] জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল। বার্বার জনগোষ্ঠী বড় দুটি অংশে বিভক্ত ছিল।

১. বারানিস জাতিগোষ্ঠী : দশটি গোত্রের সমন্বয়ে 'বারানিস জাতিগোষ্ঠী' গড়ে উঠেছিল। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—আযদাজা, আওর্বা, মাছমুদা, কুতামা ও সানহাজা গোত্র। বারানিস জাতিগোষ্ঠী ছিল শহরকেন্দ্রিক নাগরিক জীবনধারায় অভ্যস্ত।

---

৪৭. ইফ্রিকিয়া ও মাগরিব অঞ্চলের পরিচিতি পূর্বে ৮ নং টীকায় গত হয়েছে।

৪৮. 'বার্বার' শব্দটি চারটি ভিন্ন যুগে ভিন্ন চারটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। হোমারের যুগে (খ্রিষ্টপূর্ব নবম শতাব্দীতে) 'বার্বার' বলে পৃথিবীর যেকোনো অঞ্চলের সেসব জাতিগোষ্ঠীকে বোঝানো হতো, যাদের ভাষা ও ধ্বনি ছিল দুর্বোধ্য। এরপর হেরোডোটাসের যুগে (খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে) শব্দটি ব্যবহৃত হতো সেসব জাতিগোষ্ঠীর জন্য, যারা গ্রিক ভাষা ও সভ্যতা সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল। বালতোসের আমলে রোম নগরীর অধিবাসীগণ ব্যতীত রোমান সাম্রাজ্যের অন্যান্য অধিবাসীদের বলা হতো 'বার্বার'। আর আরবগণ তাদের আমলে আফ্রিকান উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসকারী জাতিসমূহকে 'বার্বার' বলত। কেননা, তারা যে ভাষায় কথা বলত, আরবদের কাছে তা ছিল দুর্বোধ্য। আরবগণ অবোধগম্য ধ্বনির ক্ষেত্রে 'বার্বার' শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। [দ্রষ্টব্য : তাহির আহমাদ যাবি, *তারিখুল ফাত্‌হিল আরাবি ফি লিবিয়া*, পৃ : ২০]।

বলাবাহুল্য, আলোচ্য ক্ষেত্রে শব্দটি চতুর্থ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উল্লেখ্য, আমাজিঘ (Amazighs) বা বার্বার জাতিগোষ্ঠী ছিল অত্যন্ত একরোখা, যুদ্ধবাজ ও সাহসী জাতি। তারা একাধিকবার ইসলাম গ্রহণ করার পরও ধর্মত্যাগ করেছিল।

২. বুত্‌র জাতিগোষ্ঠী : তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—আদাসা, নাফুসা, নাফ্‌যাওয়া, লাওয়াতা (Laguatan) ইত্যাদি গোত্র। বুত্‌র জাতিগোষ্ঠী মরুকেন্দ্রিক বেদুইন জীবনধারায় অভ্যস্ত ছিল।

মিশরবিজেতা হজরত আমর ইবনুল আস রাযি. ২১ হিজরি সনে ইফ্রিকিয়া অঞ্চলের বারকা (Cyrenaica) নগরী জয় করেন এবং লাওয়াতা গোত্রকে মুসলমানদের প্রতি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হন। এ সময় লাওয়াতা গোত্রের কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করে। এরপর তিনি তার বাহিনীর অন্যতম সেনাপতি উকবা বিন নাফে আল-ফিহরিকে অভিযানের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। উকবা বিন নাফে একে একে যুআয়লা, ফায্‌যান (Fezzan) ও ওয়াদ্‌দান[৪৯] (Waddan) অঞ্চল জয় করেন। মহান সেনাপতি উকবা এই দুর্গম মরু অঞ্চলে বিশ বছর অবস্থান করে এখানকার জনসাধারণকে ইসলামের পথে আহ্বান জানাতে থাকেন। তার দাওয়াতে তার হাতে বুত্‌র জনগোষ্ঠীর (নাফুসা, নাফ্‌যাওয়া, লাওয়াতা ইত্যাদি গোত্রের) প্রচুর সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করে। যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি, তারাও উকবা ও তার সঙ্গী মুসলমানদের কাছ থেকে তাদের শাসকগোষ্ঠী রোমানদের চেয়ে কোমল ও সদয় আচরণ প্রত্যক্ষ করে।

তৃতীয় খলিফা উসমান রাযি. আবদুল্লাহ বিন আবুস সার্‌হ রাযি.-কে মিশরের গভর্নর নিযুক্ত করার পর তাকে ইফ্রিকিয়া অঞ্চলে বিজয়াভিযান পরিচালনার নির্দেশ দেন। ২৭ হিজরি সনে আবদুল্লাহ বিন আবুস সার্‌হ বিশ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে অভিযানে বের হন। নবীদৌহিত্র হজরত হাসান রাযি., হুসাইন রাযি., আবদুল্লাহ বিন যুবায়র রাযি., আবদুল্লাহ বিন উমর রাযি., আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস রাযি. ও আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি.-সহ অনেক সাহাবি উক্ত অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। সেনাপতি আবদুল্লাহ বিন আবুস সার্‌হ এ অঞ্চলে বিজয়াভিযান পরিচালনা করতে গিয়ে রোমান সাম্রাজ্যের অনুগত বার্বারি শাসক জর্জিরের বাহিনীর মুখোমুখি হন। জর্জিরের নেতৃত্বাধীন বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল এক লক্ষ বিশ হাজার। উভয় বাহিনী সাবিট্‌লা (Sbeitla)-এর নিকটে মুখোমুখি হয়। দু-পক্ষের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ ধরে প্রচণ্ড লড়াই চলতে থাকে। ভোরে যুদ্ধ শুরু হয়ে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত যুদ্ধ চলার পর

---

[৪৯]. এই সবগুলো নগরী বর্তমান লিবিয়ার অন্তর্গত।

উভয় পক্ষ পরবর্তী দিন যুদ্ধ করার জন্য আপন আপন তাঁবুতে ফিরে যায়। বিশিষ্ট সাহাবি আবদুল্লাহ বিন যুবায়র রাযি. এ সময় সেনাপতি আবদুল্লাহ বিন আবুস সার্হকে বলেন, 'এদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ তো দীর্ঘমেয়াদি রূপ নিতে যাচ্ছে। তাদের তো স্থায়ী রসদব্যবস্থা আছে আর যুদ্ধক্ষেত্র তাদেরই ভূমি। অপরদিকে আমরা ইসলামি ভূখণ্ড ও মুসলমানদের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। আমার মত হলো, আগামীকাল আমরা মুসলিম বাহিনীর একটি উপযুক্ত দলকে তাঁবুতেই প্রস্তুত রেখে যাব। বাকিরা রোমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করব। প্রতিপক্ষ যখন ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে তাদের তাঁবুতে ফিরে যাবে আর মুসলিম বাহিনীও ফিরে আসবে আপন তাঁবুতে, তখন আগে থেকে তাঁবুতে অবস্থানরত তাজাদম মুসলিম অশ্বারোহী সৈন্যরা আকস্মিকভাবে প্রতিপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। হয়তো আল্লাহ তাআলা তখন আমাদেরকে বিজয়ী করবেন।'

উপস্থিত অন্যান্য সাহাবি আবদুল্লাহ বিন যুবায়র রাযি.-এর চিন্তাকে সমর্থন করেন। পরদিন দুপুরে উভয় বাহিনী আপন আপন তাঁবুতে ফিরে এলে আবদুল্লাহ বিন যুবায়র ও তার সঙ্গে বিশ্রামরত কিছু সঙ্গী প্রতিপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। রোমান বাহিনী তখন বিশ্রামের উদ্দেশ্যে অস্ত্রশস্ত্র রেখে দিয়েছিল। আকস্মিক আক্রমণে কিংকর্তব্যবিমূঢ় রোমান বাহিনীর প্রচুর সংখ্যক সৈন্য নিহত হয়। রোমান বাহিনীর সেনাপতি জর্জিয়াও নিহত হন। মুসলিম বাহিনী প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ করে। মুসলিম বাহিনীর নিরঙ্কুশ বিজয় প্রত্যক্ষ করে ইফ্রিকিয়া অঞ্চলের গোত্রপ্রধানগণ একজোট হয়ে মুসলিম সেনাপতি আবদুল্লাহ বিন আবুস সার্হ-এর কাছে আবেদন জানায় যে, তারা মুসলমানদেরকে বার্ষিক তিনশ কিনতার স্বর্ণ প্রদান করবে; বিনিময়ে যেন মুসলিম বাহিনী তাদের থেকে নিবৃত্ত থাকে এবং তাদের এলাকায় হস্তক্ষেপ না করে। ইবনে আবুস সার্হ তাদের আবেদন গ্রহণ করে সন্ধিচুক্তি করেন।

এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে এ অঞ্চলে রোমান সাম্রাজ্যের শক্তি ও প্রভাব বিচূর্ণ হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে তারা বিভিন্নভাবে হারানো কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চালালেও কখনোই সফল হয়নি। অপরদিকে যুদ্ধবিরতির পরিবেশ ছিল মুসলমানদের জন্য ইফ্রিকিয়াবাসীর মাঝে ইসলাম প্রচারের এক সুবর্ণ সুযোগ।

৩৩ হিজরি সনে ইফ্রিকিয়াবাসী কৃত চুক্তি ভঙ্গ করলে আবদুল্লাহ বিন আবুস সারহ পুনরায় বিজয়াভিযান শুরু করেন। এরপর হজরত আলি রাযি. ও মুয়াবিয়া রাযি.-এর মধ্যে সংঘাত চলাকালে বিশেষ করে মাগরিব অঞ্চলসহ সব দিকেই ইসলামি বিজয়াভিযান স্থগিত হয়ে পড়ে। এ অবস্থা ৪৫ হিজরি সন পর্যন্ত বিরাজমান ছিল।

খ. উমাইয়া শাসনামলে মাগরিব অভিমুখী বিজয়াভিযান

হজরত মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান রাযি. খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর এ অঞ্চলে পুনরায় বিজয়াভিযানের ধারা বেগবান হয়। মুয়াবিয়া বিন খুদায়জ রাযি. ও উকবা বিন নাফে-এর নেতৃত্বে মুসলমানরা এ অঞ্চলে নতুন করে বিজয়াভিযানের পথ সুগম করে। ৪১ হিজরি সনে মুয়াবিয়া বিন খুদায়জ বেনজার্ট (Bizerte) নগরী জয় করেন। ৪৫ হিজরি সনে তিনি কামুনিয়া (বর্তমানে যেখানে কায়রোয়ান নগরী অবস্থিত) অধিকার করেন। একই বছর তিনি আবদুল্লাহ বিন যুবায়র রাযি.-এর নেতৃত্বে একটি ক্ষুদ্র বাহিনী পাঠিয়ে সুসা অঞ্চলও জয় করেন।

৫০ হিজরি সনে (৬৭০ খ্রিষ্টাব্দে) ইফ্রিকিয়া অঞ্চলের অভ্যন্তরে মুসলমানদের জন্য একটি স্থায়ী ঘাঁটি হিসেবে কায়রোয়ান নগরী নির্মাণের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। হজরত উকবা বিন নাফে-এর এক উক্তিতে কায়রোয়ান নগরী নির্মাণের প্রেক্ষাপট সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। তিনি তার সৈন্যদের বলেছিলেন, 'ইফ্রিকিয়ায় যখন কোনো মুসলিম প্রশাসক আগমন করেন, তখন এখানকার অধিবাসীরা তার ডাকে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে; আবার যখন তিনি চলে যান, তারা পুনরায় কুফরিতে ফিরে যায়। তাই হে মুসলিম অভিযাত্রীগণ, আমার মত হলো—তোমরা এমন একটি নগরী প্রতিষ্ঠা করবে, যা শেষ যুগ পর্যন্ত এ অঞ্চলে ইসলামের মর্যাদা বহন করবে।'

উকবা বিন নাফে-এর উক্ত ভাষণে মূলত প্রকৃত বাস্তবতাই ফুটে উঠেছে। ইতিপূর্বে ইফ্রিকিয়ার অনেকগুলো অঞ্চল বিজিত হয়েছিল এবং মুসলমানরা সেসব অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু যখনই মুসলিম অভিযাত্রীরা নিজেদের সীমান্ত এলাকায় ফিরে যেত, তখনই এসব অঞ্চলের অধিবাসীরা চুক্তি ভঙ্গ করত। এ কারণেই একটি মজবুত ঘাঁটি হিসেবে কায়রোয়ান নগরী নির্মাণের পরিকল্পনা সেনাপতি উকবা বিন

নাফে-এর মস্তিষ্কে উদিত হয়। তিনি প্রথমে সামরিক দিক বিবেচনায় সর্বোত্তম একটি স্থান নির্বাচন করেন। স্থানটি ছিল আরব হতে ইফ্রিকিয়া গমনের পথে সমুদ্র থেকে দূরে অবস্থিত। সমুদ্র থেকে দূরে হওয়ায় শত্রু নৌবহরের অতর্কিত হামলার হুমকি থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত ছিল, আবার মরুভূমির নিকটে হওয়ায় অবরুদ্ধ হওয়ার আশঙ্কাও কম ছিল।

নির্বাচিত স্থানটি ছিল ঘন গাছপালা ও ঝোপঝাড়ে পূর্ণ হিংস্র জন্তু ও সাপ-বিচ্ছুর আবাসস্থল। উকবা তার সঙ্গীদের গাছপালা কেটে ফেলার ও জ্বালিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলে তারা বলে, আপনি আমাদেরকে এমন এক ঘন জঙ্গল ও ঝোপঝাড়ের মধ্যে নগর নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছেন, যেখানে কারও যাওয়ার দুঃসাহস হয় না। আমরা তো হিংস্র প্রাণী, সাপ-বিচ্ছু ও অন্যান্য ক্ষতিকর কীটপতঙ্গের ক্ষতির আশঙ্কা করছি। উকবার বাহিনীতে পনেরোজন সাহাবি ছিলেন। তিনি তাদেরকে নিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করেন এবং বাকিরা আমিন-আমিন বলতে থাকে। দোয়া শেষ করে তিনি চিৎকার করে বলেন, 'হে সাপ ও হিংস্র প্রাণীরা, আমরা আল্লাহর রাসুলের সহচর। তোমরা আমাদের এখান থেকে চলে যাও। কারণ, আমরা এখানে থাকতে চাই। পরে আমরা যাকেই এখানে পাব, হত্যা করব।'

ঘোষণা শেষ হতেই সিংহ সিংহশাবক নিয়ে, বাঘ ব্যাঘ্রশাবক নিয়ে এবং সাপ সাপের বাচ্চা নিয়ে ঘন জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করে। উকবা তার সঙ্গীদের বলেন, প্রাণীগুলো এখান থেকে চলে যাওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের কোনো ক্ষতি করো না। সকল হিংস্র প্রাণী ও ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ চলে যাওয়ার পর উকবা তার বাহিনী নিয়ে নির্ধারিত স্থানে অবতরণ করেন এবং তার সঙ্গীদের এবার গাছপালা কেটে পরিষ্কার করার নির্দেশ দেন।

উকবার সঙ্গে ছিল দশ হাজার মুসলিম অভিযাত্রী। তাদের সঙ্গে বার্বার নওমুসলিমরাও যোগ দিয়েছিল। সকলে মিলে পাঁচ বছরে (৫৫ হিজরিতে/৬৭৫ খ্রিষ্টাব্দে) কায়রোয়ান নগরীর নির্মাণকাজ সমাপ্ত করে। তারা সেখানে একটি মসজিদও নির্মাণ করে। এরপর সকলে নিজেদের বাসস্থান তৈরি করে। কায়রোয়ান নগরী এ অঞ্চলে মুসলমান ও তাদের মিত্রদের ছাউনিতে পরিণত হয়। মুসলমানরা এবার এ অঞ্চলের অধিবাসীদের বিদ্রোহ-আশঙ্কা হতে নিশ্চিন্ত হয়। কায়রোয়ান পরিণত হয়

আফ্রিকায় মুসলমানদের নিরাপদ ঘাঁটি এবং মাগরিবের প্রধান ইসলামি নগরীতে।

৫৫ হিজরি সনেই খলিফা মুয়াবিয়া রাযি. উকবা বিন নাফেকে বরখাস্ত করে তার স্থলে আবুল মুহাজির বিন দিনারকে এ অঞ্চলের দায়িত্ব প্রদান করেন। আবুল মুহাজির মুসলমানদের মূল শত্রু রোমানদের দমন করতে এ অঞ্চলের বার্বার জাতিকে দাওয়াত দিয়ে আকৃষ্ট করার পথ অবলম্বন করেন। তার দাওয়াতে বার্বার নেতা কুসায়লা তার গোত্র 'আওর্‌বা'সহ ইসলাম গ্রহণ করে এবং আবুল মুহাজিরের সহযোগীতে পরিণত হয়। এরপর আবুল মুহাজির কুসায়লাকে সঙ্গে নিয়ে তিলিমসান অভিমুখে অগ্রসর হন এবং নগরীটি জয় করেন। কিন্তু ৬০ হিজরি সনে খলিফা ইয়াযিদ বিন মুয়াবিয়া দ্বিতীয়বারের মতো উকবা বিন নাফেকে ইফ্রিকিয়া অঞ্চলের গভর্নর নির্ধারণ করেন। উকবা ফিরে এসে আবুল মুহাজিরের সঙ্গে কঠোর আচরণ করেন এবং তাকে বন্দি করেন।[৫০] পাশাপাশি তিনি কুসায়লাকেও বন্দি করে তার সঙ্গে অসদাচরণ করেন। অবশ্য কুসায়লা কিছুদিন পরই পালিয়ে যায় এবং পরবর্তীকালে উকবা ও তার বাহিনীর যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করে।

উকবা বিন নাফে এবার একের পর এক অভিযান পরিচালনা করে রোমানদের সন্ত্রস্ত করে রাখেন। তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরণ করে আশেপাশের বিভিন্ন অঞ্চল জয় করতে করতে আটলান্টিকের তীর পর্যন্ত পৌঁছে যান। এ সময় তিনি বলেন—'হে আমার প্রতিপালক, যদি এ মহাসাগর প্রতিবন্ধক হয়ে না দাঁড়াত, তাহলে আমি আপনার পথে জিহাদ করতে করতে আমার যাত্রা অব্যাহত রাখতাম।' এরপর তিনি কায়রোয়ান প্রত্যাবর্তনের মনস্থ করেন।

---

৫০. আবুল মুহাজির বিন দিনার বার্বারিদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায়ের নীতি অবলম্বন করেছিলেন। তিনি একসঙ্গে একাধিক যুদ্ধক্ষেত্র উন্মুক্ত করতে চাননি। তার লক্ষ্য ছিল প্রথমে এ অঞ্চলকে পুরোপুরি রোমান প্রভাবমুক্ত করে তারপর অন্যদিকে মনোযোগ দেওয়া। অপরদিকে উকবা বিন নাফে এ নীতির বিরোধী ছিলেন। তিনি মনে করতেন, বার্বারিদের সঙ্গে এ ধরনের মিত্রতার কোনো প্রয়োজন নেই। তাই তিনি কুসায়লাকে বন্দি করে তার সঙ্গে অসদাচরণ করেন। এর ফলে বার্বারি গোত্রগুলোর জাতীয়তাবোধ জেগে ওঠে এবং উকবা বিন নাফেকে তাদের হাতে চরম মূল্য দিতে হয়। [মূল গ্রন্থের টীকা]

কিন্তু এ সময় উকবা-বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল তুলনামূলক কম। ফলে শত্রু-হামলা প্রতিরোধ করার মতো যথেষ্ট সতর্কতা তাদের ছিল না। রোমানরা এবার তিউনিসিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলে মুসলিম বাহিনীর প্রত্যাবর্তনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। পলাতক কুসায়লাও একদল বার্বার সৈন্য নিয়ে পেছন দিক থেকে এসে মুসলিম বাহিনীকে ঘিরে ফেলে। ৬৩ হিজরিতে সংঘটিত হয় তাহুদার যুদ্ধ। যুদ্ধে উকবা বিন নাফে নিহত হন, তার বাহিনী পুরোপুরি নিঃশেষ হয়ে যায়। উকবার বাহিনীতে আবুল মুহাজিরও ছিলেন। ৬৪ হিজরি সনে কুসায়লা কায়রোয়ান আক্রমণ করে মুসলমানদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়।

এরপর ইফ্রিকিয়ার দায়িত্ব প্রদান করা হয় যুহায়র বিন কায়স বালাবিকে। তিনি বারকাতে শিবির স্থাপন করে দীর্ঘদিন সেখানেই অবস্থান করেন। এ সময় বার্বার জনগোষ্ঠীর মধ্যে ধর্মত্যাগের হিড়িক পড়ে যায়। পরবর্তী সময়ে আবদুল্লাহ বিন যুবায়র রাযি.-এর শাহাদাতের পর যখন আবদুল মালিক বিন মারওয়ান মুসলিম জাহানের একচ্ছত্র অধিকার লাভ করেন এবং অভ্যন্তরীণ ফিতনা দমন করতে সক্ষম হন, তখন তিনি এ অঞ্চলে অতিরিক্ত সামরিক সহায়তা প্রেরণ করেন। যুহায়র এ সময় কুসায়লার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং মামাস-এর যুদ্ধে তাকে পরাজিত করেন। এরপর যুহায়র ইসলামি প্রাচ্যে[৫১] ফিরে আসার মনস্থ করলেও রোমান বাহিনী তার পথরোধ করে এবং তাকে হত্যা করে। এটি ৭৮ হিজরি সনের ঘটনা।

যুহায়রের শাহাদাতের পর এ অঞ্চলের দায়িত্ব লাভ করেন হাসসান বিন নোমান গাসসানি। খলিফা আবদুল মালিক তাকে ৭৮ হিজরি সনে (৬৯৭

---

[৫১]. **ইসলামি প্রাচ্য ও ইসলামি প্রতীচ্য** : আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চল ও আন্দালুস বিজিত হওয়ার পর ঐতিহাসিকগণ ইসলামি বিশ্বকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দু-ভাগে বিভক্ত করেন। পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর হতে পূর্বে ইরানি মালভূমি পর্যন্ত ইসলামি ভূখণ্ডকে বলা হতো ইসলামি প্রাচ্য আর ভূমধ্যসাগর হতে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ইসলামি ভূখণ্ডকে বলা হতো ইসলামি প্রতীচ্য। মিশরকে ইসলামি বিশ্বের উভয় অংশের মধ্যবর্তী সংযোগস্থল বিবেচনা করা হতো। আধুনিক রাষ্ট্রসীমা অনুসারে ইরাক, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, জর্ডান, লেবানন, সৌদি আরব, কুয়েত, আরব আমিরাত, কাতার, বাহরাইন, ওমান ও ইয়ামেন ছিল ইসলামি প্রাচ্যের অন্তর্ভুক্ত আর (আইবেরিয়ান উপদ্বীপসহ) মৌরিতানিয়া, মরক্কো, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া, লিবিয়া, (মরক্কো অধিকৃত) পশ্চিম সাহারা, (স্পেন অধিকৃত) বন্দরনগরী সিউটা (Ceuta) ও ম্যালিলা (Mellila) ছিল ইসলামি প্রতীচ্যের অন্তর্ভুক্ত।

খ্রিষ্টাব্দে) আফ্রিকার গভর্নর নিযুক্ত করেন। ৮৬ হিজরি সন (৭০৫ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত তিনি আফ্রিকার গভর্নর ছিলেন।

হাসসান এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে মনোনিবেশ করেন এবং পুনরায় বার্বার বারানিস জাতিগোষ্ঠীকে ইসলামে দীক্ষিত করেন। হাসসান তাদেরকে নিয়ে কারতাজিনায় আক্রমণ করেন এবং ভবিষ্যতে যেন রোমান নৌবহর নগরীটিকে বন্দর হিসেবে ব্যবহার করতে না পারে, এ উদ্দেশ্যে নগরীটি পুরোপুরি ধ্বংস করে ফেলেন। এ সময় হাসসান সম্পূর্ণ নতুন এক শত্রুর পক্ষ থেকে অভিনব এক সমস্যার সম্মুখীন হন। বার্বার বুত্‌র জাতিগোষ্ঠীর ওপর 'কাহিনা' নামক জনৈক নারী গোত্রপ্রধানের যথেষ্ট আত্মিক প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। হাসসান তাকে কোনোভাবেই দমন করতে পারছিলেন না। শেষ পর্যন্ত কাহিনা নিজেই নির্বুদ্ধিতা করে হাসসানের জন্য বিজয়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেয়। সে তার কওমকে বলে, 'আরবরা আমাদের দেশ চায় না; তারা চায় এই প্রাচুর্যপূর্ণ নগরী। কাজেই আমরা যদি এ নগরী ধ্বংস করে ফেলি, আঙুর ও জয়তুন গাছগুলো কেটে ফেলি, তাহলে আমাদের প্রতি তাদের কোনো আগ্রহ থাকবে না।' কাহিনার আহ্বানে বুত্‌র জাতিগোষ্ঠীর উচ্ছৃঙ্খল গোত্রগুলো গাছপালা কেটে ফেলে বসতি বিরান করতে শুরু করে। এ সময় বারানিস জাতিগোষ্ঠী হাসসানের কাছে ছুটে আসে এবং এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে কাহিনার ওপর আক্রমণ চালাতে অনুরোধ করে। হাসসান এবার কাহিনাকে ধ্বংস করতে সক্ষম হন।

হাসসান বিন নোমান গাসসানি সমুদ্রপথে রোমানদের ওপর নজরদারি করতে কারতাজিনার নিকটে তিউনিসিয়া নৌবন্দর প্রতিষ্ঠা করেন। এ নৌবন্দরকে কেন্দ্র করেই পরবর্তীকালে তিউনিসিয়া গড়ে ওঠে। মাগরিব ত্যাগ করার পূর্বে হাসসান এ অঞ্চলকে একটি শান্ত ও শৃঙ্খলাপূর্ণ ইসলামি প্রদেশ হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হন। ৮৬ হিজরি সনে হাসসানকে বরখাস্ত করে মুসা বিন নুসায়রকে এ অঞ্চলের গভর্নর নিযুক্ত করা হয়।

হাসসান বিন নোমান গাসসানি প্রাচ্যে প্রত্যাবর্তনের পর পুনরায় বিভিন্ন বার্বার গোত্র চুক্তিভঙ্গ করে। মুসা বিন নুসায়র তাদেরকে পুনরায় বশীভূত করতে সক্ষম হন। ইতিপূর্বে যেসব বার্বার গোত্র মুসলমানদের কর্তৃত্ব স্বীকার করেনি, মুসা বিন নুসায়র তাদেরকেও বশীভূত করতে সক্ষম হন। মুসা বিন নুসায়র তার বাহিনীর বার্বারি সেনাপতি তারিক বিন যিয়াদকে সঙ্গে নিয়ে বার্বারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে একের পর এক বার্বার অধ্যুষিত

নগরী জয় করতে থাকেন এবং তাঞ্জিয়ার (Tangier) পর্যন্ত পৌঁছে যান। ছোট শহর তাঞ্জিয়ার ছিল তৎকালীন বার্বার গোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চলের প্রধান নগরী। মুসা বিন নুসায়র তাঞ্জিয়ার জয় করে তারিক বিন যিয়াদকে সেখানকার প্রশাসক নিয়োগ করেন এবং পূর্ণ যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধপ্রস্তুতিসম্পন্ন উনিশ হাজার বার্বার যোদ্ধাকে তার সঙ্গে রেখে যান। তারিক বিন যিয়াদের এসব সঙ্গী ছিল নিষ্ঠাবান নওমুসলিম। বার্বারদের কুরআন ও ইসলামের ফরজ বিধিবিধান শিক্ষা দেওয়ার জন্য মুসা তাদের কাছে কিছু আরবকেও রেখে যান।

স্থল অভিযানের পাশাপাশি মুসা বিন নুসায়র এ অঞ্চলে নৌ অভিযানও শুরু করেন। তিনি তার পুত্র আবদুল আজিজের নেতৃত্বে সিসিলি অভিমুখে একটি নৌবাহিনী প্রেরণ করেন। মুসলিম নৌবহর সিসিলি দ্বীপের বিভিন্ন এলাকাসহ আশেপাশের বিভিন্ন দ্বীপ জয় করতে সক্ষম হয়। সমুদ্রপথে মুসলমানদের এই পদচারণার কারণে এ অঞ্চলে নৌপথে রোমান নৌবহরের আনাগোনা কমে যায়, যা পরে আন্দালুস অভিযানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়ক বিবেচিত হয়।

তাঞ্জিয়ার বিজয়ের পর ইফ্রিকিয়া অঞ্চলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার মতো বাকি থাকে কেবল সুরক্ষিত অঞ্চল সিউটা।[৫২] জুলিয়ান নামক জনৈক প্রশাসক তখন সিউটা শাসন করতেন। আরবরা জুলিয়ানকে ডাকত 'ইউলিয়ান'। সিউটা ছিল সাগরের ওপারের আন্দালুস রাষ্ট্রের অধীনস্থ একটি করদরাজ্য।

গ. আন্দালুসে বিজয়াভিযান ও তৎকালীন আন্দালুসের পরিস্থিতি

দীর্ঘদিন যাবৎ পশ্চিমা গোথ (Visigoths) জাতি আন্দালুস[৫৩] শাসন করছিল। মুসলমানদের আন্দালুস অভিযানের অব্যবহিত পূর্বে আন্দালুসের

---

৫২. **সিউটা** : জিব্রালটার প্রণালির তীরে অবস্থিত মরক্কোর একটি নগরী, যা বর্তমানে স্পেন জবরদখল করে রেখেছে। মরক্কোর আরও একটি বন্দর-নগরী ম্যালিলাও স্পেনের দখলে রয়েছে। আরবিতে 'সিউটা' নগরীকে 'সাব্‌তাহ' (سبتة) এবং তাঞ্জিয়ারকে 'তানজাহ' (طنجة) বলা হয়।

৫৩. **আন্দালুস** : স্ক্যান্ডিনেভিয়ান উপদ্বীপ (The Scandinavian Peninsula)-এর পর ইউরোপের দ্বিতীয় বৃহত্তম উপদ্বীপ হলো আইবেরিয়ান উপদ্বীপ (Iberian Peninsula)। ইউরোপের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত ত্রিভুজ-সদৃশ আইবেরিয়ান উপদ্বীপের আয়তন প্রায় ছয় লক্ষ বর্গকিলোমিটার (৫,৮৩,২৫৪ বর্গ কি. মি. বা ২,২৫,১৯৬ বর্গমাইল)।

শাসক ছিলেন গোথ-শাসক গিত্‌শা (Wittiza)। সিউটা-প্রশাসক জুলিয়ান ছিলেন তার মিত্র। গিত্‌শার জনৈক অনুচর রডারিক-এর সমর্থকদের পরিচালিত এক বিদ্রোহ প্রচেষ্টায় গিত্‌শা সিংহাসনচ্যুত ও নিহত হন। এর ফলে গিত্‌শার সন্তান ও সমর্থকরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং তারা জবরদখলকারী রডারিকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হয় আন্দোলন। মুসলমানরা আন্দালুসে প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত পরিস্থিতি এমনই ছিল।

গিত্‌শার মৃত্যুর পর ক্ষমতার দাবিদার তার পুত্র ওয়াক্‌লা পালিয়ে আফ্রিকায় চলে আসে এবং সিউটার প্রশাসক জুলিয়ানের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে। জুলিয়ান তখনও গিত্‌শাপরিবারের আনুগত্যে অবিচল ছিলেন।

রডারিকের দুঃশাসনে আন্দালুসভূমির পরিস্থিতি শোচনীয় হয়ে পড়ে। রডারিক বিশাল করের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে জনগণকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলে।

সিউটা-প্রশাসক জুলিয়ান এ সময় তাঞ্জিয়ার-প্রশাসক তারিক বিন যিয়াদের কাছে একটি বার্তা প্রেরণ করে সিউটার নিয়ন্ত্রণ মুসলমানদের হাতে তুলে দেওয়ার প্রস্তাব দেন এবং মুসলমানদেরকে আন্দালুসে বিজয়াভিযান পরিচালনা করতে উদ্বুদ্ধ করেন। এ বিষয়ে উভয় প্রশাসকের মধ্যে বেশ কয়েকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে খলিফার অনুমতিপ্রার্থনা

অবশেষে জুলিয়ানের প্রস্তাবে তারিক বিন যিয়াদ সম্মতি জানান। আফ্রিকা-প্রশাসক মুসা বিন নুসায়র খলিফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিকের কাছে বার্তা পাঠিয়ে বিস্তারিত পরিকল্পনা অবহিত করেন। ফিরতি বার্তায় খলিফা প্রথমেই মূল মুসলিম বাহিনীকে আন্দালুস-অভিযানে প্রেরণ না করে ক্ষুদ্র একটি বাহিনী প্রেরণ করে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের নির্দেশ দেন।

আধুনিক রাষ্ট্রসীমার স্পেন, পর্তুগাল ও অ্যান্ডোরা এই তিনটি দেশের পাশাপাশি ফ্রান্সের কিছু অংশ আইবেরিয়ান উপদ্বীপের অন্তর্ভুক্ত। আইবেরিয়ান উপদ্বীপকেই অতীতে আন্দালুস বলা হতো।

অনুসন্ধানী অভিযান

৯১ হিজরি সনের রমজান মাসে (৭১০ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে) মুসা বিন নুসায়র রহ. তারিফ বিন মালিক মাআফিরি (আবু যুরআ) নামক জনৈক আমাজিঘ সেনাপতির নেতৃত্বে চারশ পদাতিক ও একশ অশ্বারোহী সৈন্যের একটি ক্ষুদ্র বাহিনী আন্দালুসে প্রেরণ করেন। চারটি নৌযানে সাগর পাড়ি দিয়ে তারা আন্দালুসের উপকূলে অবতরণ করে। তাঞ্জিয়ারের অপর পাড়ে অবস্থিত যে স্থানটিতে তারিফের বাহিনী অবতরণ করেছিল, বর্তমানে তা সেনাপতি তারিফের নামে জাযিরাতু তারিফ বা তারিফের দ্বীপ নামে খ্যাত। তারিফের বাহিনী সেখান থেকে জাযিরাতুল খাযরা বা আলজেসিরাস (Algeciras)-এর দিকে অগ্রসর হয়ে নিকটবর্তী এলাকাগুলোতে অভিযান চালিয়ে প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ করে এবং নিরাপদে তাঞ্জিয়ারে প্রত্যাবর্তন করে।

৯২ হিজরি সনের রজব মাসে (৭১১ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে) মুসা বিন নুসায়র তারিক বিন যিয়াদের নেতৃত্বে আরব ও বার্বার সৈন্যদের সমন্বয়ে আন্দালুস অভিযানের বাহিনী প্রস্তুত করেন। বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল সাত হাজার। মুসলিম বাহিনী সিউটার উপকূলীয় এলাকা থেকে রওনা হয়। সিউটার প্রশাসক জুলিয়ান নৌযান প্রদান করে মুসলিম বাহিনীকে সহায়তা করেছিলেন।[৫৪] মুসলিম বাহিনী সাগর পাড়ি দিয়ে সাগরের সরাসরি অপর প্রান্তে আন্দালুস ভূমিতে অবতরণ করে। সেদিন থেকে আজও সেই পাথুরে ভূমিটি জাবালে তারিক (Gibraltar) নামে প্রসিদ্ধ।

তারিক বিন যিয়াদের নেতৃত্বে শুরু হয় আন্দালুস বিজয়াভিযান। প্রথমে তিনি আন্দালুসের কারতাজিনা নগরী জয় করেন। এরপর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে কারতাজিনার চারপাশের বিভিন্ন নগরীর উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর তিনি জাযিরাতুল খাযরার সম্মুখবর্তী এক স্থানে অস্থায়ী সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেন।

---

৫৪. অবশ্য ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতবিরোধ আছে যে, মুসলিম অভিযাত্রীগণ জুলিয়ানের প্রদত্ত নৌযানে করে সাগর পাড়ি দিয়েছিলেন, নাকি নিজেদের নৌযানে চড়ে। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য : মাকতাবাতুল হাসান থেকে প্রকাশিত ড. রাগিব সারজানির *আন্দালুসের ইতিহাস*, ১/৭৯-৮২।

মুসলিম অভিযাত্রীদের আগমনের সংবাদ পেয়ে রডারিক মুসলিম বাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে রাজধানী থেকে রওনা হয়। তারিক মুসা বিন নুসায়রের কাছে বার্তা পাঠিয়ে রডারিক-বাহিনীর বিশালতা সম্পর্কে অবহিত করেন। তখন মুসা বিন নুসায়র তারিফ বিন মালিকের নেতৃত্বে পাঁচ হাজার সৈন্যের অতিরিক্ত আরেকটি বাহিনী প্রেরণ করেন। এ বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্যই ছিল অশ্বারোহী। অতিরিক্ত সৈন্য যোগ দেওয়ার তারিকবাহিনীর মোট সৈন্যসংখ্যা দাঁড়ায় বারো হাজার।

লুক্কা উপত্যকার যুদ্ধ

৯২ হিজরি সনের ২৮ রমজান (৭১১ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ জুলাই) রবিবার উভয় বাহিনী সাজুনা নগরীর নিকটবর্তী বারবাত বা লুক্কা উপত্যকায় মুখোমুখি হয়। একটানা আট দিন যুদ্ধ চলার পর গোথ বাহিনীর চূড়ান্ত পরাজয়ের মাধ্যমে যুদ্ধ শেষ হয়। ইতিহাসের এই গতিনির্ধারক যুদ্ধই মুসলমানদের সামনে আন্দালুসের দ্বার উন্মোচিত করে দেয়।

লুক্কা প্রান্তরে জয়লাভ করার পর তারিক তার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখেন এবং একের পর এক নগরী জয় করতে থাকেন। অভিযান অব্যাহত রেখে মুসলিম বাহিনী টলেডোয়[৫৫] পৌঁছে যায়। ৯৩ হিজরি সনে (৭১২ খ্রিষ্টাব্দে) তারিক উল্লেখযোগ্য কোনো প্রতিরোধের সম্মুখীন হওয়া ব্যতিরেকেই ওয়াদিল কাবির (The Guadalquivir) নদী পাড়ি দিয়ে টলেডো নগরীতে প্রবেশ করেন। টলেডোয় পৌছার পর তারিক গিত্শার সন্তানদেরকে মুসা বিন নুসায়রের কাছে প্রেরণ করেন। তারা তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'আপনি নিজেই আমীর, নাকি অন্য কোনো আমীরের অধীনস্থ?'

উত্তরে তারিক বিন যিয়াদ বলেন, 'আমি একজন আমিরের অধীনস্থ; আর সেই আমিরের ওপর আছেন এক মহান আমির।'

সেনাপতি তারিকের প্রতি মুসা বিন নুসায়রের নির্দেশ ছিল, তিনি যেন আন্দালুসের বেশি গভীরে প্রবেশ না করেন। কারণ, তাতে তার সৈন্যরা

---

৫৫. **টলেডো :** স্পেনের অন্যতম প্রাচীন নগরী। টলেডো আইবেরিয়ান উপদ্বীপের মধ্যভাগে বর্তমান স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ থেকে ৯১ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। সুগভীর উপত্যকা-বেষ্টিত ও উচ্চভূমিতে অবস্থিত টলেডো নগরীর তিনদিকেই আছে ট্যাজু নদী (Tagus River)। টলেডো ছিল তৎকালীন আন্দালুস রাষ্ট্রের রাজধানী।

নিরাপত্তা-ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে। কিন্তু সম্ভবত একের পর এক সহজ বিজয় তারিককে অভিযান অব্যাহত রেখে আরও সামনে অগ্রসর হতে উদ্দীপ্ত করে। কিন্তু একপর্যায়ে তিনি নিজেকে অবরুদ্ধ আবিষ্কার করেন। এদিকে বিজিত নগরীগুলোর প্রতিটির নিরাপত্তার জন্য কিছু সৈন্য রেখে আসায় তার সঙ্গে থাকা সৈন্যের সংখ্যাও তখন অনেক কম। বাধ্য হয়ে তিনি মুসার কাছে বার্তা প্রেরণ করে জানান যে, আশেপাশের বিভিন্ন গোত্র প্রতিটি দিক থেকে আমাদের ওপর হামলা করার জন্য পরস্পরকে আহ্বান করছে। সুতরাং দ্রুত সাহায্য প্রেরণ করুন। তখন মুসা বিন নুসায়র তারিক বিন যিয়াদকে সহায়তা করার জন্য নিজেই সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আন্দালুসে অবতরণের সিদ্ধান্ত নেন। ৯৩ হিজরি সনের রমজান মাসে আঠারো হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে মুসা আন্দালুসে পা রাখেন। প্রথমে তিনি দক্ষিণ ও পশ্চিমের সেসব নগরী জয় করার মনস্থ করেন, যেগুলো তারিক জয় না করে ছেড়ে গিয়েছিলেন। মুসা বিন নুসায়র এর মাধ্যমে বাম দিক থেকে তারিকের বাহিনীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং শত্রু-শক্তিকে ব্যতিব্যস্ত রাখতে চেয়েছিলেন। এসব বিজয় সমাপ্ত হওয়ার পর মুসা তারিকের বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হন এবং উভয়ে মিলে আন্দালুসের অন্যান্য নগরী জয় করতে থাকেন। মুসা বিন নুসায়র বিজয়ের সংবাদ জানিয়ে খলিফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিকের কাছে বার্তা প্রেরণ করেন। বার্তা পাঠ করে খলিফা কৃতজ্ঞতায় সিজদাবনত হয়ে পড়েন।

এরপর মুসা তারিককে সঙ্গে নিয়ে আন্দালুসের উত্তরে আরও গভীরে প্রবেশ করেন। মুসলিম বাহিনী যে নগরীই অতিক্রম করছিল, আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে তা-ই জয় করছিল। প্রতিটি জনপদের অধিবাসীগণ মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি করছিল। এভাবে মুসলিম বাহিনী পৌঁছে যায় জারাগোজা নগরীতে। মুসলিম বাহিনীর আগমন-সংবাদ পেয়ে জারাগোজার খ্রিষ্টান যাজক বেনসিয়ো ও তার সঙ্গী সন্ন্যাসীগণ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তারা তাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থসমূহ ও অন্যান্য ঐতিহ্যগত সম্পদ একত্র করে তা নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু মুসা বিন নুসায়র তাদের কাছে দূত পাঠিয়ে তাদের নিরাপত্তা-অঙ্গীকার প্রদান করেন। ফলে তারা শহরত্যাগের সিদ্ধান্ত পরিহার করে।

মুসা বিন নুসায়র এরপর তার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখে এমন এমন অঞ্চলে পৌঁছান, যেখানকার অধিবাসীরা পশুর ন্যায় জীবনযাপন করত। তারা

কথা বলত বাস্‌ক ভাষায়[৫৬]; মুসার সঙ্গে থাকা আন্দালুসের স্থানীয় অধিবাসীরা যা মোটেও বুঝত না। অবস্থাদৃষ্টে মুসলিম সৈন্যরা মুসা বিন নুসায়রকে বলে, 'আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? আমরা ইতিমধ্যে যেসব অঞ্চল জয় করেছি, তাই তো যথেষ্ট!'

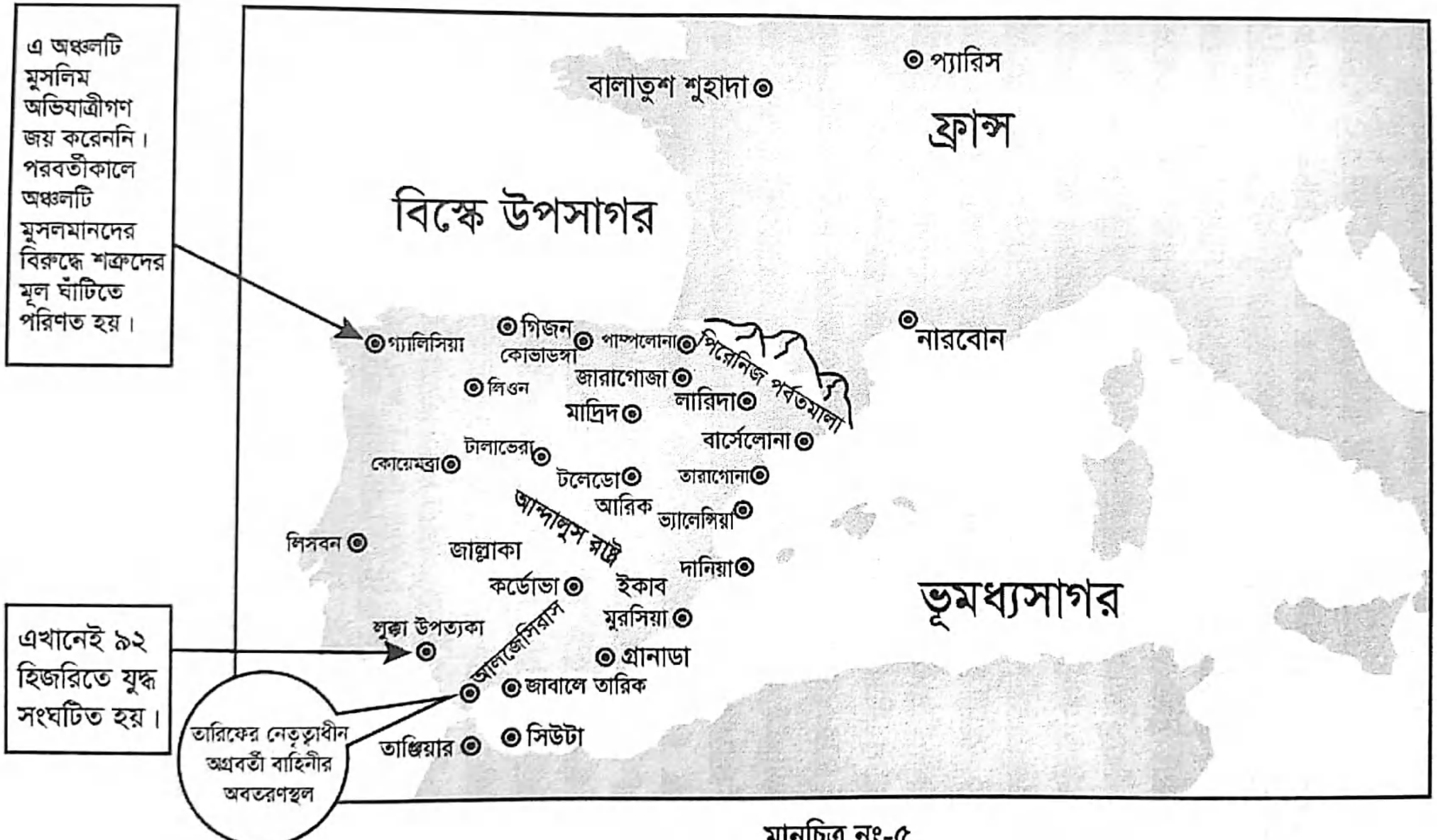
বিশিষ্ট তাবেয়ি হানাশ বিন আবদুল্লাহ সানআনিও মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে ছিলেন। তিনি সেনাপতি মুসা বিন নুসায়রকে বলেন, 'বাহিনীর সদস্যরা নিজেদের মধ্যে যেসব কথাবার্তা বলছে, আমি তা শুনেছি। আপনি তাদের মনোভাব সম্বন্ধে জানেন না। যুদ্ধলব্ধ সম্পদের প্রাচুর্যে তারা সমৃদ্ধ হয়ে গেছে। তাই তারা এখন যুদ্ধমুক্ত পরিবেশে ফিরতে চাইছে।'

হানাশ বিন আবদুল্লাহর সদুপদেশ শুনে সেনাপতি মুসা বিন নুসায়র মুচকি হেসে বলেন, 'আল্লাহ আপনাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন এবং মুসলমানদের মাঝে আপনার মতো কল্যাণকামী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি করুন।' এরপর তিনি আন্দালুসের মূল ভূখণ্ডে প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে রওনা করেন। এ সময় তিনি বলছিলেন, 'আল্লাহর শপথ! তারা যদি আমার নিঃশর্ত আনুগত্য করত, তাহলে তাদেরকে নিয়ে আমি রোম (কনস্টান্টিনোপল) পর্যন্ত পৌঁছতাম। তারপর ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ আমাদের হাতে রোমের বিজয় দান করতেন।'

অবশ্য এরপর মুসা পুনরায় তার সৈন্যদেরকে অনুপ্রাণিত করতে সক্ষম হন এবং তাদেরকে নিয়ে আবারও বিজয়াভিযান শুরু করেন। তিনি যখন গ্যালিসিয়া (Galicia) অঞ্চল বিজয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন খলিফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিকের পক্ষ থেকে প্রেরিত দূত তার কাছে উপস্থিত হয়ে জানায় যে, খলিফা তাকে আন্দালুসের বিজয়াভিযান স্থগিত রেখে দামেশকে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দিয়েছেন। খলিফার নির্দেশ মনঃপূত না হলেও মুসা বিন নুসায়র তা মেনে নেন এবং আপন ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন। তখন পুরো আন্দালুসে কেবল গ্যালিসিয়া অঞ্চলই মুসলমানদের জয় করা বাকি ছিল। বিভিন্ন যুদ্ধের পরও বেঁচে থাকা অবশিষ্ট গোথ সৈন্যরা সেখানেই আশ্রয় নিয়েছিল। আন্দালুসের উত্তর-পশ্চিম অংশের এই অঞ্চলটিই পরবর্তীকালে কয়েক শতাব্দী পর আন্দালুসের মুসলমানদের বিরুদ্ধে খ্রিষ্টানদের পুনরুদ্ধার যুদ্ধে মূলকেন্দ্রের ভূমিকা পালন করে।

---

৫৬. পিরেনিজ পর্বতাঞ্চলের অধিবাসীদের বাস্‌ক (Basque) বলা হতো।



মানচিত্র নং-৫

আন্দালুস বিজয়ের ইতিহাস অনুধাবনে সহায়ক মানচিত্র

বিজিত জাতির প্রতি বিজেতা মুসলমানদের উদারতা

আন্দালুস বিজয়ের সময় মুসলিম বিজেতাগণ আন্দালুসের বিভিন্ন নগরীর প্রশাসক ও রাজন্যবর্গের সঙ্গে যেসব চুক্তি করেছিলেন, তার ধারাগুলো অভিযাত্রী মুসলমানদের দয়া ও উদারতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দলিল। ঐতিহাসিক নথিপত্রে মুসলিম সেনাপতি মুসা বিন নুসায়রের পুত্র আবদুল আজিজ ও গাবদুশ-পুত্র টুডমিরের মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি সন্ধিচুক্তির বিবরণ সংরক্ষিত আছে। নিম্নে তার চুম্বকাংশ উল্লেখ করা হলো। ৯৪ হিজরি সনের রজব মাসে (৭১৩ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে) চুক্তিপত্রটি লেখা হয়।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

এটি আবদুল আজিজের পক্ষ থেকে টুডমিরকে প্রদত্ত নিরাপত্তা-অঙ্গীকারনামা। আবদুল আজিজ তার সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করছে এবং মহান আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকারের ভিত্তিতে এ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে, যতদিন এ চুক্তি বহাল থাকবে, ততদিন তাকে তার ক্ষমতা হতে অপসারণ করা হবে না এবং তার শাসনভুক্ত অঞ্চলসমূহের কোনো খ্রিষ্টান প্রশাসককেও অপসারণ করা হবে না। এখানকার নাগরিকদের ও তাদের স্ত্রী-সন্তানদেরকে হত্যা বা বন্দি করা হবে না। তাদের ধর্মত্যাগে বাধ্য করা হবে না এবং তাদের গির্জা ও উপাসনালয়গুলোর ক্ষতি করা হবে না।

The Story of Civilization গ্রন্থের[৫৭] লেখক উইলিয়াম দুরান্ত (মৃত্যু : ১৯৮১ খ্রি.) লিখেছেন—

---

৫৭. বিখ্যাত আমেরিকান দার্শনিক উইলিয়াম দুরান্ত (William James Will Durant) ও তার স্ত্রী এরিয়েল দুরান্ত (Ariel Durant) এই সুবিশাল ইতিহাস বিশ্বকোষটি রচনা করেন। এগারো খণ্ডে সমাপ্ত গ্রন্থটিতে পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিগত কালের বিভিন্ন সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ চল্লিশ বছরের প্রচেষ্টায় মানে ও পরিমাণে সমৃদ্ধ এ বিশ্বকোষটি রচনা করা হয়। আরব রাষ্ট্রসমূহের জোট সংগঠন 'আরব লীগে'র শাখাসংগঠন 'অ্যালেসকো'=

> 'আন্দালুস আরব বিজেতাদের আমলে যেরূপ দৃঢ়তা ও প্রত্যয়, স্বাধীনতা ও ন্যায়পরায়ণতা প্রত্যক্ষ করেছে, তার সুদীর্ঘ ইতিহাসে কখনো তা প্রত্যক্ষ করেনি।'

স্যার থমাস আরনল্ড (মৃত্যু : ১৯৩০ খ্রি.) তার *The Preaching of Islam* গ্রন্থে[৫৮] লিখেছেন—

> 'প্রকৃতপক্ষে এসব বিজেতা খ্রিষ্টধর্মের প্রতি যে ধর্মীয় উদারনীতি প্রকাশ করেছেন, আন্দালুসে কর্তৃত্ব বিস্তার সহজ হওয়ার ক্ষেত্রে তার বড় ভূমিকা ছিল।'

ইসলামি বিজয়াভিযানের পূর্বে আন্দালুসের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি

আবহমানকাল হতেই আন্দালুসভূমি একের পর এক বিদ্রোহে আক্রান্ত ছিল। অবশেষে পশ্চিমা গোথ গোষ্ঠী এ অঞ্চলে স্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করতে সক্ষম হয়। গোথ গোষ্ঠী আন্দালুসে ইউরোপ-ইতিহাসে বিখ্যাত রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে। ৯১ হিজরিতে (৭১০ খ্রিষ্টাব্দে) মুসলমানদের হাতে গোথ সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। পতনপূর্ব সময়ে আন্দালুসে যে বিশৃঙ্খল ও দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি বিরাজ করছিল, তা যেন আসন্ন পতনের বার্তাই জানান দিচ্ছিল।

আন্দালুসের শাসক নির্বাচনের অধিকার একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির হাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। সেনাপতি ও গির্জার অধিপতিগণ শাসক নির্বাচন করতেন। আর এ ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থার অনিবার্য পরিণতি হলো একজন শাসকের মৃত্যু ও অপরজনের ক্ষমতাগ্রহণের সময় অরাজকতা, ফিতনা, অস্থিরতা ও শত্রুতা সৃষ্টি হওয়া।

=(The Arab League Educational, Cultural and Scientific Organization [ALECSO]) গ্রন্থটির আরবি সংস্করণ *'কিসসাতুল হাযারা'* (قصة الحضارة) নামে প্রকাশ করেছে।

৫৮. বিখ্যাত ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ স্যার থমাস আরনল্ড (Thomas Walker Arnold) রচিত এ গ্রন্থটির আরবি অনুবাদ ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে الدعوة إلى الإسلام (ইসলামের প্রতি আহ্বান) নামে প্রকাশিত হয়েছে।

আন্দালুসের সামাজিক পরিস্থিতিও ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল শ্রেণি-বিভেদব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে। আন্দালুস-সমাজ তখন কয়েকটি স্তরে বিভক্ত ছিল।

- বংশীয় অভিজাত শ্রেণি : তারা ছিল বিজেতা গোথ জাতির পরবর্তী প্রজন্ম। রাষ্ট্রের অধিকাংশ উর্বর কৃষিভূমি তাদের দখলে ছিল। তারা এসব ভূমি করমুক্ত ভোগ করত। রাষ্ট্রের সামরিক পদসমূহ এবং ধর্মীয় বিষয়াদির নেতৃত্বও তাদের হাতেই থাকত।
- ধর্মীয় অভিজাত শ্রেণি : নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের কারণে তারাও কৃষিভূমির একটি বড় অংশ কোনো প্রকার করপ্রদান ব্যতিরেকে ভোগ করত। রাষ্ট্রপরিচালনায় তারা প্রথম শ্রেণির সঙ্গে শরিক ছিল। প্রকৃত অর্থে তখন রাষ্ট্রপরিচালনার একমাত্র উদ্দেশ্য থাকত অর্থসম্পদে কর আরোপের বিভিন্ন পথ অনুসন্ধান করা এবং শাসকদের সম্পদ বৃদ্ধি করা। ঐতিহাসিকগণ মন্তব্য করেছেন, আন্দালুসের দুই-তৃতীয়াংশ কৃষিভূমি এই দুই শ্রেণির মালিকানাভুক্ত ছিল এবং তা ছিল সম্পূর্ণ খাজনামুক্ত।
- ব্যবসায়ী, কৃষিজীবী ও ক্ষুদ্র জমিদার শ্রেণি : ট্যাক্স-খাজনা প্রদান ও শাসকদের অর্থলিপ্সা পূরণ করার দায়িত্ব-বোঝা তাদের কাঁধেই অর্পিত থাকত।
- ভূমিদাস শ্রেণি : বড় জমিদারদের স্বার্থরক্ষায় তারা কৃষিকাজ করত। দুর্ভাগা এই শ্রেণির লোকেরা নিজেদের পরিবার-পরিজনসহ মালিকের সম্পদের অন্তর্ভুক্ত বিবেচিত হতো। তাদের নিজস্ব কোনো অধিকার ছিল না। ভূমির মালিকানার সঙ্গে তারাও এক মালিক হতে অন্য মালিকের কাছে স্থানান্তরিত হতো।
- যুদ্ধবন্দি দাস শ্রেণি : তাদেরকে ক্রয়-বিক্রয় করা হতো। ন্যূনতম কোনো অধিকারই তাদের ছিল না।

আন্দালুসে আরেকটি শ্রেণির বসবাস ছিল, নাগরিক জীবনে যাদের বেশ বড় ভূমিকা ছিল। তারা হলো ইহুদি সম্প্রদায়। স্বভাবরীতি অনুযায়ী তারা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল। শাসক শ্রেণি তাদের প্রভাব-

প্রতিপত্তির কারণে চাপ অনুভব করত এবং তাদেরকে ইহুদি ধর্ম ছেড়ে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করার জন্য চাপপ্রয়োগ করত।

অর্থাৎ সমাজের কর্মী শ্রেণিগুলো সাধারণ নাগরিক অধিকার হতেও বঞ্চিত ছিল। নিঃসন্দেহে এটি ছিল চরম অব্যবস্থাপনার একটি চিত্র-মাত্র। শোষিত ও বঞ্চিত এসব মানুষের না ছিল কোনো ধরনের জাতীয় অধিকার, না ছিল উন্নতি-অগ্রগতির ন্যূনতম চেতনা।

বালাতুশ শুহাদার যুদ্ধ

মুসা বিন নুসায়রের পরিকল্পনা ছিল পিরেনিজ পর্বতমালা (Pyrenees Mountains) পাড়ি দিয়ে ফ্রান্স (তৎকালীন গাল রাষ্ট্র) ভূমিতেও ইসলামের সুমহান দাওয়াত পৌঁছিয়ে দেওয়া; এরপর রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল জয়ের উদ্দেশ্যে আরও পূর্ব দিকে অগ্রসর হওয়া। কিন্তু খলিফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক এই দুঃসাহস পছন্দ করেননি। মুসা বিন নুসায়র ও তারিক বিন যিয়াদের প্রতি অপ্রসন্ন ও শত্রুভাবাপন্ন দরবারের কিছু লোকের চক্রান্ত ও কুৎসা রটনায় প্রভাবিত হয়ে খলিফা তাদের উভয়কে দামেশকে তলব করেন। ফলে দীর্ঘদিনের জন্য সমকালীন ইসলামি বিশ্বের এই পশ্চিম অংশে বা ইসলামি প্রতীচ্যে বিজয়াভিযানের ধারা বন্ধ হয়। ১০০ হিজরি সনে (৭১৯ খ্রিষ্টাব্দে) খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. সামাহ বিন মালিক খাওলানির তাকওয়া ও চরিত্রগুণের কারণে তাকে আন্দালুসের প্রশাসক নিযুক্ত করেন। সামাহ বিন মালিক ফ্রান্সে বিজয়াভিযান শুরু করার জন্য আপন সৈন্যদের উদ্বুদ্ধ করেন। তিনিই আন্দালুসের রাজধানী সেভিল থেকে কর্ডোভায় স্থানান্তর করেন। (আন্দালুসে উমাইয়া শাসনের শেষ সময় পর্যন্ত কর্ডোভাই ছিল আন্দালুসের রাজধানী)।

সামাহ ফ্রান্সভূমিতে অগ্রসর হয়ে প্রথমে দক্ষিণ ফ্রান্সের সিবতমানিয়া অঞ্চল জয় করেন এবং নারবোন (Narbonne)-কে ফ্রান্সে তার সামরিক অভিযানের ঘাঁটি নির্ধারণ করেন। এখনো নারবোনে সামাহ বিন মালিকের নামে একটি সড়ক আছে। এরপর তিনি পশ্চিমে অগ্রসর হয়ে আকুইতেইন (Aquitaine) অঞ্চলের প্রধান নগরী তুলুশায় পৌঁছান। সেখানে তিনি প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হন। একপর্যায়ে তার কাছে সহায়ক বাহিনী এসে পৌঁছায়; কিন্তু এ যুদ্ধে তিনি শহিদ হন। এটি ১০২ হিজরি সনের

(৭২১ খ্রিষ্টাব্দের) ঘটনা। তখন মুসলিম বাহিনী তুলুশা থেকে দক্ষিণে সরে আসে।

এরপর আন্দালুসের প্রশাসক নিযুক্ত হন উক্ত যুদ্ধে সামাহর অধীনেই যুদ্ধরত আবদুর রহমান আল-গাফিকি। এটি ছিল আবদুর রহমানের প্রথম শাসনামল, যা অল্প কয়েক মাস ব্যাপ্ত ছিল। ১০৩ হিজরিতে আফ্রিকার তৎকালীন গভর্নর ইয়াযিদ বিন আবু মুসলিম আন্দালুসের প্রশাসক হিসেবে আমবাসা বিন সুহাইম কালবিকে নিয়োগ দেন। আমবাসার শাসনামলের প্রথম চার বছর কেটে যায় আন্দালুসের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলাবিধানে এবং আরব-বার্বার সাম্প্রদায়িক বিরোধ নিরসনে। এরপর তিনি ফ্রান্সে বিজয়াভিযান শুরু করেন এবং উপকূলীয় পথ ধরে অগ্রসর হয়ে রোন (Rhone) নদী পর্যন্ত পৌঁছে যান। এ সময় তিনি ভ্যালেন্স (Valence), ফীনি, লিওঁ (Lyon), শ্যালন (Chalons-en-Champagne) প্রভৃতি নগরী জয় করেন। এরপর তার বাহিনীর একটি অংশ উত্তরে ডিজন (Dijon) ও ল্যাঙ্গ্রেজ (Langres)-এর দিকে অগ্রসর হয়, অপর একটি অংশ উতুন (Autun)-এর দিকে অগ্রসর হয়ে সেন্‌স (Sens) নগরী পর্যন্ত পৌঁছে যায়। মুসলিম বাহিনী কোনো নগরীতেই প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়নি; বরং প্রতিটি নগরীর নাগরিকেরা নিরাপত্তা প্রার্থনা করে সন্ধিচুক্তি করে। তবে সেন্‌স নগরীর যোদ্ধাগণ প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলে ইসলামি অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করতে সক্ষম হয়।

এ সময় আমবাসা উপলব্ধি করেন যে, তিনি ফ্রান্সের অভ্যন্তরে উপযুক্ত পরিমাণের চেয়ে বেশি ভেতরে চলে এসেছেন। এর ফলে আন্দালুস থেকে রসদ সরবরাহ-ব্যবস্থা (Line of supply) বিচ্ছিন্ন হয়ে মুসলিম বাহিনীর সমূহ ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। তাই তিনি এবার প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু ফ্রাঙ্কদের একটি বিরাট সৈন্যদল মুসলিম বাহিনীর ওপর অতর্কিতে হামলা চালায়। এ হামলায় তিনি শহিদ হন। অবশিষ্ট সৈন্যদল নারবোনে ফিরে আসে। এটি ১০৭ হিজরি সনের (৭২৫ খ্রিষ্টাব্দের) ঘটনা।

আমবাসার পর আন্দালুসের প্রশাসক নিযুক্ত হন আযরা আল-ফিহরি। তিনিও ১১০ হিজরি পর্যন্ত ব্যাপ্ত তার শাসনামলে একাধিকবার ফ্রান্সে বিজয়াভিযান পরিচালনা করেন এবং রোন নদীর অববাহিকা পর্যন্ত পৌঁছে যান।

এরপর আবদুর রহমান আল-গাফিকি দ্বিতীয়বারের মতো আন্দালুসের প্রশাসক নিযুক্ত হন। ফ্রান্সে অভিযান পরিচালনার জন্য তিনি বিরাট প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং আফ্রিকা ও আন্দালুসের স্বেচ্ছাসেবী যোদ্ধাদের জন্য এ অভিযানে অংশগ্রহণের সুযোগ উন্মুক্ত করে দেন। ফলে ফ্রান্স অভিযানের জন্য বিরাট এক বাহিনী প্রস্তুত হয়ে যায়। বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল সত্তর হাজার, মতান্তরে এক লক্ষ। ১১৩ হিজরি সনে রোনসেসভেল্স গিরিপথ (Roncesvalles Pass) ধরে মুসলিম বাহিনী পিরেনিজ পর্বতমালা পাড়ি দেয়। এরপর আবদুর রহমান ফ্রাঙ্কদের বিভ্রান্ত করার জন্য পূর্ব দিকের পথ ধরেন এবং দক্ষিণ ফ্রান্সের দিকে রওনা হন। প্রথমে তিনি আর্লস (Arles) নগরী পুনঃবিজয় করেন। ইতিপূর্বে বিজিত এ নগরীটির নাগরিকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। এরপর তিনি আকুইতেইন গমন করে নগরীটি জয় করে নেন। তারপর মুসলিম বাহিনী অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখে পয়টিয়ার্স (Poitiers) নগরীতে পৌঁছে যায়।

মুসলিম বাহিনীর অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ফ্রাঙ্ক সেনাপতি (আকুইতেইন-নৃপতি) ডিউক ওডো (Odo the Great) ফ্রাঙ্ক সাম্রাজ্যের আদেশ-নিষেধের অধিকর্তা চার্লস মার্টিল (Charles Martel)-এর কাছে সাহায্যের ফরিয়াদ জানান। চার্লস ওডোর আবেদনে সাড়া দেন। ইতিপূর্বে ডিউকের পদের প্রতি চার্লসের আগ্রহ থাকায় তার ও ওডোর মাঝে চরম দ্বন্দ্ব বিরাজ করছিল এবং এ কারণে মুসলিম বাহিনী দক্ষিণ ফ্রান্সে অভিযান পরিচালনা করলেও চার্লস তাতে গুরুত্ব দেননি। এবার তিনি ওডোর ডাকে সাড়া দেওয়ায় ফ্রান্সে খ্রিষ্টান শক্তি মুসলিম বাহিনীর মোকাবিলায় ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে পরিণত হয়।

ফ্রাঙ্করা চার্লস মার্টিলের কাছে সমবেত হয়ে বলে, শেষে আমাদের এ কী লাঞ্ছনা?! আমরা আরব জাতির কথা শুনতাম এবং আশঙ্কা করতাম যে, তারা পূর্ব দিক থেকে আসবে। এখন দেখি তারা পশ্চিম দিক থেকে এসে আন্দালুস দখল করে নিয়েছে। আরও ভয়াবহ বিষয় হলো, তারা সংখ্যায় ও শক্তিতে অতি অল্প হওয়া সত্ত্বেও আত্মরক্ষার জন্য ঢাল ব্যবহার না করেই এসব বিজয় অর্জন করছে।

উত্তরে চার্লস মার্টিল বলেন, 'আমার মতামত হলো তাদের এই অগ্রযাত্রায় তোমরা বাধা দেবে না। কারণ, তারা হলো প্রবহমান স্রোতের ন্যায়; সামনে যা পাবে, সব ভাসিয়ে নিয়ে অগ্রসর হবে। তাদের আছে এমন

অটল-অবিচল ইচ্ছাশক্তি, যার কারণে সংখ্যাধিক্যের কোনো প্রয়োজন নেই; আছে এমন ইস্পাত-কঠিন মনোবল হৃদয়, যার কারণে ঢালের আত্মরক্ষার প্রয়োজন নেই। তাদেরকে সুযোগ দাও; যখন তাদের হাত যুদ্ধলব্ধ সম্পদে পূর্ণ হয়ে যাবে, (এ দেশে) আবাসনের ব্যবস্থা হয়ে যাবে, তারা পরস্পর নেতৃত্ব নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জড়িয়ে পড়বে এবং একে অন্যের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করবে, তখন তোমরা অতি সহজেই তাদেরকে পরাভূত করতে পারবে।'

'*নাফহুত তিব*' গ্রন্থকার মাক্কারি রহ. বলেন—

> আল্লাহর শপথ! চার্লস মার্টিল যা বলেছিলেন, ঠিক তাই ঘটেছিল। শাম হতে আগত মুসলিম ও বালাদি মুসলিম,[৫৯] বার্বার ও আরব, মুযারি ও ইয়ামেনি ইত্যাদি জাতিগত সংঘাতের ফিতনা ছড়িয়ে পড়েছিল পুরো আন্দালুসজুড়ে। আপন মুসলিম ভাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করতে মুসলমানরা সাহায্য কামনা করছিল পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন শত্রুগোষ্ঠীর কাছে।

আবদুর রহমান আল-গাফিকির বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্য ছিল বার্বার জাতিগোষ্ঠীর। কারণ, আফ্রিকা ও আন্দালুসের অনেক আরব তখন পারস্পরিক জাতিগত সংঘাতে জড়িয়ে ছিল। অনেকে ব্যস্ত ছিল কৃষিজীবনে। আর তার বাহিনীতে সীমিত সংখ্যক যে আরব সৈন্য ছিল, তার অধিকাংশই ছিল ইয়ামেনি। কারণ, আবদুর রহমান নিজে ছিলেন ইয়ামেনি বংশোদ্ভূত।

যদি আমরা যুদ্ধের উভয় পক্ষের শক্তির দিকে তাকাই, তাহলে দেখতে পাব—বস্তুগত দিক থেকে ফ্রাঙ্কদের পাল্লা ভারী ছিল। একে তো তারা ছিল সংখ্যায় অধিক, অধিকন্তু ফ্রান্সের পথ-ঘাট ও স্থান সম্পর্কে তারা ছিল অধিক অবগত; আবার রসদ ও সামরিক সাহায্যপ্রাপ্তির উৎসও ছিল তাদের নিকটে। বিপরীতে মুসলিম বাহিনী উমাইয়া রাষ্ট্রের মূলকেন্দ্র থেকে অনেক দূরে চলে এসেছিল।

---

৫৯. যেসব আরব হিজায থেকে আগমন করে আন্দালুসের প্রথম বিজয়াভিযানে অংশগ্রহণ করেছিল এবং দক্ষিণ আন্দালুসে আবাস স্থাপন করেছিল, পরবর্তীকালে আন্দালুসে হিজরতকারী অন্যান্য আরবদের থেকে পার্থক্যকরণের জন্য তাদেরকে বালাদি বলা হতো।

১১৪ হিজরি সনের শাবান মাসের শেষদিকে (৭৩২ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে) ফ্রান্সের তুর্স (Tours) নগরীর কাছে উভয় বাহিনী মুখোমুখি হয়।

প্রথম আট দিন উভয় পক্ষ যুদ্ধে না জড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। এরপর শুরু হয় যুদ্ধ। উভয় পক্ষ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এবং অটল-অবিচল থেকে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। দ্বিতীয় দিনও পরিস্থিতি একইরকম ছিল। তবে ধীরে ধীরে যুদ্ধের পাল্লা মুসলিম বাহিনীর দিকে হেলে পড়ছিল। এ সময় ফ্রাঙ্করা একটি কৌশলের আশ্রয় নেয়। ফ্রাঙ্ক বাহিনীর একটি অংশ মুসলিম বাহিনীর সারি ভেদ করে সামনে অগ্রসর হয় এবং মুসলিম বাহিনীর অবস্থানস্থলের পেছনে যেখানে মুসলমানরা পূর্বে অর্জিত যুদ্ধলব্ধ সম্পদ গচ্ছিত রেখেছিল, সেখানে পৌঁছে যেতে সক্ষম হয়। এর ফলে মুসলিম বাহিনীর মাঝে অস্থিরতা সৃষ্টি হয় এবং মুসলিম সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। সেনাপতি আবদুর রহমান তার সৈন্যদের যুদ্ধক্ষেত্রে অবিচল রাখার এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদের জন্য অস্থির না হতে দেওয়ার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করলেও তার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এরইমধ্যে প্রতিপক্ষের নিক্ষিপ্ত তিরের আঘাতে তিনি শহিদ হয়ে যান।

সেনাপতির ইন্তেকালের পরও মুসলিম বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে অটল-অবিচল থেকে সেদিনের যুদ্ধ শেষ করে। রাতের অন্ধকার ছেয়ে এলে যখন সেদিনের মতো যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যায়, তখন অন্ধকারের সুযোগ কাজে লাগিয়ে মুসলিম বাহিনী দ্রুত দক্ষিণে সরে পড়ে। এটি ১১৪ হিজরির রমজান মাসের শুরুর দিকের ঘটনা।

ভোরবেলা ফ্রাঙ্ক বাহিনী মুসলিম বাহিনীর কাউকে দেখতে না পেয়ে অতি সন্তর্পণে মুসলিম বাহিনীর ছাউনির দিকে অগ্রসর হয়। ছাউনির কাছে গিয়ে তারা অবাক বিস্ময়ে আবিষ্কার করে যে, পুরো ছাউনি সৈন্যশূন্য; আর মুসলিম বাহিনীর অর্জিত যুদ্ধলব্ধ সম্পদে ছাউনি টইটম্বুর! তারা একে মুসলিম বাহিনীর কোনো কৌশল মনে করে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং মুসলমানদের পশ্চাদ্ধাবনের পরিবর্তে ছাউনি ধ্বংসকরণ ও সম্পদ লুণ্ঠন করেই ক্ষান্ত থাকে। ফ্রাঙ্ক বাহিনীর কেউ ভাবতেও পারেনি যে, মুসলিম বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করতে পারে। তাদের আশঙ্কা ছিল—প্রত্যাবর্তনের পথে মুসলিম বাহিনী তাদের জন্য কোনো ফাঁদ পেতে রেখেছে।

মুসলিম বাহিনী দ্রুত দক্ষিণে প্রত্যাবর্তন করে তাদের সামরিক ঘাঁটি নারবোনে ফিরে আসে।

প্রখ্যাত বৃটিশ ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড গিবন (Edward Gibbon) বলেন,

> আরবরা যদি তুরসের যুদ্ধে জয়লাভ করত, তাহলে আজ অক্সফোর্ড ও ক্যামব্রিজে কুরআন তিলাওয়াত ও তাফসির চর্চা হতো।

আফ্রিকার তৎকালীন গভর্নর উবায়দা বিন আবদুর রহমান মুসলিম বাহিনীর দুর্যোগের সংবাদ পেয়ে দ্রুত আবদুল মালিক বিন কাতান ফিহরির নেতৃত্বে সাহায্যবাহিনী প্রেরণ করেন এবং আবদুল মালিককে আন্দালুসে আবদুর রহমান আল-গাফিকির স্থলাভিষিক্ত নির্ধারণ করেন। এরপর তিনি খলিফা হিশাম বিন আবদুল মালিকের কাছে দুর্যোগের সংবাদ প্রেরণ করেন। সংবাদ পেয়ে খলিফা তাকে ফ্রান্সে বিজয়াভিযান চালানোর এবং যুদ্ধের মাধ্যমে সবদিক থেকে ফ্রান্সে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেন।

আবদুল মালিক বিন কাতান ফিহরি প্রথমে উত্তর আন্দালুসে গমন করেন এবং মুসলমানদের দখলে থাকা দুর্গগুলোর নিরাপত্তা দৃঢ়করণে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ওদিকে ফ্রান্সে ডিউক ওডোর প্রতিপত্তি লোপ পাওয়ায় সিবতমানিয়ায় তখন বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়েছিল এবং জনগণ সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছিল। তখন মার্সেই (Marseille)-এর ডিউক মোরন-সহ ফ্রাঙ্কদের অনেকে চার্লস মার্টিলের বিরুদ্ধে নারবোনের মুসলিম প্রশাসক ইউসুফ বিন আবদুর রহমান ফিহরির সঙ্গে মিত্রতা করে। উভয়ে মিলে রোন নদী অতিক্রম করে আর্লস নগরীতে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর তারা সামনে অগ্রসর হয়ে প্রভিন্স (Provence) নগরীও জয় করে নেন। মুসলমানরা এরপর চার বছর সেখানে শাসন করে। এ সময় কেউ তাদের বিরুদ্ধাচরণ করেনি।

১১৬ হিজরি সনে (৭৩৪ খ্রিষ্টাব্দে) খলিফা হিশাম বিন আবদুল মালিক আন্দালুসের প্রশাসক আবদুল মালিক বিন কাতান ফিহরিকে বরখাস্ত করেন এবং তার স্থানে উকবা ইবনুল হাজ্জাজ সালুলিকে নিযুক্ত করেন। উকবা ছিলেন একজন সুদক্ষ বীর সেনানী।

উকবার একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল—অমুসলিম কোনো ব্যক্তি বন্দি হলে তিনি তাকে হত্যা করতেন না; বরং তার সামনে ইসলামের পরিচয় ও

মাহাত্ম্য তুলে ধরে তাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিতেন। তার হাতে এক হাজার মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে।[৬০]

তিনি সৈন্যপরিচালনায় তার পূর্ববর্তী (অপসারিত) প্রশাসক আবদুল মালিক বিন কাতান ফিহরির সহায়তাও গ্রহণ করেন। উকবা সালুলি ফ্রান্সের পূর্বাঞ্চলেও একাধিক অভিযান পরিচালনা করেন। এসব অভিযানের কিছু সফল হয়, কিছু বাধাগ্রস্ত হয়। অবশেষে ১২৩ হিজরি সনে (৭৪১ খ্রিষ্টাব্দে) তিনি শহিদ হন।

---

৬০. নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

«لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ»

আল্লাহ যদি তোমার মাধ্যমে একজন ব্যক্তিকেও হিদায়াত দান করেন, তবে তা তোমার জন্য লাল বর্ণের উটের চেয়েও উত্তম। [*সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৩৪৯৮]

তিন. উত্তর-পূর্ব দিকে পরিচালিত বিজয়াভিযান

পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, সমকালীন ইসলামি রাষ্ট্রের উত্তর-পূর্ব দিকে বিভিন্ন পৌত্তলিক সম্প্রদায় বসবাস করত। যেমন উত্তরে ককেশাস অঞ্চলের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, উত্তর-পূর্বে মাওয়ারাউন নাহার অঞ্চলে তুর্কি জাতি, পূর্বে তাখারিস্তান ও সিজিস্তানে বসবাসকারী বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং দক্ষিণ-পূর্বে সিন্ধু ও পাঞ্জাবে বসবাসকারী বিভিন্ন সম্প্রদায়। অঞ্চলগত ভিন্নতার কারণে এসব অঞ্চলে একাধিক ফ্রন্টে ইসলামি বিজয়াভিযান পরিচালিত হয়। তবে মুসলিম অভিযাত্রীগণ অভিযান শেষে নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করলেই এসব অঞ্চলের অধিবাসীরা চুক্তি ভঙ্গ করত। তাই ইতিহাসে এসব অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় একাধিকবার বিজয়াভিযান পরিচালনার বিবরণ পাওয়া যায়।

ক: তুর্কিস্তানে বিজয়াভিযান

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. ২২ হিজরি সনে আবদুর রহমান বিন রবিআ রাযি.-এর কাছে বার্তা পাঠিয়ে তাকে তুর্কিদের বিরুদ্ধে বিজয়াভিযান পরিচালনার নির্দেশ দেন। খলিফার নির্দেশনা মোতাবেক আবদুর রহমান বিন রাবিআ তুর্কিস্তান[৬১] অভিমুখে রওনা হয়ে প্রথমে আল-বাব (Al-Bab) নগরী অতিক্রম করেন। আল-বাবের শাসক শাহর্‌বারাজ (Shahrbaraz) মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ ছিলেন। তিনি আবদুর রহমানকে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি কোথায় যাওয়ার মনস্থ করছেন?' উত্তরে আবদুর রহমান বলেন, 'তুর্কিস্তানের বালানজার (Balanjar) নগরীর শাসকের উদ্দেশে রওনা হয়েছি।' তখন

---

৬১. **তুর্কিস্তান** : মধ্য এশিয়ার একটি ঐতিহাসিক অঞ্চল। অঞ্চলটির সীমানা উত্তরে উরাল পর্বতমালা ও সাইবেরিয়া অঞ্চল হতে দক্ষিণে তিব্বত, কাশ্মীর, আফগানিস্তান ও ইরানের সীমান্ত পর্যন্ত এবং পূর্বে গোবি মরুভূমি (The Gobi Desert) হতে পশ্চিমে কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। পরবর্তীকালে সুবিশাল ও সুবিস্তৃত এ অঞ্চলটি পূর্ব তুর্কিস্তান ও পশ্চিম তুর্কিস্তান নামে দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। পূর্ব তুর্কিস্তান বর্তমানে চীনের দখলে আছে এবং সেখানে উইঘুরসহ অন্যান্য মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর অমানবিক ও বর্ণনাতীত রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন চলছে। অপরদিকে পশ্চিম তুর্কিস্তান বর্তমানে পাঁচটি দেশে বিভক্ত—তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, কিরগিজস্তান, উজবেকিস্তান ও কাজাখস্তান। পশ্চিম তুর্কিস্তানের কিছু অংশ আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলেও আছে। উল্লেখ্য, ঐতিহাসিক মাওয়ারাউন নাহার অঞ্চল ছিল তুর্কিস্তানেরই অংশ। আরও জানতে দেখুন মাকতাবাতুল হাসান থেকে প্রকাশিত ড. রাগিব সারজানির '*তুর্কিস্তানের কান্না*'।

শাহর্‌বারাজ বলেন, 'আমরা তাদের সঙ্গে সন্ধি করে থাকা পছন্দ করি আর আমরা আল-বাবের পশ্চাদ্ভাগে রয়েছি।' শাহর্‌বারাজের কথার উত্তরে আবদুর রহমান বলেন, 'আল্লাহ তাআলা আমাদের মাঝে তার রাসুলকে প্রেরণ করেছেন এবং তার জবানে আমাদেরকে সাহায্য ও বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমরা সর্বদা বিজয়ীই থাকব।'

এরপর আবদুর রহমান তুর্কিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তিনি দুইশ ফরসখ (প্রায় সাতশ মাইল) দূরে বালানজার নগরীতে অভিযান পরিচালনা করেন। পরবর্তী সময়ে তৃতীয় খলিফা উসমান রাযি.-এর আমলেও তিনি কয়েকবার তুর্কিস্তানে বিজয়াভিযান পরিচালনা করেন।

বিস্ময়ের বিষয় হলো, আল্লাহ তাআলা এ সময় তুর্কিদের অন্তরে মুসলমানদের প্রতি প্রবল ভীতি সঞ্চার করে দিয়েছিলেন। তুর্কিরা আবদুর রহমান বিন রাবিআ সম্পর্কে বলত, 'ফিরেশতারা এই লোকটির সঙ্গে থাকে এবং তার মৃত্যু ঠেকিয়ে রাখে। এ কারণেই সে আমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করার দুঃসাহস দেখায়।'

তারা এই বিশ্বাস পোষণ করত যে, মুসলমানদের মৃত্যু নেই। একবার উদ্দেশ্যহীন একটি তির জনৈক মুসলিম ব্যক্তির শরীরে বিদ্ধ হয়ে সে মারা গেলে তখন তারা বুঝতে পারে যে, মুসলমানরা অমর নয়। এরপর থেকে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার সাহস দেখায়।

এরপর যখন আবদুর রহমান বিন রবিআ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসেন, তখন তারা অটল-অবিচল থেকে যুদ্ধ করে যায়। আবদুর রহমান বিন রবিআ (তাকে যুননুন নামে ডাকা হতো) এ যুদ্ধে শহিদ হন। এবারের যুদ্ধে তুর্কিদের বিরুদ্ধে মুসলিম বাহিনী পরাভূত হয়। তুর্কিরা মুসলিম সেনাপতি আবদুর রহমান বিন রবিআর লাশ তুলে নিয়ে নিজেদের দেশে সমাধিস্থ করে। দীর্ঘকাল পর্যন্ত (দুর্ভিক্ষের সময়) তুর্কিরা তার সমাধির কাছে এসে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করত।

তখন থেকে ৭৯ হিজরি সন পর্যন্ত তুর্কিস্তানে বিজয়াভিযানের প্রচেষ্টা স্থগিত থাকে।

৭৯ হিজরিতে (৬৯৮ খ্রিষ্টাব্দে) উবায়দুল্লাহ বিন আবু বাকরা তুর্কি শাসক রডবিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধপরিচালনা করেন। রডবিল কখনো মুসলমানদের সঙ্গে তোষামোদপূর্ণ আচরণ করত; আবার কখনো অবাধ্য আচরণ করত।

তার এই দ্বিমুখী আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ উবায়দুল্লাহ বিন আবু বাকরাকে তার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার নির্দেশ দেন।

উবায়দুল্লাহ একের পর এক যুদ্ধে রতবিলের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে বিভিন্ন নগরীতে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে সামনে অগ্রসর হতে থাকেন আর রতবিল ও তার তুর্কি বাহিনী পালিয়ে আরেক নগরীতে আশ্রয় নিতে থাকে। এভাবে তারা নিজেদের প্রধান নগরীর কাছে মাত্র আঠারো ফরসখ দূরত্বে পৌঁছে যায়। এ সময় তুর্কিরা মুসলিম বাহিনীর পেছনের সকল পথ বন্ধ করে দেয় এবং তাদের চলাচলের পথ রুদ্ধ করে দেয়। মুসলিম বাহিনীর নিশ্চিত ধ্বংস জেনে সেনাপতি উবায়দুল্লাহ রতবিলের সঙ্গে সন্ধি করার মনস্থ করেন। কিন্তু মুসলিম বাহিনীর সদস্য সাহাবি শুরায়হ বিন হানি রাযি.-এর বিরোধিতা করে সকলকে লড়াই চালিয়ে যেতে এবং ধৈর্যের সঙ্গে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে উদ্বুদ্ধ করেন। সেনাপতি উবায়দুল্লাহ তাকে লড়াই করতে নিষেধ করেও ব্যর্থ হন। কিছু সাহসী সৈনিক শুরায়হ রাযি.-এর ডাকে সাড়া দিলে তিনি তাদেরকে নিয়েই তুর্কিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকেন। যুদ্ধে শুরায়হ রাযি.-সহ মুসলিম বাহিনীর প্রায় ত্রিশ হাজার সৈন্য শহিদ হয়। তুর্কি বাহিনী হারায় এর কয়েকগুণ বেশি সৈন্য। বেঁচে থাকা অবশিষ্ট সৈন্যদের নিয়ে উবায়দুল্লাহ রতবিলের রাজ্য থেকে ফিরে আসেন। সংবাদ পেয়ে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ খলিফা আবদুল মালিকের কাছে বিস্তারিত জানিয়ে বার্তা পাঠান এবং প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য রতবিলের এলাকায় একটি বিশাল বাহিনী প্রেরণের বিষয়ে খলিফার পরামর্শ চান। খলিফা হাজ্জাজের প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করেন। সে বছরই (৮০ হিজরি সনে) উবায়দুল্লাহ বিন আবু বাকরা ইন্তেকাল করায় হাজ্জাজ এবার আবদুর রহমান বিন মুহাম্মাদ ইবনুল আশআছের নেতৃত্বে চল্লিশ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী প্রস্তুত করেন। হাজ্জাজ ইবনুল আশআছকে কঠিনভাবে অপছন্দ করলেও তার রণদক্ষতা ও সমরনিপুণতার কথা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করতেন।

মুসলিম বাহিনীর অগ্রযাত্রার সংবাদ পেয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত রতবিল মুসলিম সেনাপতি ইবনুল আশআছের কাছে দূত প্রেরণ করে ইতিপূর্বে উবায়দুল্লাহর বাহিনীর সঙ্গে কৃত ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে ক্ষমাপ্রার্থনা করে। কিন্তু ইবনুল আশআছ তার কৈফিয়ত প্রত্যাখ্যান করে তার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন।

ইবনুল আশআছ একে একে অনেকগুলো নগরীর উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। তিনি প্রতিটি শহরে নিরাপত্তা-বিধানের জন্য একজন করে প্রশাসক নিযুক্ত করেন। এসব অভিযানে মুসলিম বাহিনী প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ও অনেক যুদ্ধবন্দি লাভ করে। এরপর তিনি তার বাহিনীর সদস্যদের রতবিলের রাজ্যের আরও গভীরে প্রবেশ করতে নিষেধ করে দখলকৃত এলাকাগুলোর উন্নয়নে মনোনিবেশ করতে বলেন এবং পরবর্তী বছর পর্যন্ত অগ্রবর্তী অভিযান মুলতবি করেন। তিনি হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কাছে পত্র পাঠিয়ে অর্জিত বিজয় ও আপাতত অভিযান মুলতবি রাখার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবহিত করেন। কিন্তু হাজ্জাজ ইবনুল আশআছের সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হয়ে বার্তাপ্রেরণের মাধ্যমে তাকে ভীরু-কাপুরুষ বলে অপবাদ দেন। তিনি ইবনুল আশআছকে যুদ্ধবিমুখ বলেও অভিযুক্ত করেন। এরপর হাজ্জাজ আরও দুটি বার্তা প্রেরণ করেন এবং উভয় বার্তায় ইবনুল আশআছকে তীব্র ও অশ্লীল ভাষায় আক্রমণ করেন। হাজ্জাজের পত্র পেয়ে ইবনুল আশআছ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তিনি জানতেন যে, হাজ্জাজ তাকে ঘৃণা করেন এবং তাকে সরিয়ে দিতে চান। তাই তিনি তার সৈন্যদের একত্র করে বললেন, হাজ্জাজ ও আমাদের দৃষ্টান্ত হলো যেমন এক ব্যক্তি তার ভাইকে বলেছিল—

اِحْمِلْ عَبْدَكَ عَلَى الْفَرَسِ؛ فَإِنْ هَلَكَ هَلَكَ، وَإِنْ نَجَا فَلَكَ

> ভৃত্যটিকে ঘোড়ায় উঠিয়ে দাও; মারা গেলে তো মারাই গেল আর বেঁচে ফিরে আসলে তোমারই থাকল।

হে আমার সৈন্যরা, যদি তোমরা যুদ্ধে জয়লাভ করো, তাহলে তো হাজ্জাজের ক্ষমতা ও শাসন-পরিধি বৃদ্ধি পাবে আর যদি নিহত হও, তাতেও তার লাভ; তার শত্রুই কমবে। এরপর তিনি বলেন, সকলে আল্লাহর দুশমন হাজ্জাজকে অপসারণ করো এবং তাকে প্রদত্ত আনুগত্যের অঙ্গীকার প্রত্যাহার করে নাও (ইবনুল আশআছ খলিফা আবদুল মালিককে অপসারণের কথা বলেননি) এবং তোমাদের সেনাপতি আবদুর রহমান ইবনুল আশআছের হাতে আনুগত্যের বায়আত গ্রহণ করো। আমি তোমাদের সাক্ষী রেখে বলছি, প্রথম আমি নিজেই হাজ্জাজকে প্রদত্ত অঙ্গীকার প্রত্যাহার করলাম। সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সৈন্যগণ চিৎকার করে

বলে ওঠে, আমরাও আল্লাহর দুশমন হাজ্জাজের হাতে কৃত বায়আত প্রত্যাহার করলাম।

এরপর ইবনুল আশআছ তুর্কি শাসক রডবিলের সঙ্গে এই মর্মে সন্ধি করেন যে, তিনি যদি হাজ্জাজের বিরুদ্ধে জয়ী হতে পারেন, তাহলে ভবিষ্যতে কখনো রডবিলের ওপর কোনো ট্যাক্স আরোপ করা হবে না। এরপর উভয়ে হাজ্জাজের বিরুদ্ধে অভিযানের উদ্দেশ্যে রওনা হন।[৬২]

ইবনুল আশআছের এই বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে এ সময় তুর্কি অঞ্চলে বিজয়াভিযানের ধারা মুলতবি থাকে।

এরপর বীর সেনানী কুতায়বা বিন মুসলিম আল-বাহিলি রহ.-এর নেতৃত্বে তুর্কিস্তানের মাওয়ারাউন নাহার অঞ্চলে শুরু হয় কার্যকর ইসলামি বিজয়াভিযান। তিনি ৮৭ হিজরি সনে (৭০৬ খ্রিষ্টাব্দে) বুখারার 'বায়কান্দ' প্রদেশে অভিযান পরিচালনা করেন। শত্রুপক্ষের বিরাট সৈন্যদল কুতায়বার বাহিনীর মোকাবিলা করে এবং প্রায় দুই মাস কুতায়বাকে অবরুদ্ধ করে রাখে। এ সময় শত্রুপক্ষ মুসলিম বাহিনীর চলাচলের পথ, গিরিপথ ও প্রত্যাবর্তনপথ বন্ধ করে দেয়। মুসলিম বাহিনীর সংবাদ হাজ্জাজের কাছে পৌঁছতে বিলম্ব হওয়ায় তিনি কুতায়বার নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং তুর্কি শত্রুপক্ষের সংখ্যাধিক্যের কারণে মুসলিম বাহিনীর অনিষ্ট আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। হাজ্জাজ মসজিদে-মসজিদে মুসলিম বাহিনীর নিরাপত্তার জন্য দোয়া করার নির্দেশ প্রদান করেন এবং বিভিন্ন ইসলামি নগরীতে একই নির্দেশসহ বার্তা প্রেরণ করেন। এদিকে কুতায়বা ও তার সঙ্গী যোদ্ধাগণ প্রতিদিন তুর্কিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত। কুতায়বার সঙ্গে তুনদার নামক জনৈক অনারবি গুপ্তচর ছিল। বুখারাবাসী এই শর্তে তাকে প্রচুর অর্থসম্পদ প্রদান করে যে, সে এর বিনিময়ে কুতায়বাকে বুখারা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করবে। তুনদার কুতায়বার কাছে উপস্থিত হয়ে বলে, আমি আপনার সঙ্গে একান্তে কিছু কথা বলতে চাই। তখন কুতায়বা সবাইকে সামনে থেকে সরিয়ে দেন। বাকি থাকে কেবল যিরার বিন হুসাইন নামক জনৈক ব্যক্তি। এরপর তুনদার বলে, তিনি হাজ্জাজের বরখাস্তের সংবাদ নিয়ে আপনার কাছে ছুটে এসেছেন। সুতরাং আমার মতে আপনি এখন সবাইকে নিয়ে মার্ভ (Merv) ফিরে

---

৬২. ইবনুল আশআছের পরিণতি সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

গেলে ভালো হবে। কুতায়বা তৎক্ষণাৎ তুনদারকে হত্যা করার জন্য তার জনৈক ভৃত্যকে নির্দেশ দেন। ভৃত্য হুকুম তামিল করার পর তিনি যিরারকে বললেন, আমি আর তুমি ছাড়া এমন আর কেউ নেই, যে তার কথা শুনেছে। আমি আল্লাহর শপথ করে তোমাকে বলছি—যদি আমাদের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পূর্বে এ কথা প্রকাশ পায়, তাহলে তোমাকেও তার কাছে পাঠিয়ে দেবো। সুতরাং তুমি নিজের মুখ নিয়ন্ত্রণে রেখো। কারণ, বর্তমান পরিস্থিতিতে এ কথা প্রকাশ পেয়ে গেলে সৈন্যদের মাঝে দুর্বলতা ছড়িয়ে পড়বে আর শত্রুরা উদ্যমী হয়ে উঠবে। এরপর কুতায়বা সকলকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। সকলে পূর্ণ উদ্যমে তুর্কিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তুর্কিরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। তুর্কিরা কুতায়বার কাছে সন্ধিচুক্তির আবেদন জানালে তিনি প্রচুর অর্থ প্রদানের শর্তে তাদের সঙ্গে চুক্তি করেন। এরপর তিনি মুসলিম বাহিনীর জনৈক সদস্যকে উক্ত এলাকার প্রশাসক নিযুক্ত করে তার সঙ্গে কিছু সৈন্য রেখে যান।

প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে অল্পদূর পথ অতিক্রম করতেই তিনি সংবাদ পান যে, বিজিত অঞ্চলের তুর্কিরা চুক্তি ভঙ্গ করে মুসলিম প্রশাসককে হত্যা করেছে এবং অন্যান্য সৈন্যদের (লাঞ্ছিত করতে) নাক কর্তন করেছে। কুতায়বা তৎক্ষণাৎ বায়কান্দ ফিরে আসেন এবং এক মাস পর্যন্ত তুর্কিদের অবরোধ করে রাখেন। এ সময় তারা পুনরায় সন্ধি চুক্তি করতে চাইলে তিনি তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। অবরোধ দীর্ঘায়ত করে একসময় তিনি পুনরায় বায়কান্দ জয় করেন। এরপর তিনি বিদ্রোহীদের হত্যা করেন, তাদের সন্তানদের দাসে পরিণত করেন এবং তাদের সম্পদ যুদ্ধলব্ধ সম্পদে পরিণত করেন। মুসলমানদের সঙ্গে কৃত সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করতে তুর্কিদের জনৈক এক-চক্ষুহীন ব্যক্তি প্ররোচিত করেছিল। তাকে বন্দি করে কুতায়বার সামনে উপস্থিত করা হলে সে কুতায়বাকে বলে, 'আমাকে ছেড়ে দিন; বিনিময়ে আপনাকে চীনে তৈরি অতি মূল্যবান পাঁচটি বস্ত্র দেবো, যার মূল্য হাজার হাজার মুদ্রা।' সঙ্গে থাকা সেনাপতিগণ কুতায়বাকে উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করার পরামর্শ দিলে তিনি বলেন, 'না, আল্লাহর শপথ! আমি দ্বিতীয়বার তোমাকে মুসলমানদের ভীত-সন্ত্রস্ত করার সুযোগ দেবো না।' এরপর তার নির্দেশে লোকটির শিরশ্ছেদ করা হয়। নিঃসন্দেহে এ ঘটনা মহান বিজেতা কুতায়বা বিন মুসলিম রহ.-এর নিষ্ঠা ও নির্মোহতার এক অনন্যসাধারণ উদাহরণ।

মুসলমানরা বায়কান্দ থেকে প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ করে। এর মধ্যে ছিল স্বর্ণ-রুপার তৈরি অনেক পাত্র, স্বর্ণের তৈরি মূর্তি ইত্যাদি। কেবল সাবাক নামক একটি মূর্তির ভেতর পাওয়া যায় একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা। মুসলিম বিজেতারা রাজন্যবর্গের কোষাগার হতেও প্রচুর সম্পদ ও অস্ত্রশস্ত্র লাভ করে। পাওয়া যায় প্রচুর দাস-দাসীও। সেনাপতি কুতায়বা বার্তাবাহক পাঠিয়ে হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে বিস্তারিত অবহিত করেন এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সৈন্যদেরকে প্রদানের বিষয়ে জানতে চান। হাজ্জাজ অনুমতি দিলে কুতায়বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। বাহিনীর প্রত্যেক সদস্য প্রচুর সম্পদের অধিকারী হয় এবং শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রচুর অস্ত্রেরও অধিকারী হয়। অস্ত্র ও সম্পদে মুসলিম বাহিনী এক শক্তিশালী বাহিনীতে পরিণত হয়।

৮৯ হিজরি সনে কুতায়বা বুখারা সীমান্তে বুখারাবাসীর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড লড়াই করেন। কিন্তু প্রবল চেষ্টার পরও তিনি বুখারায় প্রবেশ করতে ব্যর্থ হন। বাধ্য হয়ে তিনি মার্ভে ফিরে আসেন। তখন হাজ্জাজের বার্তাবাহক পত্র নিয়ে তার কাছে উপস্থিত হয়। পত্রে বুখারা বিজয়ের প্রচেষ্টা ছেড়ে চলে আসায় কুতায়বাকে কঠিন ভাষায় তিরস্কার করা হয়। পাশাপাশি হাজ্জাজ কুতায়বাকে বুখারা নগরীর নকশা প্রেরণ করার নির্দেশ দেন। কুতায়বা বুখারার নকশা প্রেরণ করলে ফিরতি পত্রে হাজ্জাজ লেখেন, তুমি পুনরায় বুখারা জয়ের চেষ্টা করো, নিজের গোনাহর জন্য আল্লাহর কাছে তাওবা করো এবং অমুক অমুক স্থান দিয়ে নগরীতে প্রবেশের চেষ্টা করো। যুদ্ধের সময় প্রতারণা পরিহার করে চলবে।

বুখারা বিজয়

৯০ হিজরি সনে (৭০৯ খ্রিষ্টাব্দে) কুতায়বা বিন মুসলিম রহ. বুখারায় অবস্থানরত তুর্কি বাহিনীকে পরাজিত করে বুখারা জয় করেন। বুখারার আশেপাশের বিভিন্ন নগরীর প্রশাসকগণ বার্ষিক কর প্রদানের শর্তে তার সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করে। কিন্তু কিছুদিন পরই তারা চুক্তি ভঙ্গ করে। বুখারার শাসক ওয়ারদান আশেপাশের প্রশাসকগণকে চুক্তি ভঙ্গ করতে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্ররোচিত করে বলে, 'আরবরা হলো ডাকাতের ন্যায়; কিছু সম্পদ পেলেই তারা চলে যাবে। এই কুতায়বা তো রাজা নয়, তার রাজা হওয়ার আশাও নেই, সে এসেছে তার রাজার

চাহিদা পূরণ করতে। তাকে কিছু সম্পদ দিলে সে তুষ্ট হয়ে নিজ বাহিনী নিয়ে ফিরে যাবে।'

ওয়ারদানের প্ররোচনায় সকল প্রশাসক মিলে এক বিশাল বাহিনী সমবেত করতে সক্ষম হয়। ইতিপূর্বে এ অঞ্চলের ইতিহাসে এরূপ বিশাল সৈন্যসমাবেশ ঘটেনি। কুতায়বা প্রচণ্ড হামলা চালিয়ে এই বিশাল বাহিনীকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলেন এবং প্রতিপক্ষের অনেক সৈন্যের ইহলীলা সাঙ্গ করেন। এভাবে তিনি পুনরায় পুরো অঞ্চল মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে সক্ষম হন। এরপর তিনি তুর্কি শাসক নাইজাক খানের পশ্চাদ্ধাবন করেন। নাইজাক খান পালিয়ে এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে যেতে থাকলে তিনিও তার অনুসরণ করেন। অবশেষে এক দুর্গে তাকে দু-মাস অবরুদ্ধ রাখলে সে মৃতপ্রায় অবস্থায় উপনীত হয়। এরপর কুতায়বা তার সঙ্গীদের সঙ্গে পরামর্শ করে নাইজাক খান ও তার সঙ্গীদের হত্যা করেন।

কুতায়বার নেতৃত্বে ইসলামের বিজয়যাত্রা অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলতে থাকে। একের পর এক নগরী জয় করে একসময় তিনি মুসলমানদের পুরোনো শত্রু প্রতাপশালী তুর্কি শাসক রতবিলের রাজ্য সিজিস্তানে পৌঁছান। রতবিলের রাজ্যে মুসলিম বাহিনী পা রাখতেই রতবিলের দূতগণ কুতায়বার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে সন্ধির প্রস্তাব দিলে তিনি সম্মত হয়ে চুক্তি করেন।

সমরকন্দ বিজয়

৯৩ হিজরি সনে (৭১১ খ্রিষ্টাব্দে) কুতায়বা রহ. সমরকন্দ জয় করেন। তীব্র লড়াইয়ের পর সমরকন্দবাসী তার সঙ্গে সন্ধি চুক্তি করে। কুতায়বা সমরকন্দে একটি মসজিদ নির্মাণ করে তাতে নামাজ আদায় করেন এবং খুতবা প্রদান করেন। এরপর তিনি সমরকন্দে বিদ্যমান সকল মূর্তি একত্র করার নির্দেশ দেন। মূর্তিগুলো একটির ওপর একটি রাখা হলে বিশাল প্রাসাদসম ভবনের রূপ ধারণ করে। তিনি মূর্তিগুলো ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেন। তার নির্দেশ শুনে সমরকন্দবাসী চিৎকার ও কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। নেতৃস্থানীয় জনৈক মূর্তিপূজারি কুতায়বাকে বলে, 'এখানে এমন কিছু প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী মূর্তি আছে, যেগুলো যে-ই ধ্বংস করার চেষ্টা করবে, সে নিজেই ধ্বংস হয়ে যাবে।' সুগদ (Sogdia)-এর শাসক ঘুরাক

(Ghurak) সেখানে উপস্থিত হয়ে কুতায়বাকে বলে, 'আমি আপনার কল্যাণকামী ও শুভাকাঙ্ক্ষী; আপনি দয়া করে এমন ভুল করবেন না।' তখন কুতায়বা দাঁড়িয়ে হাতে একটি আগুনের মশাল নিয়ে বলেন—'আমি নিজ হাতে মূর্তিগুলোতে আগুন ধরাব; তোমরা সকলে মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করো, পরে আর সুযোগ পাবে না।' এরপর তিনি 'আল্লাহু আকবার' বলে মূর্তিগুলোতে আগুন লাগিয়ে দেন। অল্প সময়ের মধ্যে সবগুলো মূর্তি পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

৯৪ হিজরি সনে কুতায়বা রহ. শাশ ও ফারগানা অঞ্চলও জয় করেন।

চীনভূমিতে অভিযান

বিখ্যাত সেনাপতি কুতায়বা বিন মুসলিম রহ. এরপর পূর্ব দিকে তার অভিযান অব্যাহত রাখেন এবং ৯৬ হিজরি সনে (৭১৫ খ্রিষ্টাব্দে) চীনের কাশগড় অঞ্চল জয় করেন। এরপর তিনি চীন সম্রাটের কাছে কয়েকজন দূত পাঠিয়ে তাকে সতর্ক করেন এবং তাকে ইসলাম গ্রহণ বা জিজিয়া প্রদানের আহ্বান জানান।

কুতায়বার প্রেরিত দূতদের সঙ্গে চীনসম্রাটের যে কথোপকথন হয়, তা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

চীন সম্রাট—তোমরা তো আমার রাজ্যের বিশালতা দেখেছ। আমার হাত থেকে কেউ তোমাদের রক্ষা করতে পারবে না। (এই বিশাল রাজ্যে) তোমাদের অবস্থান আমার হাতের তালুতে একটি ডিমের মতো। সুতরাং তোমরা তোমাদের সঙ্গীর (কুতায়বা) কাছে ফিরে যাও এবং তাকে বলো, সে যেন আমার রাজ্য থেকে চলে যায়। আমি তার লালসার বিষয়টি অনুমান করতে পেরেছি, উপলব্ধি করতে পেরেছি তার সৈন্যস্বল্পতার বিষয়টিও। যদি তোমরা না ফেরো, তাহলে আমি তোমাদের বিরুদ্ধে এমন বিশাল এক বাহিনী প্রেরণ করব, যারা তোমাদের শেষ ব্যক্তিটিকেও নিঃশেষ করে ছাড়বে।

কুতায়বার দূত—আপনি কুতায়বাকে এ কথা বলতে বলছেন?! তার সৈন্যসংখ্যা কীকরে অল্প হবে! তার বাহিনীর প্রথমাংশ তো আপনার রাজ্যে আর শেষ অংশ জয়তুনভূমিতে (দারুল খিলাফাহ দামেশকে)! যিনি বিশাল জগৎ জয় করার পরও তা পেছনে ফেলে আপনার রাজ্যে আপনার

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছেন, তিনি কী করে সম্পদলোভী হতে পারেন?! আর আমাদেরকে নিহত ও নিঃশেষ হওয়ার ভয় দেখাচ্ছেন? আমরা তো ভালো করেই জানি যে, আমাদের প্রত্যেকেরই একটি 'আজাল' ও সুনির্ধারিত আয়ু রয়েছে। আর মৃত্যু যখন অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং লড়াই করতে করতে শহিদ হওয়াই আমাদের কাছে সবচেয়ে মর্যাদার মৃত্যু। আমরা মৃত্যুকে ভয় করি না, অপছন্দও করি না।

চীন সম্রাট—তাহলে তোমাদের সেনাপতি কী পেলে খুশি হবেন?

কুতায়বার দূত—তিনি তো শপথ করেছেন যে, আপনার দেশের মাটি পদদলিত না করে, আপনার রাজত্ব শেষ না করে এবং আপনার দেশ থেকে জিজিয়া সংগ্রহ না করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করবেন না।

চীন সম্রাট—আমি তার শপথ পূর্ণ করে এ দেশ থেকে বের হয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করছি। আমি তার কাছে আমার দেশের কিছু মাটি ও চারজন রাজপুত্রকে প্রেরণ করছি। সঙ্গে প্রচুর স্বর্ণ, রেশমি কাপড় এবং এমন অমূল্য কিছু চীনা পরিচ্ছদ পাঠাচ্ছি, যার মূল্য আন্দাজ করাও কঠিন।

কথামতো চীনা সম্রাট এ সবকিছু প্রেরণ করলে কুতায়বা তা গ্রহণ করে নেন। কারণ, এরইমধ্যে তার কাছে খলিফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিকের মৃত্যুসংবাদ এসে পৌঁছেছিল এবং এ কারণে তার যুদ্ধস্পৃহায় ভাটা সৃষ্টি হয়েছিল।[৬৩]

৯৮ হিজরি সনে ইয়াযিদ বিন মুহাল্লাবের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী জুরজান জয় করে। উক্ত অভিযানের একটি ঘটনা আমাদের সামনে অভিযানে অংশগ্রহণকারী মহান সৈন্যদের সুউচ্চ আত্মিক চেতনা ও সমুন্নত মূল্যবোধের বিষয়টি তুলে ধরে।

ইয়াযিদ বিন মুহাল্লাব এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে জুরজানে অভিযান চালিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে ষাট হাজার ছিল শামের বাহিনীর সদস্য। জুরজান বিজয়ের মাধ্যমেই আশেপাশের অন্যান্য অঞ্চলে অভিযানের পথ

---

৬৩. ওয়ালিদের পর খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন তার ভাই সুলায়মান বিন আবদুল মালিক। কুতায়বা বিন মুসলিম যেহেতু ইতিপূর্বে সুলায়মানের খিলাফতপ্রাপ্তির বিষয়ে বিরোধিতা করেছিলেন, তাই স্বভাবতই তিনি খলিফা ওয়ালিদের প্রয়াণ ও সুলায়মানের দায়িত্বলাভের সংবাদ পেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। কুতায়বা আশঙ্কা করছিলেন যে, সুলায়মান তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন।

উন্মুক্ত হয়, রাস্তাঘাটে চলাচল শুরু হয়। অত্যন্ত ভীতিপ্রদ এসব পথে ইতিপূর্বে ভুলেও কেউ পা বাড়াত না। অভিযানে ইয়াযিদ বিন মুহাল্লাব প্রচুর গনিমত লাভ করেন, যার মধ্যে অতি মূল্যবান মণি-মুক্তা খচিত একটি রাজমুকুটও ছিল। এ সময় ইয়াযিদ উপস্থিত সৈন্যদের প্রশ্ন করেন, 'তোমরা কি এমন কাউকে চেনো, যিনি এই মুকুটটি দেখার পর এর প্রতি সামান্য আগ্রহও বোধ করবেন না?' সকলে উত্তর দেয়, 'না, আমরা এমন কারও কথা জানি না।' ইয়াযিদ বলেন, 'আল্লাহর শপথ! আমি এমন এক ব্যক্তির কথা জানি, যার সামনে বা যার মতো লোকদের সামনে এই মুকুট পেশ করা হলে এর প্রতি মোটেও আগ্রহী হবেন না।' এরপর তিনি তার বাহিনীর সদস্য (তাবেয়ি) মুহাম্মাদ বিন ওয়াসিকে আহ্বান করেন এবং তাকে রাজমুকুটটি গ্রহণ করতে বলেন। উত্তরে মুহাম্মাদ বলেন, 'আমার এর প্রয়োজন নেই।' তখন ইয়াযিদ তাকে বলেন, 'আমি শপথ করে বলছি, আপনাকে এটা নিতে হবে।' এরপর তিনি মুকুটটি নিয়ে সেখান থেকে উঠে যান। তখন ইয়াযিদ তাকে অনুসরণ করার জন্য এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দেন এবং তিনি মুকুটটি নিয়ে কী করেন, তা লক্ষ করতে বলেন। যাওয়ার পথে এক ভিক্ষুক মুহাম্মাদ বিন ওয়াসির কাছে সাহায্যপ্রার্থনা করলে তিনি তাকে মুকুটটি দিয়ে দেন। সংবাদ পেয়ে ইয়াযিদ লোক পাঠিয়ে ভিক্ষুকটির কাছ থেকে মুকুটটি নিয়ে নেন এবং বিনিময়ে তাকে প্রচুর অর্থ প্রদান করেন।

১১০ হিজরি সনে মাসলামা বিন আবদুল মালিক তুর্কি শাসক খাকানের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। মাসলামার মোকাবিলায় খাকান সুবিশাল বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হয়। প্রায় এক মাস উভয় বাহিনী আপন আপন অবস্থানে অপেক্ষারত থাকে। অবশেষে শীতকালে আল্লাহ তাআলা খাকানের বাহিনীকে পর্যুদস্ত করেন। মাসলামা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নিয়ে নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করেন। শামে ফেরার পথে মাসলামা জুলকারনাইনের পদচিহ্ন অনুসরণ করেন। এ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদেরকে 'কাদামাটির যোদ্ধা' বলা হয়। কারণ, তারা এ অভিযানে কাদামাটি ও চোরাবালিতে ভরা বিভিন্ন স্থান অতিক্রম করে; অনেক পশু তাতে ডুবে যায় এবং বহু সৈনিক কাদামাটিতে আটকে যায়। বহু ঘাত-প্রতিঘাত, প্রতিকূল পরিস্থিতি ও দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে মুসলিম বাহিনী শামে প্রত্যাবর্তন করতে সক্ষম হয়।

১১২ হিজরিতে তুর্কিস্তানে পরিচালিত এক অভিযান সম্পর্কে ঐতিহাসিক ইবনে কাছির রহ. লিখেছেন—

> তুর্কিরা মুসলিম বাহিনীর ডানবাহুর ওপর হামলা চালায়। বাহিনীর এ অংশে ছিল তামিম ও আয্দ গোত্র। তুর্কিদের আক্রমণে এই দুই গোত্রসহ অন্যান্য বিভিন্ন গোত্রের অনেক সৈন্য শহিদ হয়ে যায়। শাহাদাত তো আল্লাহর অনুগ্রহ-দান; তিনি যাকে ইচ্ছা, তাকে এই মহাসম্পদ দান করেন। এ সময় মুসলিম বাহিনীর জনৈক বীর যোদ্ধা চরম রণনিপুণতা প্রদর্শন করে এবং তুর্কি বীর যোদ্ধাদের একটি দলের সঙ্গে একাই লড়াই করে তাদের সকলকে হত্যা করে। এ অবস্থা দেখে খাকানের শাহি ঘোষক ঘোষণা করে, 'তুমি যদি আমাদের দলে চলে আসো, তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের সবচেয়ে বড় মূর্তির পরিচালক পদে বরণ করে নেব এবং তোমারও পূজা করব।' তখন সেই মহান যোদ্ধা উত্তর দেন, 'ধিক তোমাদের! আমরা তো তোমাদের বিরুদ্ধে কেবল এ জন্য যুদ্ধ করছি যে, তোমরা এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও উপাসনা করবে না। আল্লাহর কোনো শরিক নেই।' এরপর তিনি তুর্কিদের বিরুদ্ধে লড়তে লড়তে শহিদ হয়ে যান। আল্লাহ তার প্রতি দয়া করুন। এই বীর যোদ্ধার শাহাদাতের পর মুসলিম বাহিনীর অন্যান্য বীর যোদ্ধারা অগ্রসর হয় এবং অটল-অবিচল থেকে যুদ্ধ করতে থাকে। তারা একযোগে তুর্কিদের ওপর হামলা চালালে আল্লাহ তাআলা তুর্কিদের পর্যুদস্ত করেন এবং তাদের প্রচুর সৈন্য নিহত হয়। এরপর তুর্কিরা পাল্টা হামলা চালিয়ে মুসলিম বাহিনীর প্রচুর সৈন্যকে হত্যা করে। মুসলিম বাহিনীর মাত্র দু-হাজার সৈন্য ব্যতীত সকলে শহিদ হয়ে যায়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মুসলিম সৈন্যদের অনেককে বন্দি করে খাকানের সামনে উপস্থিত করা হলে তার নির্দেশে তাদের প্রত্যেককে হত্যা করা হয়। ইন্না লিল্লাহি ...। এ যুদ্ধকে ঘাঁটির যুদ্ধ বলা হয়।[৬৪]

---

৬৪. ইবনে কাছির দিমাশকি, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৯/২৮১-২৮২।

১১৯ হিজরি সনে (৭৩৭ খ্রিষ্টাব্দে) আসাদ বিন আবদুল্লাহ কাসরি রহ. তুর্কি মহারাজ খাকানকে হত্যা করেন। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো—খাকান এ সময় মুসলিম বাহিনীকে চূড়ান্তরূপে ধ্বংস করার জন্য বিশাল সেনাবাহিনী প্রস্তুত করে। মুসলিম বাহিনীর মনোবল দুর্বল করার উদ্দেশ্যে খাকান প্রচার করে যে, মুসলিম সেনাপতি আসাদ নিহত হয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ তার কূট-কৌশলকে বুমেরাং করে দেন এবং তার ফাঁদে তাকেই ধ্বংস করেন। মুসলিম বাহিনীর সদস্যরা আসাদের মৃত্যুসংবাদ শুনে দ্বীনি চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে এবং দুশমনের বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভ ও ক্রোধ আরও বৃদ্ধি পায়। তারা তাদের সেনাপতিহত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার সংকল্প করে। এরপর আসাদ যে স্থানে ছিলেন, তারা সে স্থান অভিমুখে রওনা হয়। সেখানে পৌঁছে তারা আসাদকে জীবিত দেখতে পায়। এরপর আসাদ সবাইকে নিয়ে খাকানের বাহিনীর উদ্দেশে রওনা হন। জাবালে মিল্‌হ নামক স্থানে পৌঁছে তিনি বলখ নদী পাড়ি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে ছিল প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ। সেনাপতি আসাদ এসব সম্পদ ফেলে যেতে চাচ্ছিলেন না। তিনি অশ্বারোহী সৈন্যদের নির্দেশ দেন যে, প্রত্যেকে যেন সামনে একটি এবং ঘাড়ে করে একটি ছাগল বহন করে নিয়ে যায়। নির্দেশ অমান্য করা হলে তিনি হাত কেটে ফেলার হুমকি দেন। তিনি নিজেও একটি ছাগল কাঁধে নিয়ে সবার সঙ্গে নদী পাড়ি দেন।

মুসলিম বাহিনী তখনও ভালো করে নদী পাড়ি দিতে পারেনি, এরই মধ্যে খাকান পেছন দিক থেকে তার বাহিনী নিয়ে উপস্থিত হয়। মুসলিম বাহিনীর যেসব সদস্য তখনও নদী পার হতে পারেনি, খাকানের বাহিনী তাদেরকে হত্যা করে। এরপর খাকান মুসলিম বাহিনীর অনুসরণ করে নদী পাড়ি দিয়ে মুসলিম ছাউনির কাছে চলে আসে। মুসলিম বাহিনী নিজেদের ছাউনিতেই অবস্থান করছিল। তারা চতুর্দিক পরিখা ঘেরা একটি স্থানে ছাউনি স্থাপন করেছিল বিধায় খাকানের বাহিনীর পক্ষে মুসলিম বাহিনীর নাগাল পাওয়া সম্ভব ছিল না। রাতের বেলা উভয় পক্ষের সামনে অপর পক্ষের প্রজ্বলিত আগুন দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। প্রত্যুষে খাকান মুসলিম বাহিনীর একটি অংশের ওপর হামলা চালিয়ে অনেককে হত্যা করে, কতক সৈন্যকে বন্দি করে এবং সম্পদবোঝাই কয়েকটি উট নিয়ে যায়।

এরপর আসাদ ও তার বাহিনী সামনে অগ্রসর হয়ে বলখের মার্‌জ ভূমিতে অবতরণ করে। ততদিনে শীতকালও শেষ হয়ে গেছে। ঈদুল আযহার

দিন আসাদ সকলের সম্মুখে খুতবা প্রদান করেন এবং সম্ভাব্য তিন করণীয় হতে একটি বেছে নেওয়ার বিষয়ে সকলের পরামর্শ চান—১. মার্ভে ফিরে যাওয়া ২. খাকানের সুবিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া ৩. বলখে সুরক্ষিত অবস্থান গড়ে তোলা। সৈন্যগণ খাকানের মোকাবিলা করার পক্ষে মত দেয়। এরপর আসাদ সকলকে নিয়ে দীর্ঘ সময় নিয়ে দু-রাকাত নামাজ আদায় করেন, তারপর দীর্ঘক্ষণ দোয়া করেন। এরপর তিনি এই বলে রওনা হন যে, ইনশাআল্লাহ তোমরা জয়ী হবে। বাস্তবেও মুসলমানরা যুদ্ধে জয়লাভ করে আর তুর্কি মহারাজ খাকান নিহত হয়।

১২৩ হিজরি সন শুরু হওয়ার পূর্বেই তুর্কিদের সমাজব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। তারা নিজেদের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়ায় তুর্কিস্তান ধ্বংসপ্রায় অবস্থায় উপনীত হয়। স্বাভাবিকভাবেই গৃহযুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত তুর্কিদের তখন মুসলমানদের প্রতি মনোযোগী হওয়ার সুযোগ ছিল না।

খ. ভারতবর্ষে বিজয়াভিযান

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে আরব বণিকগণের আসা-যাওয়া ছিল। খলিফা উমর রাযি.-এর খিলাফত আমলে সাহাবি হাকাম বিন উমায়র তাগলাবি রাযি.-এর নেতৃত্বে মুসলমানরা প্রথম সিন্ধুর মাকরান অঞ্চল জয় করে।

উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিকের শাসনামলে ৯০ হিজরি সনে সরনদ্বীপ[৬৫] থেকে একটি আরব বণিক কাফেলা ইরাকে ফেরার মনস্থ করলে সেখানে আগে থেকেই বসবাসরত একদল আরব বণিক সপরিবারে হজব্রত পালন ও ইরাকে দারুল খিলাফাহ পরিদর্শনের জন্য তাদের সঙ্গী হয়। এ ছাড়াও যেসব আরব বণিক সরণদ্বীপেই মারা গেছে, তাদের অনেকের স্ত্রী-সন্তানও কাফেলায় শরিক হয়। এ সময় তৎকালীন সরনদ্বীপের রাজা মুসলমানদের সঙ্গে সুসম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে সমকালীন উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক ও ইরাকের গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফের জন্য দাস-দাসী, মণি-মুক্তাসহ বহুমূল্য ও দুর্লভ বিভিন্ন উপহারসামগ্রী ইরাকে প্রেরণ করেন। সব মিলে আঠারোটি

---

[৬৫]. সরনদ্বীপ : বর্তমানে শ্রীলঙ্কা নামে পরিচিত দ্বীপরাষ্ট্রটিই হলো অতীতের সরনদ্বীপ। অঞ্চলটি সিলন নামেও পরিচিত ছিল।

বড় বড় জাহাজ সরনদ্বীপ থেকে ইরাক অভিমুখে রওনা হয়। পথিমধ্যে সিন্ধুর দেবল বন্দর[৬৬] অতিক্রম করার সময় কাফেলাটি একদল দস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হয়। দস্যুরা জাহাজগুলো দখল করে সব সম্পদ লুট করে নেয় এবং দাস-দাসী ও আরব নারী-পুরুষদের দেবলে নিয়ে যায়। কয়েকজন বণিক কোনোমতে পালিয়ে ইরাকে পৌঁছে হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে বিস্তারিত অবহিত করে। বিগত কয়েক বছর যাবৎ বিভিন্ন আরব বণিক কাফেলার ওপর এসব জলদস্যুর উপর্যুপরি আক্রমণ এবং সিন্ধুর রাজা কর্তৃক উমাইয়া খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদের সহায়তাদানের কারণে আগে থেকেই হাজ্জাজ রাগান্বিত ছিলেন। এবার সিন্ধুর জলদস্যুদের হাতে মুসলিম নারীদের অপহৃত হওয়ার সংবাদ শুনে তিনি ক্রোধে অধীর হয়ে যান। তবে মুসলিম নারীদের উদ্ধার করার জন্য হাজ্জাজ প্রথমে কূটনৈতিক পথ অবলম্বনের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি মাকরানে নিযুক্ত প্রশাসক মুহাম্মাদ বিন হারুনের মাধ্যমে সিন্ধুর রাজা দাহিরের কাছে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন এবং মুসলিম নারী ও আরব ব্যবসায়ীদের মুক্তি দেওয়ার এবং জাহাজগুলো ফিরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করে একটি বার্তা প্রেরণ করেন। কিন্তু সিন্ধুর ব্রাহ্মণ রাজা দাহির প্রতিনিধিদলকে কঠোর ভাষায় জানিয়ে দেন যে, তিনি এসব জলদস্যুর খোঁজখবর রাখেন না এবং তার পক্ষে তাদেরকে পাকড়াও করা সম্ভব নয়।

এরইমধ্যে হাজ্জাজ বিশ্বস্ত সূত্রে নিশ্চিত হন যে, অপহৃত আরব নারী-পুরুষগণ দেবলের কারাগারে বন্দি আছে। এর ফলে বিদ্রোহীদের সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি সিন্ধুরাজ নিজেই যে আরবদের বিরুদ্ধে জলদস্যুদের এসব অভিযানে সরাসরি জড়িত, তা-ও প্রমাণিত হয়। এরপর সিন্ধুরাজের প্রদত্ত নেতিবাচক উত্তর জানতে পেরে হাজ্জাজের ক্রোধ চরমে পৌঁছায়। সিন্ধুরাজ দাহিরের অসদুদ্দেশ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে হাজ্জাজ এবার সিন্ধু অভিমুখে অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেন।

৯০ হিজরি সনে হাজ্জাজ উবায়দুল্লাহ বিন নাবহানের নেতৃত্বে সমুদ্রপথে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। কিন্তু দাহিরের বাহিনীর হাতে সেনাপতি উবায়দুল্লাহসহ অধিকাংশ অভিযাত্রী শহিদ হলে অভিযানটি ব্যর্থ হয়। এ সংবাদ পেয়ে সামান্য হতোদ্যম না হয়ে হাজ্জাজ ৯১ হিজরি সনে বুদায়ল

---

৬৬. **দেবল :** পাকিস্তানের বৃহত্তম নগরী করাচীই তখন দেবল নামে পরিচিত ছিল।

বিন তহফা আল-বাজালির নেতৃত্বে আরেকটি বাহিনী দেবল অভিমুখে প্রেরণ করেন। মাত্র তিনশ অশ্বারোহী সৈন্যের এ বাহিনীটি ইরান হয়ে মাকরানে পৌঁছলে হাজ্জাজের নির্দেশে মাকরানের গভর্নর মুহাম্মাদ বিন হারুন আরও তিন হাজার সৈন্য সরবরাহ করেন। মুসলিম বাহিনী দেবলে পৌঁছলে সিন্ধুরাজ দাহির তার পুত্রের নেতৃত্বে হাতির পাল ও বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বিশাল এক বাহিনী মুসলমানদের মোকাবিলায় প্রেরণ করেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলতে থাকা প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সদস্যরা প্রবল বিক্রমে লড়াই করলেও দিনের শেষ ভাগে সেনাপতি বুদায়ল শহিদ হন এবং আরব বাহিনী পরাজিত হয়। জীবিত মুসলিম সৈন্যদের বন্দি করে পাঠিয়ে দেওয়া হয় দেবলের কারাগারে।

বুদায়ল বিন তহফার ন্যায় মহান ও দক্ষ একজন সেনাপতির মৃত্যু হাজ্জাজকে আরও ব্যথিত করে তোলে। তিনি এবার অপহৃতদের উদ্ধারের পাশাপাশি সিন্ধু জয় করে সেখানে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করার সংকল্প করেন। হাজ্জাজ খলিফা ওয়ালিদের কাছে বার্তা পাঠিয়ে বিস্তারিত অবহিত করেন এবং সিন্ধু অভিমুখে বৃহৎ আকারের বাহিনী প্রেরণ করে অপহৃতদের উদ্ধার, রাজা দাহিরকে উপযুক্ত শিক্ষাদান ও সিন্ধুবিজয়ের অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু দারুল খিলাফাহ থেকে বহু দূরে অবস্থিত অত্যন্ত দুর্গম ও বিস্তৃত এ অঞ্চলে অভিযান পরিচালনা করলে প্রচুর অর্থব্যয়ের পাশাপাশি বহু প্রাণহানির আশঙ্কা আছে বলে খলিফা তাতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। হাজ্জাজ আবারও বার্তা পাঠিয়ে তার সামরিক পরিকল্পনা বিস্তারিত তুলে ধরেন এবং আরব বাহিনীর বিজয়ের নিশ্চয়তা প্রদানের পাশাপাশি এ কথাও উল্লেখ করেন যে, সিন্ধু জয়ের পর অভিযান খরচের কয়েক গুণ সম্পদ ইসলামি রাষ্ট্রের কোষাগারে ফেরত আসবে। অবশেষে সর্বদিক বিবেচনা করে খলিফা সিন্ধু অভিযানের অনুমতি প্রদান করেন।

৯২ হিজরি সনে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তার চাচাতো ভাই ও জামাতা মুহাম্মাদ বিন কাসিম আস-সাকাফির নেতৃত্বে সিন্ধু অভিমুখে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। মুহাম্মাদ বিন কাসিম তখন সদ্য সতেরো বছর বয়সে উপনীত রণকুশলী এক বীর যোদ্ধা। ইরাকের প্রশাসন ও সাধারণ জনগণের আবেগপূর্ণ বিদায়ী অভিবাদনে সিক্ত হয়ে মুসলিম বাহিনী দেবল অভিমুখে রওনা হয়। সিরাজে পৌঁছে মুহাম্মাদ বিন কাসিম তার বাহিনীকে পুনঃবিন্যস্ত করেন এবং বাহিনীর একটি অংশকে নৌপথে দেবলের উদ্দেশে

পাঠিয়ে দেন। এরপর তিনি মূল বাহিনীকে নিয়ে ৯২ হিজরি সনের শেষদিকে স্থলপথে মাকরানে পৌঁছান।

এদিকে রাজা দাহির আরব বাহিনীর মাকরানে পৌঁছার সংবাদ পেয়ে সসৈন্য রাজধানী থেকে বেরিয়ে এসে মাকরানে মুসলিম বাহিনীর মোকাবিলা করার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু সিন্ধুর প্রবীণ নেতৃবৃন্দ তাকে নিজে যুদ্ধে বের হতে নিষেধ করে। তারা দাহিরকে অভয় দিয়ে বলে যে, ইতিপূর্বে যেমন রাজার অংশগ্রহণ ছাড়াই উবায়দুল্লাহ বিন নাবহান ও বুদায়ল বিন তহফার বাহিনীকে পরাজিত করা হয়েছে, এবার তেমনই দেবলের মাটিতে মুহাম্মাদ বিন কাসিমের বাহিনীকে পর্যুদস্ত করা হবে।

মুহাম্মাদ বিন কাসিম মাকরান থেকে রওনা হওয়ার পর সিন্ধু নদের পশ্চিমে অবস্থিত বিভিন্ন এলাকা জয় করে সামনে অগ্রসর হতে থাকেন। দেবলের অবস্থান ছিল সিন্ধু নদের পূর্ব পাশে। মুহাম্মাদ বিন কাসিমের নেতৃত্বাধীন স্থল বাহিনী দেবলে পৌঁছতেই নির্ধারিত সময়ে সিরাজ থেকে রওনা হওয়া অস্ত্র ও রসদবোঝাই নৌবহরও দেবলে পৌঁছে যায়। দেবলে পৌঁছেই সেনাপতি মুহাম্মাদ বিন কাসিম নগরদুর্গের চারপাশে পরিখা খনন করে সৈন্য মোতায়েন করেন। এরপর তিনি 'আরুস' নামক বিরাটাকার একটি কামানসহ বিভিন্ন কামান স্থাপন করেন। আরুস কামানটি পরিচালনা করতে পাঁচশ সৈন্যের প্রয়োজন হতো।

মুসলিম বাহিনী আক্রমণ শুরু করলে দুর্গ থেকে জনৈক ব্রাহ্মণ বের হয়ে এসে নিরাপত্তা প্রার্থনা করে। মুহাম্মাদ বিন কাসিম তাকে নিরাপত্তা প্রদান করলে সে জানায় যে, তাদের জ্যোতির্বিদদের বিশ্বাস অনুযায়ী সিন্ধু একদিন মুসলমানদের হাতে বিজিত হবে। তবে দেবল দুর্গের প্রধান মন্দিরের শীর্ষদেশে স্থাপিত সবুজ রঙের বিশেষ পতাকাটি যতদিন উড়তে থাকবে, ততদিন সিন্ধুর পতন ঘটবে না। মুহাম্মাদ বিন কাসিম তাদের এই ভ্রান্ত আকিদাকে মানসিকভাবে কাজে লাগানোর মনস্থ করেন। তিনি কামান পরিচালনাকারী বাহিনীর সেনাপতি জুউবাকে পতাকাটি ভূপাতিত করার নির্দেশ দিলে জুউবা গোলার আঘাতে মন্দিরের কোনো ক্ষতি করা ছাড়াই পতাকাটি ভূপাতিত করেন। এর ফলে দেবলবাসীর মনোবল পুরোপুরি ভেঙে পড়ে।

এরপর মুহাম্মাদ বিন কাসিম দুর্গ জয়ে মনোনিবেশ করেন। তার নির্দেশে মুসলিম বাহিনী চারদিক থেকে একযোগে দুর্গের ওপর আক্রমণ শুরু

করে। এর ফাঁকে কয়েকজন দুঃসাহসী সৈনিক দুর্গপ্রাচীরে মই স্থাপন করে প্রাচীরের ওপর উঠতে সক্ষম হন এবং ভেতরে প্রবেশ করে দুর্গের প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত করে দেন। যেহেতু এই দুর্গেই মুসলিম বণিক ও নারীদের বন্দি করে রাখা হয়েছিল, তাই হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সেনাপতি মুহাম্মাদ বিন কাসিমকে এই দুর্গের সকল সৈন্যদের হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তবে অন্য সকল নগরী জয় করার ক্ষেত্রে তিনি কঠোরভাবে কাউকে হত্যা করতে নিষেধ করেছিলেন এবং কেউ যদি আত্মসমর্পণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে, কেবল তাকেই হত্যা করার অনুমতি দিয়েছিলেন। মুসলমানরা দুর্গটি জয় করার পর দুর্গপ্রধান রাতের অন্ধকারে পালিয়ে রাজা দাহিরের কাছে চলে যায়। এরপর মুহাম্মাদ বিন কাসিম অপহৃত নারী ও বন্দি বণিকদের কারাগার থেকে মুক্ত করেন।

৯৩ হিজরি সনের রজব মাসে দেবল নগরী ও দেবল দুর্গ বিজিত হয়। দেবল জয়ের পর সেনাপতি মুহাম্মাদ বিন কাসিম যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ দামেশকে পাঠিয়ে দেন। তিনি দেবলের অভ্যন্তরে একটি জায়গা নির্দিষ্ট করে সেখানে চার হাজার আরবের বসবাসের ব্যবস্থা করেন এবং সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।

বন্দরনগরী দেবল জয় করার পর মুহাম্মাদ বিন কাসিম দেবল হতে প্রায় পঁচিশ ফরসখ দূরে অবস্থিত নেরুন নগরী জয়ের মনস্থ করেন। মুসলিম বাহিনী ছয় দিন পর নেরুনে পৌঁছে নগরীটি অবরোধ করে। নগরীর বৌদ্ধ প্রশাসক তখন অনুপস্থিত ছিলেন। এদিকে মুহাম্মাদ বিন কাসিম প্রয়োজনীয় আহারদ্রব্য ও রসদের স্বল্পতায় চিন্তিত ছিলেন। এরইমধ্যে নগরপ্রশাসক রাজধানী থেকে নেরুনে উপস্থিত হন এবং তার দূতকে প্রয়োজনীয় আহারদ্রব্যসহ মুহাম্মাদ বিন কাসিমের কাছে প্রেরণ করেন। দূত মুসলিম সেনাপতি মুহাম্মাদ বিন কাসিমকে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের স্বহস্তে লিখিত একটি পত্রও হস্তান্তর করে। পত্রে হাজ্জাজ উল্লেখ করেছিলেন যে, নেরুনের প্রশাসক ও নেরুনবাসী মুহাম্মাদ বিন কাসিম সিন্ধুতে আগমনের পূর্বেই হাজ্জাজের সঙ্গে এক গোপন চুক্তির মাধ্যমে আরবদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে। এরপর নেরুন-প্রশাসক আরব বাহিনীর জন্য নগরদ্বার উন্মুক্ত করে দেন এবং নিজে মুহাম্মাদ বিন কাসিমের কাছে উপস্থিত হয়ে দুর্লভ ও অতিমূল্যবান প্রচুর উপঢৌকন

প্রদান করেন। মুহাম্মাদ বিন কাসিম নগরীটির প্রশাসনব্যবস্থা নতুন করে বিন্যস্ত করেন, জনৈক আরবকে নগরীটির প্রশাসক নিযুক্ত করেন এবং সাবেক বৌদ্ধ প্রশাসককে নিজের রাজনৈতিক উপদেষ্টার দায়িত্ব প্রদান করেন। মুহাম্মাদ বিন কাসিম নেরুনেও একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।

এরপর মুহাম্মাদ বিন কাসিম সেওয়ান অভিমুখে অগ্রসর হন এবং অবরোধের পর নগরীটি জয় করেন। সেওয়ানের জনগণ তাদের প্রশাসককে মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করার অনুরোধ করলেও সে তা প্রত্যাখ্যান করে এবং রাতের আঁধারে পালিয়ে চলে যায়। মুহাম্মাদ বিন কাসিম সেওয়ানে প্রবেশ করে সেখানেও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে আরবদের নিয়োগ দেন। সেওয়ান অভিযান চলাকালে সেখানকার কিছু অধিবাসী মুসলিম অভিযাত্রীদের নামাজের বিনম্রতা প্রত্যক্ষ করে ইসলাম গ্রহণ করে।

এরপর মুহাম্মাদ বিন কাসিম বোদিহা অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হন। সংবাদ পেয়ে বোদিহার প্রশাসক কাকা রাতের আঁধারে মুসলিম শিবিরের ওপর হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু তার প্রেরিত সৈন্যরা রাতের অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফেলে। সারা রাত বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় ঘোরার পর সকালে তারা ফিরে গিয়ে প্রশাসক কাকাকে বিস্তারিত অবহিত করে। তখন কাকা তার সেনাপতিদের নিয়ে মুসলিম শিবিরে আগমন করেন এবং মুহাম্মাদ বিন কাসিমের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। এরপর মুহাম্মাদ বিন কাসিম কাকার সহায়তায় একটি ক্ষুদ্র বাহিনী পাঠিয়ে এ অঞ্চলের বিদ্রোহীদের দমন করেন। মুহাম্মাদ বিন কাসিম এখানেও কয়েকটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন এবং আরব বসতি স্থাপন করেন।

বোদিহা জয়ের পর মুহাম্মাদ বিন কাসিম নেরুনে ফিরে আসেন এবং সেখান থেকে আশবাহার অভিমুখে অগ্রসর হন। কয়েকদিন অবরোধ করে রাখার পর আশবাহারবাসী আত্মসমর্পণ করলে মুহাম্মাদ বিন কাসিম তাদেরকে নিরাপত্তাদান করেন। এরপর তিনি সামনে অগ্রসর হয়ে সিন্ধু নদের পশ্চিম তীরে পৌঁছান। নদের পূর্ব প্রান্তে রাওয়ার এলাকায় রাজা দাহিরের বাহিনী অবস্থান করছিল। মুহাম্মাদ বিন কাসিম নদ পার হওয়ার পূর্বে কয়েকটি ক্ষুদ্র বাহিনী গঠন করে তাদেরকে আশেপাশের বিভিন্ন এলাকায় মোতায়েন করে মুসলিম বাহিনীর পৃষ্ঠদেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। এরপর তিনি সঙ্গে করে নিয়ে আসা কাঠের তক্তা দিয়ে দ্রুত

একটি অস্থায়ী সেতু তৈরি করেন। মুসলিম বাহিনী এই অস্থায়ী সেতু ব্যবহার করে সিন্ধু নদ পার হয়। মুসলিম বাহিনীর নৌবহর আগে থেকেই বিভিন্ন স্থানে অবস্থান নিয়ে স্থলবাহিনীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করছিল। নদ পাড়ি দিয়েই আরব সৈন্যগণ প্রতিপক্ষের ওপর তিরবর্ষণ শুরু করে। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর দাহিরের বাহিনী পরাজিত হয় এবং বেঁচে যাওয়া সৈন্যরা কোনোমতে পালিয়ে রাজার কাছে পৌঁছায়।

মুহাম্মাদ বিন কাসিম সিন্ধু নদ পাড়ি দিয়ে পশ্চিম প্রান্তে চলে আসায় এবং রাজধানীর আশেপাশের বিভিন্ন নগরীতে একে একে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করায় রাজা দাহির প্রচণ্ড উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তিনি এবার সিন্ধুতে আশ্রয়গ্রহণকারী বিদ্রোহী আরবদের সর্দার মুহাম্মাদ বিন হারিস আল-আলাফিকে মুসলিম বাহিনীর মোকাবিলা করার অনুরোধ করেন। কিন্তু সম্মুখ সমরে মুহাম্মাদ বিন হারিসও পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। এরপর দাহির তার পুত্র জয়সিংহের নেতৃত্বে একটি বিরাট বাহিনী প্রেরণ করলে তারাও পরাজিত হয়। এরপর মুহাম্মাদ বিন কাসিম তার বাহিনী নিয়ে আরও অগ্রসর হয়ে জয়পুরে শিবির স্থাপন করেন। কাছেই রাজা দাহিরও শিবির স্থাপন করেছিলেন।

শুরু হয় উভয় পক্ষের চূড়ান্ত লড়াই। প্রথম দিন দু-পক্ষের বিভিন্ন ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ চলতে থাকে। পরদিন শুরু হয় আসল যুদ্ধ। রাজা দাহির একশ হাতিসহ পাঁচ হাজার রাজপুতদের একটি বিশেষ বাহিনী, দশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য, ত্রিশ হাজার পদাতিক সৈন্য ও অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবী সৈন্য নিয়ে মুসলিম বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। রাজা নিজে লৌহবর্ম পরিধান করে একটি বিশালাকার সাদা হাতিতে আরোহণ করেছিলেন এবং তার সঙ্গে দুজন ভৃত্য ছিল। ভৃত্যরা তাকে তির সরবরাহ করছিল।

৯৩ হিজরি সনের ৯ রমজান (৭১২ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ জুন) উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়। প্রথমদিকে প্রতিপক্ষের হাতিগুলোর কারণে মুসলিম বাহিনী প্রচণ্ড দুর্ভোগের সম্মুখীন হয় এবং কয়েকজন সেনাপতি ও সুদক্ষ যোদ্ধা শহিদ হয়ে যান। এরপর মুসলমান যোদ্ধারা প্রচণ্ড বিক্রমে লড়াই করে প্রতিপক্ষের নয়টি হাতি হত্যা করতে সক্ষম হয়। প্রথম দিন যুদ্ধের ফলাফল ছিল উভয় পক্ষে দোদুল্যমান।

দ্বিতীয় দিন ১০ রমজান উভয় পক্ষ নতুন করে যুদ্ধ শুরু করে। একদিকে লক্ষাধিক পৌত্তলিক সৈন্য, আরেকদিকে এক আল্লাহয় বিশ্বাসী হাজার দশেক সৈন্য। যুদ্ধ শুরুর পূর্বে মুহাম্মাদ বিন কাসিম সকলকে যুদ্ধক্ষেত্রে অটল-অবিচল থাকার উপদেশ দেন এবং সর্বক্ষণ আল্লাহকে স্মরণ করতে বলেন। যুদ্ধ শুরু হতেই মুসলিম বাহিনী প্রতিপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুসলিম বাহিনীর কামান থেকে বর্ষিত গোলায় প্রতিপক্ষের হাতিগুলো প্রচণ্ডরকম ভীত হয়ে পড়ে এবং হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে শুরু করে। যুদ্ধের একপর্যায়ে মুসলিম বাহিনী সাময়িক পিছু হটলেও মুহাম্মাদ বিন কাসিম উচ্চৈঃস্বরে সকলকে আহ্বান করে প্রতিপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। অবশেষে আল্লাহ তাআলা মুসলিম বাহিনীকে বিজয় দান করেন। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতেই মুহাম্মাদ বিন কাসিমের নির্দেশে তিরন্দাজ বাহিনী দাহিরের হাতি লক্ষ্য করে অগ্নিশর নিক্ষেপ করলে হাতির হাওদায় আগুন লেগে যায়। দাহির পালাতে উদ্যত হলে মুসলিম বাহিনী তার পশ্চাদ্ধাবন করে এবং তিরবৃষ্টি শুরু করে। এরইমধ্যে আমর বিন খালিদ আল-কিলাবি নামক জনৈক মুসলিম সৈন্য দাহিরকে হত্যা করেন।

এরপর মুহাম্মাদ বিন কাসিমের বাহিনী একে একে রাজধানী আরোর, বাহরুর, দলিলা ও ব্রাহ্মণাবাদসহ সিন্ধু অঞ্চলের অন্যান্য নগরীও জয় করে। সিন্ধু বিজয় শেষে মুহাম্মাদ বিন কাসিম তার বাহিনী নিয়ে পার্শ্ববর্তী পাঞ্জাব রাজ্যের রাজধানী মুলতানের দিকে অগ্রসর হয়ে মুলতানও জয় করেন। এরপর তিনি কির্জ জয় করেন এবং কনৌজ জয়ের লক্ষ্যে অগ্রসর হন। এরই মধ্যে দামেশক থেকে নতুন খলিফা সুলায়মান বিন আবদুল মালিক বার্তা পাঠিয়ে মুহাম্মাদ বিন কাসিমকে বরখাস্ত করেন এবং ইরাকে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেন। মুহাম্মাদ বিন কাসিমের অপসারণের মধ্য দিয়ে সিন্ধুতে বিজয়াভিযান স্থগিত হয়ে যায়।

মুহাম্মাদ বিন কাসিম মাত্র বারো হাজার সৈন্য নিয়ে সিন্ধুতে পৌঁছেছিলেন। এরপর অভিযান চলাকালে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ আরও চার হাজার সৈন্য প্রেরণ করেন। এই সীমিত সামরিক শক্তি নিয়েই তিনি সিন্ধুর বিস্তীর্ণ এলাকা জয় করতে সক্ষম হন। এর পেছনে যেমন তার রণকুশলতা ও সামরিক দক্ষতা বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল, তেমনই সিন্ধুবাসীর সঙ্গে মুসলিম অভিযাত্রীদের অনুপম উদার আচরণও বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। মুলতান অভিযানের সময় আরব বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় পঞ্চাশ

হাজার। অর্থাৎ সিন্ধুর অনেক নাগরিক এ অভিযানে মুসলিম বাহিনীর পক্ষে যুদ্ধ করেছিল। নিঃসন্দেহে এটি ইসলামের অনন্যসাধারণ চারিত্রিক উদারতার এক অনন্য অবদান।

খলিফা ওয়ালিদের মৃত্যুর পর খলিফা সুলায়মান বিন আবদুল মালিক, উমর বিন আবদুল আজিজ ও ইয়াযিদ বিন আবদুল মালিকের শাসনামলে এ অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য কোনো তৎপরতা পরিচালিত হয়নি। ১০৫ হিজরি সনে হিশাম বিন আবদুল মালিক খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর নতুন করে সিন্ধু অঞ্চলে বিজয়াভিযান শুরু হয়। ১০৭ হিজরি সনে জুনায়দ বিন আবদুর রহমানের নেতৃত্বে একটি বাহিনী সিন্ধুতে অভিযান পরিচালনা করে। মুহাম্মাদ বিন কাসিমের প্রস্থানের পর যেসব অঞ্চল বিদ্রোহ করেছিল, তিনি একে একে সেগুলো পুনরায় জয় করেন। এরপর তিনি পার্শ্ববর্তী ভারতবর্ষের উত্তর গুজরাটের বিভিন্ন নগরীও জয় করেন। ১১১ হিজরি সনে সেনাপতি জুনায়দ বিন আবদুর রহমান সিন্ধু অঞ্চল ত্যাগ করলে আবারও সিন্ধু অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে। আরবরা সিন্ধুবাসীর সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে, নিজেরাও অন্তর্দ্বন্দ্বের শিকার হয়। ১১২ হিজরি সনে হাকাম বিন আওয়ানা আল-কালবি সিন্ধুর গভর্নর নিযুক্ত হওয়ার পর এ অঞ্চলে পুনরায় শান্তি ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন।

ঐতিহাসিক ইবনে কাছিরের চোখে খিলাফতে বনু উমাইয়া

আমরা বনু উমাইয়ার শাসনামলে পরিচালিত বিজয়াভিযান সংক্রান্ত এই পরিচ্ছেদের ইতি টানছি বিখ্যাত ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনে কাছির রহ.-এর কৃত পর্যালোচনা উল্লেখ করার মাধ্যমে। তিনি লিখেছেন—

উমাইয়া রাজপরিবারের সদস্যদের মধ্যে জিহাদের প্রেরণা সর্বদা উজ্জীবিত ছিল। তাদের যেন জিহাদ ছাড়া অন্য কোনো ব্যস্ততাই ছিল না। তাদের শাসনামলে পৃথিবীর পুবে-পশ্চিমে, জলে-স্থলে সর্বত্র ইসলামের কালিমা সমুন্নত হয়। তারা কুফর ও কুফরি শক্তিকে পর্যুদস্ত করেছেন। উমাইয়া শাসনামলে কাফির-মুশরিকদের অন্তরাত্মা মুসলিম জাতির প্রভাব-ভীতিতে প্রকম্পিত থাকত। মুসলিম অভিযাত্রীগণ যে অঞ্চলেই অভিযান পরিচালনা করত, তা-ই জয় করত। প্রতিটি অভিযাত্রীদলে থাকত মহান বুজুর্গ, বিদগ্ধ আলিম ও বিশিষ্ট তাবেয়িগণ। প্রতিটি বাহিনীতেই মহান ব্যক্তিবর্গের এমন একটি জামাত থাকত, যাদের ওসিলায় আল্লাহ তার দ্বীনকে বিজয় দান করতেন।

কুতায়বা বিন মুসলিম তুর্কিস্তানের বিভিন্ন নগরী জয় করেন। তিনি শত্রুসেনাদের হত্যা করেন, বন্দি করেন এবং গনিমত অর্জন করেন। তিনি চীনের সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে যান এবং চীনের সম্রাটকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে বার্তা প্রেরণ করেন। তার বার্তা পেয়ে ভীত চীনা সম্রাট উপঢৌকন হিসেবে প্রচুর সম্পদ প্রেরণ করেন এবং জনবলের প্রাচুর্য সত্ত্বেও মুসলিম বাহিনীর উদারতা লাভের আশায় দূত প্রেরণ করেন। সে অঞ্চলের সকল রাজন্যবর্গ কুতায়বার প্রভাবে সন্ত্রস্ত থেকে নিয়মিত খারাজ প্রদান করত। যদি হাজ্জাজ বেঁচে থাকতেন, তাহলে চীন হতে সৈন্য প্রত্যাহার করা হতো না, কুতায়বাও অবশ্যই চীনা সম্রাটের মোকাবিলা করতেন। হাজ্জাজের মৃত্যুর কারণে মুসলিম বাহিনী চীনে অভিযান পরিচালনা না করেই প্রত্যাবর্তন করে। পরবর্তীকালে কুতায়বা মুসলমানদের হাতেই নিহত হন।

অপরদিকে আমিরুল মুমিনিন ওয়ালিদের ভাই মাসলামা বিন আবদুল মালিক বিন মারওয়ান, অন্য আরেক ভাই ও খলিফার পুত্র রোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল জয় করতে থাকেন। তারা রোমান সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে কনস্টান্টিনোপল পর্যন্ত পৌঁছে যান। মাসলামা সেখানে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করার জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। ফ্রাঙ্কদের অন্তরাত্মা মুসলিম অভিযাত্রীদের ভয়ে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে।

হাজ্জাজের ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মাদ বিন কাসিম তখন ইরাকি সৈন্য ও অন্যান্য আরও কিছু সৈন্য নিয়ে ভারতবর্ষে অভিযান পরিচালনা করছিলেন এবং বিভিন্ন নগরী জয় করছিলেন। মুসা বিন নুসায়র মিশরীয় সৈন্য ও অন্যান্য সৈন্যদের নিয়ে মাগরিবে অভিযান পরিচালনা করছিলেন এবং মাগরিবের বিভিন্ন নগরী ও এলাকা জয় করছিলেন।

এসব অঞ্চলের অধিবাসীগণ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং প্রতিমাপূজা ছেড়ে এক আল্লাহর উপাসনা শুরু করে।[৬৭]

---

৬৭. ইবনে কাছির দিমাশকি, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৯/৮৩-৮৪।

খিলাফতে বনু উমাইয়া সম্পর্কে

ড. রাগিব সারজানির পর্যালোচনা[৬৮]

অন্যান্য ইসলামি সালতানাতের ন্যায় উমাইয়া সালতানাতেরও (৪১-১৩২ হিজরি/৬৬১-৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ) পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডের মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর প্রভূত অনুগ্রহ ও বিরাট অবদান রয়েছে। আমরা যদি উমাইয়া শাসনামলে যে পরিমাণ মানুষ ইসলামের পতাকাতলে আশ্রয় নিয়েছে কেবল তাদের সংখ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তাহলে শুধু এতটুকুই বনু উমাইয়ার প্রতি আরোপিত বিভিন্ন মিথ্যা অপবাদ ও অভিযোগ খণ্ডনের জন্য যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে। বনু উমাইয়ার শাসনামলেই লিবিয়া থেকে শুরু করে মরক্কো পর্যন্ত পুরো উত্তর আফ্রিকা ইসলামের ছায়াতলে শামিল হয়েছিল। যদিও এসব অঞ্চলে ইসলামি বিজয়াভিযানের ধারা তৃতীয় খলিফা হজরত উসমান বিন আফফান রাযি.-এর যুগেই সূচিত হয়েছিল; কিন্তু পরবর্তী সময়ে এখানকার অধিবাসীরা ধর্মত্যাগ করেছিল। এরপর উমাইয়া শাসনামলে নতুন করে এসব অঞ্চল বিজিত হয়।

উমাইয়া শাসকবৃন্দ একইসঙ্গে আরবের চতুর্দিকে ইসলামের বিজয়াভিযান অব্যাহত রেখেছিলেন। পশ্চিমে তাদের অভিযান আন্দালুস পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। পূর্ব দিকে মুহাম্মদ বিন কাসিম আস-সাকাফির হাতে বিজিত হয়েছিল সিন্ধু অঞ্চল, কুতায়বা বিন মুসলিম আল-বাহিলির হাতে বিজিত হয়েছিল ট্রান্সঅক্সিয়ানা (মধ্য এশিয়া) অঞ্চল; তার বিজয়াভিযান বিস্তৃত হয়েছিল সুদূর চীন পর্যন্ত, আর মাসলামা বিন আবদুল মালিক আল-মারওয়ানির হাতে বিজিত হয়েছিল উত্তরের বিস্তীর্ণ ককেশাস অঞ্চল।

মানুষ দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করেছিল। পৃথিবীর সেসব ভূখণ্ডেও ইসলামের সূর্য উদ্ভাসিত হয়েছিল, যেখানকার অধিবাসীগণ হাতেগড়া নিষ্প্রাণ মূর্তি-প্রতিমা, আগুন ও রাজন্যবর্গের পূজা করত। ইসলামের আগমনে এসব ভূখণ্ড থেকে নিশ্চিহ্ন হয়েছিল অসংখ্য ভ্রান্ত বিশ্বাস ও কুসংস্কার। আল্লাহর অনুগ্রহে বনু উমাইয়ার মাধ্যমে মানুষ প্রত্যক্ষ করেছিল

---

৬৮. 'খিলাফতে বনু উমাইয়া সম্পর্কে ড. রাগিব সারজানির পর্যালোচনা' শিরোনামের আলোচনাটি অনুবাদক কর্তৃক *'আন্দালুসের ইতিহাস'* গ্রন্থ থেকে সংযোজন করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলার সুস্পষ্ট অনুগ্রহ-কিরণ। এ কারণেই তারা ব্যক্তিগতভাবে ও দলে দলে ইসলামের প্রতি অগ্রসর হয়েছিল। অব্যবহিত পরে তারাই শামিল হয়েছিল ইসলামের সাহসী সৈনিক, বিদগ্ধ আলিম ও দূরদর্শী নেতাদের দলে; অনন্যসাধারণ অবদান রেখেছিল ইসলামের খেদমতের বিস্তৃত অঙ্গনে। বনু উমাইয়া যে চারা রোপণ করেছিল, মুসলিম উম্মাহ তার সুদীর্ঘ ইতিহাসজুড়ে তারই ফল ও ফসল সংগ্রহ করে ধন্য হয়েছে। ফিকহ ও তাফসির, সাহিত্য ও চিকিৎসাবিজ্ঞান, ভূগোল ও প্রকৌশলবিদ্যা, রসায়ন ও দর্শনশাস্ত্র—মোটকথা, জ্ঞানচর্চার বিস্তৃত সব অঙ্গনে যুগে যুগে যারা ছিলেন নেতৃত্বের আসনে, তারা প্রায় সবাই উমাইয়া শাসনামলে বিজিত অঞ্চলসমূহের আলো-বাতাসেই বড় হয়েছেন, বিদ্যা ও জ্ঞানে পরিশীলিত হয়েছেন। হাদিসশাস্ত্রের মহান সেবক বুখারি, মুসলিম, তিরমিজি, নাসায়ি; ইতিহাস ও রিজাল-শাস্ত্রের পথিকৃৎ তাবারি, ইবনে খালদুন, যাহাবি; কিংবা চিকিৎসাশাস্ত্রের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ইবনে সিনা, ফারাবি, আল-কিন্দি ও আল-বিরুনি; সে এক দীর্ঘ তালিকা, যা গুনে শেষ করা যাবে না!

ইসলামি বিজয়াভিযানে প্রথমে বিজিত হয়েছে দেশ, এরপর বিজিত হয়েছে নাগরিকদের অন্তঃদেশ। এভাবে একের পর এক অঞ্চলের আবাসভূমি ও হৃদয়ভূমি বিজিত হয়েছে উমাইয়া শাসনামলে আর সূচিত হয়েছে কালান্তরব্যাপী বিস্তৃত সেবার এক অনন্য ধারা।

উমাইয়া আমলে বিজয়াভিযান ও আল্লাহর পথে লড়াই ছিল মুসলমানদের সহজাত আকর্ষণের বিষয়। মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে দলে দলে রণ-কাফেলায় শরিক হতো আপন প্রতিপালকের সন্তুষ্টি অর্জনের প্রত্যাশায় এবং 'রাব্বুল আলামিনের' দাওয়াত পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে। অধিকন্তু উমাইয়া শাসনামলেই ইসলামি শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস সুন্নাতে নববি সংকলিত হয় এবং উমাইয়া শাসনভুক্ত অঞ্চলে ইসলামি আইনব্যবস্থা কার্যকর করা হয়।

সুবিখ্যাত আলিম ইমাম ইবনে হায্‌ম রহ. উমাইয়া শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে সুস্পষ্ট মন্তব্য করেছেন। বনু উমাইয়ার শাসনব্যবস্থার চিত্র তুলে ধরে তিনি বলেছেন—

> উমাইয়া শাসনামলে মুসলিম সাম্রাজ্য ছিল একটি নির্ভেজাল আরব রাষ্ট্র। উমাইয়া শাসকবৃন্দ নিজেদের জন্য কোনো রাজকীয় নগরীর

পত্তন করতেন না, বিলাসী জীবনযাপনের জন্য রাজপ্রাসাদ নির্মাণ বা সম্পদ কুক্ষিগতকরণে ঝাঁপিয়ে পড়তেন না। খিলাফতলাভের পূর্বে তারা যে বাড়িতে বাস করতেন, পরবর্তী সময়েও তারা সেখানেই বসবাস করতেন। আপন প্রজাদেরকে তারা 'হে আমার মাওলা', 'হে সায়্যিদ' ইত্যাদি সম্বোধন ব্যবহার করতে দিতেন না। তারা অধীনস্থদের তুচ্ছতাপ্রকাশক শব্দে আহ্বান করতেন না। তাদের বার্তার সূচনা এভাবে হতো না—'খলিফার পক্ষ হতে দাসের প্রতি'। সম্মানপ্রদর্শনের উদ্দেশ্যে হস্তদ্বয়ে, পদযুগলে বা সম্মুখভূমিতে চুম্বনের কোনো রীতি তাদের দরবারে প্রচলিত ছিল না। শাসনভূমির বিভিন্ন অংশে আমির-প্রশাসক নিয়োগ-বিয়োগের ক্ষেত্রে তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকত সঠিক ও নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্য প্রতিষ্ঠিত থাকা। এ কারণেই তারা আন্দালুস, সিন্ধু, খোরাসান, আর্মেনিয়া, ইয়ামেনসহ বিভিন্ন অঞ্চলে কখনো কখনো এক প্রশাসককে বরখাস্ত করে অন্য একজনকে দায়িত্ব প্রদান করেছেন, প্রয়োজনে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেছেন এবং তাদের দৃষ্টিতে উপযুক্ত ব্যক্তিকে দায়িত্ব দিয়েছেন। তৎকালে পৃথিবীর যে বিস্তৃত অঞ্চল তারা শাসন করেছেন, অন্য কোনো শাসকগোষ্ঠী তা পারেনি। একপর্যায়ে কালের পরিক্রমায় আব্বাসিরা মুসলিম প্রাচ্যে তাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে এবং রাষ্ট্রক্ষমতা বনু উমাইয়ার হস্তচ্যুত হয়। ...[৬৯]

এতৎসত্ত্বেও আমরা এ দাবি করছি না যে, উমাইয়া শাসকগণ যাবতীয় ভুলত্রুটি হতে মুক্ত ছিলেন। ভুলত্রুটি ও অপূর্ণতা তো মানবিক বৈশিষ্ট্যেরই অংশ। এ কথা নিঃসন্দেহে সত্য যে, বনু উমাইয়ার শাসন-ইতিহাসে অনেক ভুলত্রুটি রয়েছে; তদ্রূপ এ কথাও সত্য যে, মুসলিম উম্মাহর প্রতি উমাইয়া সালতানাতের যে অনুগ্রহ-অবদান, তা বিবেচনা করলে সেসব ভুলত্রুটিকে উপেক্ষা করা যায়; বরং তা ধুয়ে মুছে যায়। বনু উমাইয়ার শাসনামল ৪১ হিজরি থেকে ১৩২ হিজরি (৬৬১-৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত বিরানব্বই বছর স্থায়ী ছিল। উমাইয়া সালতানাতের প্রথম খলিফা ছিলেন বিশিষ্ট সাহাবি হজরত মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান রাযি.। মুয়াবিয়া রাযি.

---

৬৯. ইবনে হায্ম, *রাসাইলু ইবনি হায্ম*, ২/১৪৬।

সেই সুমহান সাহাবি, যিনি অনেক সমালোচকের বচন-আঘাত ও কলম-আঁচড় থেকে নিষ্কৃতি পাননি। তারা তার জীবনেতিহাস ও খিলাফত নিয়ে মিথ্যাচার করেছে, আরোপ করেছে নানা অপবাদ। হায়! ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য এ মহান সাহাবি যে অনন্যসাধারণ খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন, তার প্রতি অপবাদ আরোপের পূর্বে আমরা যদি তার এক-দশমাংশও আঞ্জাম দিতে পারতাম! ....

হজরত মুয়াবিয়া রাযি.-এর পর একের পর এক অন্যান্য উমাইয়া শাসক রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধতম ছিলেন আবদুল মালিক বিন মারওয়ান ও তার পরবর্তী বংশধরগণ; যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ওয়ালিদ, সুলায়মান, ২য় ইয়াযিদ ও হিশাম। এদের মাঝেই অতিক্রান্ত হয়েছেন সুমহান খলিফা উমর বিন আবদুল আজিজ রহ.। তিনিও সেই বনু উমাইয়ারই সন্তান, একশ্রেণির সমালোচক যাদের সমালোচনায় সদা মুখর। তিনিই সেই মহান খলিফা, যার শাসনামলে পৃথিবী লাভ করেছিল ন্যায় ও দয়া, নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির দিশা। তাই তো ঐতিহাসিকগণ তাকে খোলাফায়ে রাশিদিনের 'পঞ্চম সদস্য' বলে গণ্য করেছেন।

উমাইয়া সালতানাতের ইতিহাসে মন্দ যা কিছু, তা মূলত ছড়িয়ে আছে তাদের শেষ সাত বছরের ইতিহাসে। এ সাত বছরের ইতিহাস বিভিন্ন ট্র্যাজেডি এবং ইসলামি মানহাজ হতে বিচ্যুতির নানা ধরনের ঘটনা-দুর্ঘটনায় ভরপুর। কুদরতের নিয়ম মেনেই তখন 'সুন্নাতুল্লাহ' কার্যকর হয়, উমাইয়া সালতানাতের পতন ঘটে আর বনু আব্বাসের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।[৭০]

---

৭০. ড. রাগিব সারজানি, *আন্দালুসের ইতিহাস*, ১/৫২-৫৬।

শিয়া সম্প্রদায়ের পরিচিতি

সামনে ইতিহাসের ধারাবর্ণনায় প্রাসঙ্গিকভাবে বিভিন্ন শিয়া গোষ্ঠীর আলোচনা আসবে বিধায় পরবর্তী অধ্যায় শুরু করার পূর্বে এখানে সংক্ষেপে শিয়া সম্প্রদায় ও তাদের বিভিন্ন দল-উপদলের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হচ্ছে।[৭১]

উৎপত্তি ও বিকাশ

এটি একটি ঐতিহাসিক বাস্তবতা যে, ইসলামের সূচনালগ্ন থেকেই ইহুদি জাতি ইসলাম ও মুসলমানদের চরম শত্রু হিসেবে আবির্ভূত হয়। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায়ই ইহুদিদের হঠকারিতাপূর্ণ বিভিন্ন আচরণের কারণে তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযান পরিচালিত হয় এবং ইহুদিদেরকে মদিনা থেকে নির্বাসিত করা হয়। খন্দকের যুদ্ধে পুরো আরব উপদ্বীপকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে একজোট করার পেছনেও ছিল ইহুদি-প্ররোচনা। নবীজির ইন্তেকালের পরও অব্যাহত থাকে ইহুদিদের ষড়যন্ত্র প্রচেষ্টা।

গবেষক ঐতিহাসিকগণের মতে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর রাযি.-এর শাহাদাতের ঘটনা কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনা বা ব্যক্তি-আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ ছিল না; বরং এ ঘটনা ছিল ইসলামের বিরুদ্ধে ইহুদিদের চলমান গোপন ও সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র এবং সুবিন্যস্ত চক্রান্তের ফসল। তৃতীয় খলিফা উসমান রাযি.-এর খিলাফতের শেষদিকে এই দুষ্কৃতকারী দলটির আহ্বায়করা প্রকাশ্য-কার্যক্রম শুরু করে এবং খলিফা উসমান রাযি. ও তার গভর্নরদের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা ও কুৎসা রটনার মাধ্যমে ইসলামি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করতে সচেষ্ট

---

৭১. 'শিয়া সম্প্রদায়ের পরিচিতি' শিরোনামের পরিশিষ্টটি অনুবাদক কর্তৃক সংযোজন করা হয়েছে। শিয়া গোষ্ঠী সম্পর্কে আরও জানতে পাঠ করতে পারেন মাকতাবাতুল হাসান থেকে প্রকাশিতব্য ড. রাগিব সারজানির '*শিয়া*'।

হয়। এরই ধারাবাহিকতায় উম্মাহর সর্বস্বীকৃত খলিফা হজরত উসমান রাযি.-কে নির্মমভাবে শহিদ করা হয়। এই ষড়যন্ত্রের মূল উদ্যোক্তা ও প্রথম সারির নেতা ছিল আবদুল্লাহ বিন সাবা। জাতে ইহুদি এই লোকটি আপন মিশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দিত।

ইসলামের শত্রুদের উপলব্ধি ছিল, ইসলাম ও মুসলমানদের উন্নতি ও সমৃদ্ধির মূল উৎস হচ্ছে বিশ্বাসগত অভিন্নতা এবং নীতি ও আদর্শের প্রশ্নে ঐক্য ও অবিচ্ছিন্নতা। তাই আবদুল্লাহ বিন সাবা ও তার অনুসারীগণ এই শক্তিমূলে আঘাত হেনে ইসলামের ক্ষতিসাধনে তৎপর হয়। তাদের লক্ষ্য ছিল মিথ্যা ও ভ্রান্ত আকিদার প্রচার, জাল ও বানোয়াট হাদিস তৈরি এবং সাধারণ জনগণকে খলিফাতুল মুসলিমিন ও গভর্নরদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলে ইসলামের রুহ ও প্রাণশক্তি নিঃশেষ করে ফেলা এবং মুসলিম উম্মাহকে অনিঃশেষ বিবাদবিসংবাদের জালে আটকে ফেলা।

যেসব লোকজন নিজেদের বিভিন্ন স্বার্থহানির কারণে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর প্রতি চরম বিদ্বেষ পোষণ করত, তারা এ আন্দোলনকে লুফে নেয় এবং আবদুল্লাহ বিন সাবার দলে যোগ দেয়। নিষ্ঠাবান কিছু মুসলমানও তাদের প্রোপাগান্ডায় প্রবঞ্চিত হয়ে একসময় সাবায়ি চক্রের সঙ্গী হয়। তারপরও হজরত উসমান রাযি.-এর ইন্তেকাল পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ আকিদাগত বিষয়ে এক ও ঐক্যবদ্ধ ছিল।

চতুর্থ খলিফা হজরত আলি রাযি.-এর খিলাফতকালে মুসলমানদের অন্তর্বিরোধের সময় উম্মাহ দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক দল হজরত আলি রাযি.-এর পক্ষাবলম্বন করে, অপর দল উসমান হত্যার বিচারের দাবিতে মুয়াবিয়া রাযি.-এর পক্ষাবলম্বন করে। প্রথম দল পরিচিত হয় 'শিআনে আলি' বা আলির দল নামে, আর দ্বিতীয় দল 'শিআনে উসমান' বা উসমানের দল নামে। এই শিআনে আলি নামটিই কালের পরিক্রমায় সংক্ষেপে শিয়া নামে পরিচিত হতে থাকে। যেহেতু তখনও পর্যন্ত উভয় দলের উদ্দেশ্য ছিল নির্দোষ ও নিষ্ঠাপূর্ণ, তাই এই মতবিরোধ সত্ত্বেও উভয় দলকেই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা হয়।

হজরত আলি রাযি.-এর প্রতি হৃদ্যতা পোষণকারী দলটির মাঝে ধীরে ধীরে আকিদাগত নানা ধরনের প্রান্তিকতা সৃষ্টি হতে থাকে। প্রথমে এই দাবি তোলা হয় যে, নবীজির নিকটাত্মীয় হিসেবে আলি রাযি.-ই অন্য

সবার আগে খলিফা হওয়ার অধিক উপযুক্ত ছিলেন।[৭২] এরপর পর্যায়ক্রমে আলি রাযি.-কে নবীজির সরাসরি খলিফা দাবি করা, প্রথম তিন খলিফাকে অন্যায়ভাবে ক্ষমতাদখলকারী দাবি করা, আলি রাযি.-কে নবীজির অসিয়তের অধিকারী দাবি করা, আলি রাযি.-কে নবুওয়তের উপযুক্ত দাবি করা, নবীর ন্যায় নিষ্পাপ ও অনুসরণীয় দাবি করা, নবীদের তুলনায় মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ দাবি করা, ইলাহ পর্যায়ের দাবি করা, আল্লাহর ন্যায় অদৃশ্যের জ্ঞানী ও সৃষ্টিজগৎ পরিচালনার ক্ষমতাসম্পন্ন দাবি করা ইত্যাদি চরম গর্হিত আকিদাগত বিচ্যুতি এই দলটির মাধ্যমে উম্মতের মাঝে বিস্তার লাভ করতে থাকে।

উপরের আলোচনায় এ বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, শিয়া মতবাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাসের সঙ্গে প্রচলিত বিকৃত খ্রিষ্টবাদের উৎপত্তি ও বিকাশের আশ্চর্যরকম সাদৃশ্য রয়েছে। খ্রিষ্টধর্মে বিকৃতির সূচনা হয়েছিল প্রচণ্ড খ্রিষ্টান বিদ্বেষী ইহুদি সেন্ট পলের মাধ্যমে। সে বাহ্যিকভাবে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে খ্রিষ্টধর্মে ত্রিত্ববাদের অনুপ্রবেশ ঘটায় এবং কালের পরিক্রমায় একত্ববাদের পরিবর্তে বিকৃত ত্রিত্ববাদই খ্রিষ্টধর্মের মৌলিক আকিদা বিবেচিত হতে থাকে।

বর্তমানে পারিভাষিক অর্থে শিয়া তাদেরকে বলা হয়, যারা হজরত আলি রাযি. ও নবীপরিবারের প্রতি হৃদ্যতার দাবিপূর্বক হজরত আলি রাযি.-কে প্রথম তিন খলিফা হজরত আবু বকর রাযি., হজরত উমর রাযি. ও হজরত উসমান রাযি.-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে এবং এই শ্রেষ্ঠত্বের দাবিতে আলিবংশের পর্যায়ক্রমিক ইমামতসহ বিশুদ্ধ ইসলামি আকিদাবিরোধী বিভিন্ন বিশ্বাস পোষণ করে।

---

৭২. এই দাবি ও দৃষ্টিভঙ্গি আপাতদৃষ্টিতে সরল ও নির্দোষ হলেও তা ছিল ইসলামি শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধী। কারণ, ইসলামের দৃষ্টিতে বংশপরিচয় নয়, তাকওয়াই শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি। অধিকন্তু পৃথিবীতে ইসলামের আগমন ছিল বংশগত বিভেদ-বিভাজনের মূলোৎপাটনের উদ্দেশ্যে।

শিয়াদের দল-উপদল

উৎপত্তিকালের বিবেচনায় শিআনে আলিকে মৌলিক চারটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

১. নিষ্ঠাবান শিআনে আলি। এ দলের উৎপত্তি ৩৭ হিজরি সনে। যারা প্রথমদিকে হজরত আলি রাযি.-এর পক্ষাবলম্বন করেছিল, তারা এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। এ দলে অনেক সাহাবিও ছিলেন। সিফফিনের যুদ্ধে প্রায় আটশ সাহাবি হজরত আলি রাযি.-এর পক্ষে যুদ্ধ করেন। তারা নিজেদেরকে 'শিআনে আলি' দাবি করতেন। সালাফ ও পূর্বসূরিদের মধ্যে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর অন্তর্ভুক্ত কারও ক্ষেত্রে ইতিহাসগ্রন্থসমূহে 'শিআ' শব্দ ব্যবহৃত হলে এ অর্থেই হয়েছে।

২. শ্রেষ্ঠত্ববাদী শিআনে আলি। এ দলের উৎপত্তি দু-বছর পর ৩৯ হিজরি সনে। তারা হজরত আলি রাযি.-কে খিলাফতের অধিক হকদার দাবি করত। অবশ্য অধিকাংশ মাসআলায় তারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর সঙ্গে একমত ছিল।

৩. সাবায়ি শিয়ানে আলি। তারা ফিরকায়ে তাবারিয়া নামেও পরিচিত। এই দলটির উৎপত্তিও আলি রাযি.-এর খিলাফতকালেই হয়। ইবনে সাবার সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এ দলটির সদস্যরা সালমান ফারসি রাযি., আবু যর গিফারি রাযি., আম্মার বিন ইয়াসির রাযি. ও মিকদাদ রাযি.-এর ন্যায় হাতেগোনা কয়েকজন সাহাবি ব্যতীত সকল সাহাবিকে অভিসম্পাত করত; এমনকি মুনাফিক, কাফির ও মুরতাদ অভিহিত করত। তাদের কেউ কেউ বিদায় হজে শরিক সকল সাহাবিকে মুরতাদ বলত। তাদের দাবি ছিল—নবীজি বিদায় হজের সফরে সাহাবায়ে কেরামের সামনে সুস্পষ্ট ভাষায় তার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে হজরত আলির নাম ঘোষণা করে যাওয়া সত্ত্বেও সাহাবায়ে কেরাম নবীজির ইন্তেকালের পর আলির হাতে বায়আত গ্রহণ না করে মুনাফিক, কাফির ও মুরতাদ হয়ে গেছে। খলিফা আলি রাযি. তাদের এই আকিদার কথা জানতে পেরে সুস্পষ্ট ভাষায় এ বিষয়ে নিজের অসম্পৃক্তি ঘোষণা করেন এবং কঠোর ভাষায় তাদের নিন্দা করেন।

৪. চরমপন্থি শিআনে আলি। তারা হজরত আলি রাযি.-এর শানে বিভিন্ন ভ্রান্ত ও বিচিত্র আকিদা সৃষ্টি করে। আলি রাযি.-এর মাঝে ইলাহিয়াত বা প্রভুত্ব অধিষ্ঠিত হয়েছে, তিনি আল্লাহর নবী, তিনি জীবিত আছেন এবং মেঘ ও বজ্রের মাঝে লুক্কায়িত আছেন ইত্যাদি চরম গর্হিত মতবাদ এ দলেরই সৃষ্টি।

প্রথম দু-দল যদিও প্রথমদিকে শিআনে আলি নামে পরিচয় দিত, কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন তৃতীয় ও চতুর্থ দলের আবির্ভাব ঘটে এবং তারাও নিজেদেরকে 'শিআনে আলি' দাবি করতে থাকে, তখন প্রথম দুই দলের সদস্যগণ হক-বাতিলের পার্থক্যকরণ এবং পরিচয়-স্বাতন্ত্র্যের দাবিতে পূর্বোক্ত নাম অপছন্দ করে নিজেদের জন্য 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআ' নাম-পরিচিতি পছন্দ করে আর তৃতীয় ও চতুর্থ দলটিই শিআনে আলি বা শিয়া নামে পরিচিত হতে থাকে। তাই বর্তমানের পরিভাষায় শিয়া দ্বারা এই তৃতীয় ও চতুর্থ দলটিই উদ্দেশ্য।

যেহেতু শিয়া সম্প্রদায়ের আকিদা ও বিশ্বাস সম্পূর্ণই উদ্ভট মস্তিষ্কপ্রসূত; বরং বিশুদ্ধ ইসলামি আকিদা ও বিশ্বাসকে কলুষিত করার অসদুদ্দেশ্যে রচিত, তাই কালের পরিক্রমায় তাদের মাঝে নতুন নতুন আকিদার উদ্ভব হতে থাকে এবং একে কেন্দ্র করে অসংখ্য দল-উপদল সৃষ্টি হতে থাকে। আর তাই ইতিহাস পর্যালোচনা করলে উল্লিখিত তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকারের শিয়াদের দল-উপদলের সংখ্যা একশ এর কাছাকাছি পাওয়া যায়। তবে এসব দল-উপদলের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হলো ইমামিয়া সম্প্রদায়। বর্তমানে পৃথিবীতে যত শিয়া সম্প্রদায় আছে, সব ইমামিয়া সম্প্রদায়েরই শাখা-উপশাখা। ইমামিয়া সম্প্রদায় হজরত আলি রাযি.-এর পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে বিভিন্ন ইমামগণের বিদ্যমানতা ও তাদের সম্পর্কে নানারকম ভ্রান্ত আকিদা পোষণ করে। ইমামিয়া সম্প্রদায়ের শাখাগুলোর মধ্যে তিনটি শাখা সবচেয়ে প্রসিদ্ধ : ইছনা আশারিয়া, ইসমাইলিয়া ও যায়দিয়া।

১. ইছনা আশারিয়া

শিয়াদের সবচেয়ে বড় ও প্রসিদ্ধ উপশাখা হচ্ছে ইছনা আশারিয়া। তাদেরকে রাফিজিও বলা হয়। যেহেতু তারা বারো ইমামের আকিদা পোষণ করে তাই তাদেরকে ইছনা আশারিয়া বা দ্বাদশ ইমামবাদী বলা হয়। বর্তমানে শিয়া বা ইমামিয়া বলে সাধারণত তাদেরকেই বোঝানো হয়

বলে শিয়া ও ইছনা আশারিয়া শব্দদুটি প্রায় সমার্থক শব্দের রূপ ধারণ করেছে। ইরানের অধিকাংশ শিয়া ইছনা আশারিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। ইরানের রাষ্ট্রক্ষমতাও তাদের নিয়ন্ত্রণে। এ ছাড়াও ইরাক, সিরিয়া ও লেবাননে প্রচুর পরিমাণ ইছনা আশারিয়া গোষ্ঠীর লোকজন বসবাস করে। পাক-ভারত উপমহাদেশেও তাদের সীমিত উপস্থিতি রয়েছে।

ইতিহাসে প্রসিদ্ধ নুসায়রিয়া সম্প্রদায় এই ইছনা আশারিয়া ফিরকারই উপশাখা। অন্যান্য ইছনা আশারিয়াদের সঙ্গে নুসায়রিয়াদের পার্থক্য হলো—তারা মুহাম্মাদ বিন নুসায়রকে ইমাম মাহদির নায়েব মনে করে থাকে আর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তাকে মিথ্যা ইমাম দাবিদার গণ্য করে। উত্তর সিরিয়া ও তুরস্কে প্রচুর সংখ্যক নুসায়রিয়া মতাদর্শী লোক বসবাস করে।

২. যায়দিয়া

ইমামিয়া সম্প্রদায়ের আরেকটি প্রসিদ্ধ উপশাখা। ১২২ হিজরি সনে (৭৪০ খ্রিষ্টাব্দে) যখন হুসাইন রাযি.-এর পৌত্র যায়দ বিন আলি তৎকালীন উমাইয়া খলিফা হিশাম বিন আবদুল মালিকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, তখন তার অনুসারী শিয়ারা তাকে বলে, 'আপনি আপনার পিতৃপুরুষ আলির প্রতি জুলুমকারী আবু বকর ও উমরের প্রতি অভিসম্পাত করুন।' কিন্তু তিনি তাদের দাবি প্রত্যাখ্যান করে উম্মাহর শ্রেষ্ঠতম দুই মহান সাহাবির জন্য কল্যাণের দোয়া করেন এবং বলেন, 'আমি তাদের প্রতি ভালো ধারণাই পোষণ করি। আমি তো বনু উমাইয়ার বিরুদ্ধে এজন্য বিদ্রোহ করেছি যে, তারা আমার দাদা হুসাইন রাযি.-কে শহিদ করেছে, হাররা যুদ্ধের সময় মদিনায় রক্তপাত ঘটিয়েছে এবং পাথর ও আগুনের গোলার আঘাতে পবিত্র বাইতুল্লাহর মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেছে।' তার এই উত্তর শুনে কিছু লোক তার পক্ষে থাকলেও অনেকে তার পক্ষ ত্যাগ করে। তার পক্ষে থেকে যাওয়া লোকেরাই পরবর্তীকালে যায়দিয়া নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে আর পক্ষত্যাগীরা প্রসিদ্ধি লাভ করে রাফিজি (দলত্যাগী) নামে। এ কারণেই ইছনা আশারিয়া শিয়াদেরকে রাফিজিও বলা হয়।

যায়দিয়া সম্প্রদায়ের মতাদর্শ অনুসারে পঞ্চম ইমাম হলেন হযরত হুসাইন রাযি.-এর পৌত্র যায়দ (বিন আলি বিন হুসাইন রাযি.)। অপরদিকে ইছনা

আশারিয়া মতাদর্শীদের মতে পঞ্চম ইমাম হলেন হযরত হুসাইন রাযি.-এর আরেক পৌত্র মুহাম্মাদ (বিন আলি বিন হুসাইন রাযি.)।

অন্যান্য শিয়া দল-উপদলের তুলনায় যায়দিয়া সম্প্রদায়ের মতাদর্শ তুলনামূলক আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর নিকটবর্তী। তাদের আকিদা হলো—ইমামগণ ঐশ্বরিক কোনো শক্তির অধিকারী বা নিষ্পাপ নন; বরং সাধারণ মানুষ। তবে হজরত আলি রাযি. নবীজির পর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। তারা কোনো সাহাবিকে কাফির বলে না; অভিসম্পাতও করে না। যায়দিয়া সম্প্রদায় মুতা বিয়েকে অবৈধ বলে এবং ইমামগণের অদৃশ্য হওয়ার আকিদাকে অস্বীকার করে। বর্তমানে আদি যায়দি মতাদর্শের সামান্য কিছু লোকজন ইয়ামেন ও অন্যান্য দেশে পাওয়া যায়।

৩. ইসমাইলিয়া

ইসমাইলিয়া মূলত ইছনা আশারিয়া সম্প্রদায়েরই একটি উপশাখা। তাদের আরেক নাম বাতিনি ফিরকা। ১৪৮ হিজরি সনে (৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে) ইমামিয়া সম্প্রদায়ের দাবিকৃত ষষ্ঠ ইমাম জাফর সাদিকের মৃত্যুর পর ইমামিয়া সম্প্রদায় ইমামতের প্রশ্নে দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ দাবি করে যে, জাফর সাদিকের জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসমাইল হলেন পরবর্তী সপ্তম ইমাম। অপর একটি অংশ দাবি করে, ইসমাইল নন; বরং জাফর সাদিকের আরেক পুত্র মুসা কাজিম হলেন পরবর্তী ইমাম। এখান থেকেই ইমামিয়া সম্প্রদায় দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় এবং প্রথম দল ইসমাইলিয়া ও দ্বিতীয় দল ইছনা আশারিয়া নামে পরিচিত হয়। পাক-ভারত উপমহাদেশের অধিকাংশ শিয়া ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়াও দক্ষিণ আফ্রিকা, মধ্য আফ্রিকা ও সিরিয়ায় অল্প পরিমাণে তাদের উপস্থিতি রয়েছে। মিশরকেন্দ্রিক উবায়দি সাম্রাজ্যের শাসক ফাতিমিয়া পরিবার, বিভিন্ন অঞ্চল শাসনকারী কারামাতিয়া সম্প্রদায় এবং ইতিহাসে কুখ্যাত হাশাশিন সম্প্রদায় ইসমাইলি সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত।

ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ের শাখা-উপশাখা

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসমাইলিয়া সম্প্রদায় ইসমাইল বিন জাফর সাদিককে নিজেদের সপ্তম ইমাম দাবি করত। ১৯৩ হিজরি সনে (৮০৯ খ্রিষ্টাব্দে) ইসমাইলের পুত্র মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল ইন্তেকাল করলে ইসমাইলিয়া সম্প্রদায় দাবি করে যে, তিনি আত্মগোপন করে আছেন এবং

অতি শীঘ্রই ইমাম মাহদি নামে আত্মপ্রকাশ করে পৃথিবীতে ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন। এ সময় আব্বাসি খিলাফতের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ইয়ামেন, ইরাক, আরব উপদ্বীপের পূর্বাঞ্চল ও পারস্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসমাইলিয়া মতাদর্শের প্রচারকরা ব্যাপক পরিসরে কাজ করতে থাকে। ইরাক ও পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চলে ইসমাইলিয়া মতাদর্শের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে হামদান বিন কারামাত। ২৮৬ হিজরি সনে (৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে) শামে ইসমাইলিয়া মতাদর্শের প্রচারক (পরবর্তী সময়ে উবায়দি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা) উবায়দুল্লাহ আল-মাহদি নিজেকে মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল তথা হজরত ফাতিমা রাযি.-এর বংশধর[৭৩] এবং একাদশ ইসমাইলি ইমাম দাবি করে। কিন্তু হামদান বিন কারামাতের নেতৃত্বাধীন ইরাক, বাহরাইন ও খোরাসানের ইসমাইলিয়া সম্প্রদায় উবায়দুল্লাহর দাবি প্রত্যাখ্যান করে। এখান থেকেই ইসমাইলিয়া সম্প্রদায় ফাতিমিয়া ও কারামাতিয়া দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। উবায়দুল্লাহ আল-মাহদির অনুসারীরা পরিচিত হয় 'ফাতিমিয়া' নামে আর হামদান বিন কারামাতের অনুসারীরা পরিচিত হয় 'কারামাতিয়া' নামে। কারামাতিয়া গোষ্ঠী বিভিন্ন সময় বাহরাইন, ইয়ামেনসহ বিভিন্ন অঞ্চলে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। অপরদিকে ফাতিমিরা ২৯৭ হিজরি সনে (৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে) উত্তর আফ্রিকায় উবায়দি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে, যা পরবর্তীকালে মিশর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে।

ফাতিমিরা পরবর্তী সময়ে দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এক দলের নাম নিযারিয়া, আরেক দলের নাম মুসতালিয়া। ৪৮৭ হিজরি সনে (১০৯৪ খ্রিষ্টাব্দে) অষ্টম উবায়দি (ফাতিমি) শাসক (অষ্টাদশ ইসমাইলি ইমাম) মুসতানসিরের মৃত্যুর পর উবায়দি রাজপরিবার পরবর্তী শাসক ও ইমাম নির্ধারণ প্রশ্নে দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক দল তার পুত্র নিযার আল-মুসতাফা লি দ্বীনিল্লাহকে ইমাম দাবি করে, অপর দল তার আরেক পুত্র আহমাদ মুসতালিকে ইমাম দাবি করে। প্রথম দল নিযারিয়া নামে এবং দ্বিতীয় দল মুসতালিয়া নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এ সময় আহমাদ মুসতালি রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে তার ভাই নিযারকে বন্দি করেন। বন্দি অবস্থায় নিযারের মৃত্যুর পর তার পুত্র আল-হাদি বিন নিযার মিশর থেকে

---

৭৩. এ দাবির বাস্তবতা সম্পর্কে তৃতীয় খণ্ডে আলোচনা করা হবে।

পালিয়ে পারস্যে ইসমাইলি ধর্মপ্রচারক হাসান সাবাহর কাছে চলে যায় এবং নিযারিয়া মতাদর্শের প্রসারে কাজ করতে থাকে। এই হাসান সাবাহই ছিল কুখ্যাত হাশাশিন গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা। কালের পরিক্রমায় যেহেতু কারামাতিয়া ও মুসতালিয়াদের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে, তাই বর্তমানে ইসমাইলিয়া বলে এই নিযারিয়া গোষ্ঠীকেই বোঝানো হয়। বর্তমানে তারা 'আগাখানিয়া' নামে অধিক প্রসিদ্ধ। আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চল, ইউরোপ ও ভারতে প্রচুর সংখ্যক আগাখানিয়া মতাদর্শী বসবাস করে। বর্তমানে তাদের প্রধান নেতা ফ্রান্সে বসবাসকারী ও ব্রিটিশ নাগরিকত্বের অধিকারী করিম হুসাইন শাহ (৪র্থ আগাখান), যিনি বিখ্যাত ফোর্বস ম্যাগাজিনের ভাষ্য অনুসারে বিশ্বের শীর্ষ দশ ধনীর একজন।

* * *

চতুর্থ অধ্যায়

আব্বাসি খিলাফত

[রবিউস সানি ১৩২ হিজরি—৯২৩ হিজরি]

[ডিসেম্বর ৭৪৯ খ্রিষ্টাব্দ—১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দ]

আব্বাসি খিলাফত দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী বিস্তৃত ছিল। সুদীর্ঘ কাল ধরে ইসলামি সাম্রাজ্যকে নেতৃত্বদানকারী আব্বাসি খলিফাগণের শাসনকালকে মৌলিক ছয়টি ভাগে ভাগ করা যায়।

১. আব্বাসি খিলাফতের প্রতাপ ও সমৃদ্ধিকালের খলিফাগণের শাসনামল।

২. তুর্কিদের প্রত্যক্ষ প্রভাব-নিয়ন্ত্রিত খলিফাদের শাসনামল।

৩. শিয়া বুওয়াইহি পরিবার-প্রভাবিত খলিফাগণের শাসনামল।

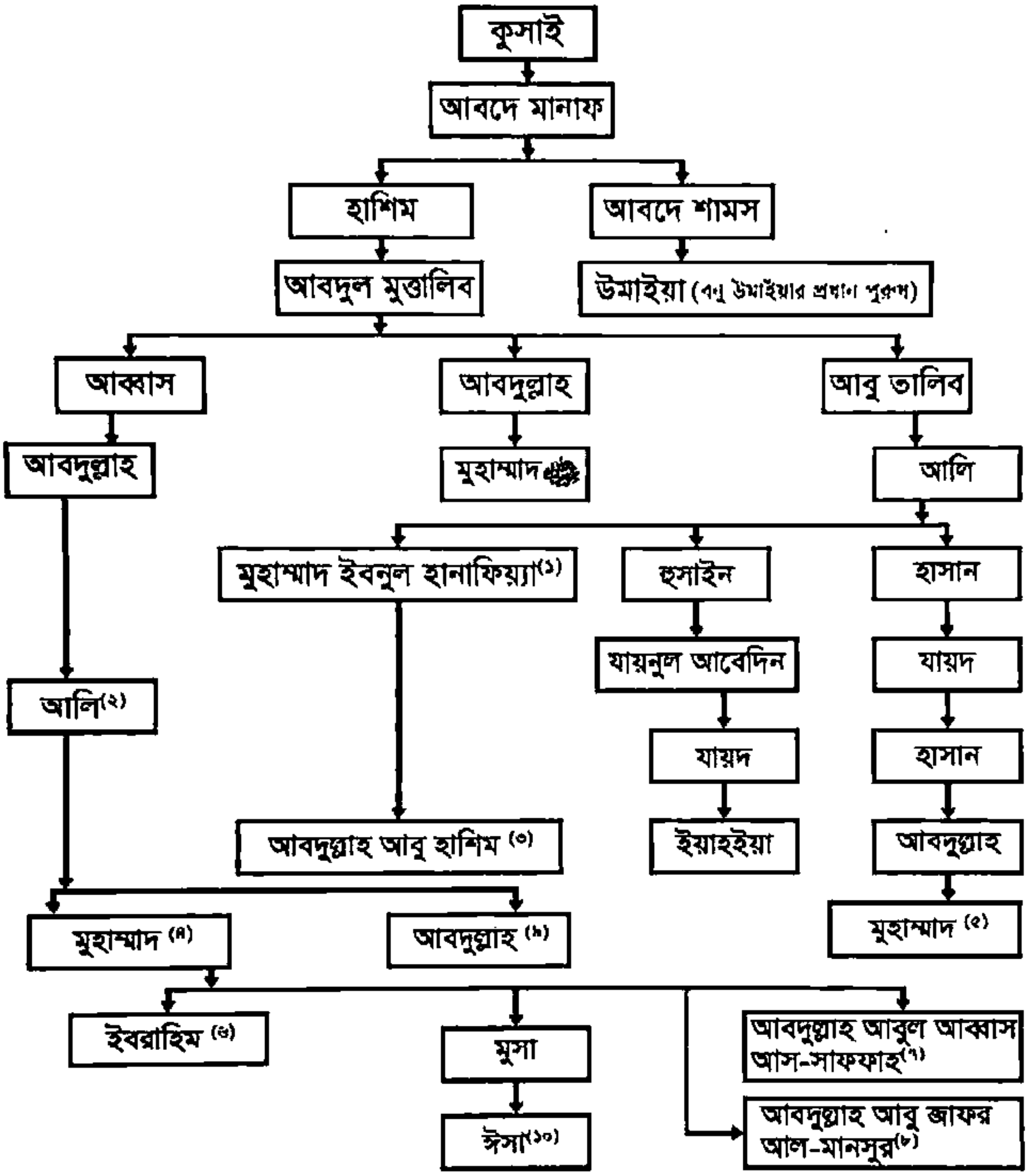
৪. তুর্কি সেলজুক পরিবার-নিয়ন্ত্রিত খলিফাগণের শাসনামল।

৫. ইসলামি বিশ্বে তাতারদের আগ্রাসন চলাকালীন খলিফাগণের শাসনামল।

৬. তাতারদের হাতে বাগদাদের পতন-পরবর্তী সময়ে মিশরকেন্দ্রিক আব্বাসি খলিফাগণের আমল।

সামনে আমরা প্রথমে আব্বাসি খিলাফত প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট আলোচনা করব। এরপর উল্লিখিত প্রতিটি অংশের খলিফাগণের শাসনামলের বিবরণ সংক্ষেপে আলাদা আলাদা পরিচ্ছেদে তুলে ধরা হবে, ইনশাআল্লাহ।

আব্বাসি খিলাফতের প্রাথমিক ইতিহাস অধ্যয়নে সহায়ক কুরাইশ বংশলতিকা



১. মৃত্যু ৮১ হি. সন। হযরত আলি রাযি.-এর অন্যান্য সন্তান হতে পরিচয়-পার্থক্যকরণের উদ্দেশ্যে তাকে তার মায়ের প্রতি সম্বন্ধ করা হয়।

২. তার উপাধি ছিল 'সাজ্জাদ' বা অধিক সিজদাকারী। খলিফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিকের পক্ষ থেকে তাকে জায়গির হিসেবে হুমায়মা অঞ্চল প্রদান করা হয়েছিল।

৩. মৃত্যু ৯৯ হি.। কথিত আছে—তাকে খাবারে বিষপ্রয়োগ করা হয়।

৪. আবু হাশিম তার কাছেই ইন্তেকাল করেন এবং তাকে বনু উমাইয়ার বিরুদ্ধে প্রতিশোধগ্রহণের অসিয়ত করেন।

৫. আব্বাসি খলিফা আল-মানসুর তাকে আপন সাম্রাজ্যের জন্য হুমকি বিবেচনা করে হত্যা করেন।

৬. পিতার মৃত্যুর পর তিনিই আব্বাসি আন্দোলনের হাল ধরেন। তাকে ১২৯ হি. সনে বন্দি করা হয় এবং বন্দি অবস্থায়ই তিনি ১৩২ হি. সনে ইন্তেকাল করেন।

৭. ১ম আব্বাসি খলিফা।

৮. ২য় আব্বাসি খলিফা।

৯. ২য় আব্বাসি খলিফা আল-মানসুর তার এই চাচাকে আপন সাম্রাজ্যের জন্য হুমকি বিবেচনা করে হত্যা করেন।

১০. ১ম আব্বাসি খলিফা আস-সাফফাহ তাকে (ভাই আল-মানসুরের পর) ২য় ভাবী খলিফা ঘোষণা করেছিলেন।

আব্বাসি আন্দোলনের সূচনা কাহিনি

হুমায়মা (Humeima)!

বনু উমাইয়ার শাসকপরিবার সাধারণত আহলে বায়ত বা নবীবংশের সদস্যদের মর্যাদা ও শ্রদ্ধার চোখে দেখত। তবে উমাইয়া সাম্রাজ্যের কোনো কোনো গভর্নরের পক্ষ থেকে মাঝেমধ্যে তাদের সঙ্গে অসদাচরণ ও সীমালঙ্ঘনের ঘটনাও ঘটেছিল।

ষষ্ঠ উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক তার শাসনামলে আব্বাসি পরিবারের তৎকালীন প্রবীণ সদস্য আলি বিন আবদুল্লাহ বিন আব্বাসকে জায়গির হিসেবে (জর্ডানের অন্তর্গত) হুমায়মা অঞ্চল প্রদান করেন। আলি বিন আবদুল্লাহ বিন আব্বাস সেখানেই বসবাস করেন এবং স্থায়ী নিবাস গড়ে তোলেন।

আন্দোলনের সূচনা যেভাবে

এর অনেকদিন পর আবু হাশিম আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়্যা একবার সপ্তম উমাইয়া খলিফা সুলায়মান বিন আবদুল মালিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। খলিফা তাকে উষ্ণ স্বাগত জানান এবং যথেষ্ট সমাদর করেন। খলিফার দরবার থেকে ফিরে আসার পর আবু হাশিম অসুস্থতা অনুভব করেন এবং বুঝতে পারেন যে, তার 'আজাল' ঘনিয়ে এসেছে। এ সময় লোকমুখে এ কথা ছড়িয়ে পড়ে যে, খলিফা সুলায়মান তাকে খাবারের মাধ্যমে বিষপ্রয়োগ করেছেন। আবু হাশিম তার জ্ঞাতিভাই মুহাম্মাদ বিন আলি বিন আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের কাছে পৌঁছে তাকে এ বিষয়ে অবগত করেন এবং এর প্রতিশোধ নেওয়ার অসিয়ত করেন। এটি ৯৯ হিজরি সনের ঘটনা।

আবু হাশিমের কথা মুহাম্মাদ বিন আলির মনে দাগ কাটে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী। সন্তানসন্তুতি ছাড়াও তার সমর্থনে ছিল তার বিশের অধিক ভাই। স্বাভাবিকভাবেই মুহাম্মাদ বিন আলি উমাইয়া সাম্রাজ্যের

পতনের এই পরিকল্পনা সাদরে গ্রহণ করেন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য কাজ শুরু করেন।

স্থান নির্বাচন

মুহাম্মাদ বিন আলি বিন আবদুল্লাহ বিন আব্বাস তার আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে কুফা ও খোরাসানকে নির্বাচন করেন। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এ নির্বাচন ছিল অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সুচিন্তিত। যেমন :

১. বনু উমাইয়ার শাসক পরিবারের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণকারী অধিকাংশ মানুষের অবস্থান ছিল কুফায়।

২. খোরাসানের অবস্থান ছিল উমাইয়া সাম্রাজ্যের পূর্ব প্রান্তে। তাই প্রতিকূল বা অস্থিতিশীল পরিবেশে খোরাসান থেকে পালিয়ে পার্শ্ববর্তী তুর্কি রাষ্ট্রে আশ্রয়গ্রহণ সহজ ছিল।

৩. খোরাসানে বসবাসকারী আরবদের মাঝে তখন সাম্প্রদায়িক (কায়সি-ইয়ামেনি) সংঘাত চলছিল। আব্বাসি আন্দোলনের পুরোধাদের পরিকল্পনা ছিল এ সংঘাতকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করা।

৪. ইসলামি সাম্রাজ্যে খোরাসানের অন্তর্ভুক্তি বেশি পুরোনো নয়। তাই নবীবংশের প্রতি ভালোবাসা ও আবেগের বিষয়টির মাধ্যমে খোরাসানবাসীর অন্তরকে প্রভাবিত করা সম্ভব ছিল।

মুহাম্মাদ বিন আলি বিন আবদুল্লাহ বিন আব্বাস তার আন্দোলনের মূলকেন্দ্র হিসেবে কুফাকে নির্বাচন করেন এবং সেখানে 'কাবিরুদ-দুআত' নামক কেন্দ্র স্থাপন করেন আর খোরাসানকে নির্বাচন করেন আন্দোলনের প্রচারণার ক্ষেত্র হিসেবে।

তিনি পুরো বিষয়টিকে পূর্ণ গোপনীয়তার সঙ্গে সম্পাদন করেন। যাবতীয় তথ্য খোরাসান থেকে কুফায় এবং কুফা থেকে হুমায়মায় পৌঁছত। আন্দোলনের প্রচারকগণ ব্যবসায়ী বা হাজিদের বেশে সফর করত।

খোরাসানে আব্বাসি আন্দোলনের প্রধান আহ্বায়ক ছিলেন আবু ইকরিমা আস-সাররাজ (আবু মুহাম্মাদ আস-সাদিক)। তিনি সেখানকার বিভিন্ন আরব গোত্র হতে বারোজন প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। যেসব ঐতিহাসিক দাবি করে যে, আব্বাসি আন্দোলন পারসিকদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত

হয়েছে, এ তথ্যটি তাদের দাবিকে প্রত্যাখ্যান করে। এই বারোজন প্রতিনিধি প্রধান আহ্বায়কের নির্দেশনায় কাজ করত; কিন্তু মূল ইমামকে চিনত না। প্রত্যেক প্রতিনিধির অধীনে সত্তরজন করে কর্মী ছিল।

ধীরে ধীরে খোরাসানে আন্দোলনের ফল প্রকাশ পেতে থাকে এবং আন্দোলনের নিয়ন্ত্রকগণ গোপন অবস্থান থেকে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করে। পরিস্থিতির নাজুকতা উপলব্ধি করে খোরাসানের তৎকালীন গভর্নর আসাদ বিন আবদুল্লাহ আল-কাসরি খোরাসানের প্রধান আহ্বায়ক আবু ইকরিমা আস-সাররাজ ও তার কয়েকজন সঙ্গীকে গ্রেফতার করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেন। এটি ১০৭ হিজরি সনের (৭২৫ খ্রিষ্টাব্দের) ঘটনা।

গভর্নর আসাদ বিন আবদুল্লাহ আপন অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ১১৮ হিজরি সন (৭৩৬ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত (এর মধ্যে তিনি একবার বরখাস্ত হওয়ার পর গভর্নর পদে পুনর্বহাল হন) আব্বাসি সংগঠনের বেশ কয়েকজন নেতার পরিচয় উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম হন এবং যথেষ্ট কঠোরতার মাধ্যমে আন্দোলন দমনে সচেষ্ট হন। ফলে আব্বাসি আন্দোলনের প্রচারণা পুনরায় পূর্ণ গোপনীয়তায় চলে যায়।

আন্দোলনের আহ্বায়ক নির্বাচনে ভুল সিদ্ধান্তের পরিণতি

পরিস্থিতির দাবি অনুযায়ী আব্বাসি আন্দোলনের পুরোধাগণ উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে, খোরাসানে আন্দোলন টিকিয়ে রাখতে এবং জোরদার করতে কিছু পরিবর্তন ও সংস্কার প্রয়োজন। তাই তারা খোরাসানের নতুন প্রধান আহ্বায়ক হিসেবে আম্মার বিন ইয়াযিদ (খাদ্দাশ)-কে নির্বাচন করে। কিন্তু এই নির্বাচন মোটেও সঠিক ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিল না। কিছুদিন পরই তার থেকে কুফরি আচরণ প্রকাশ পেতে থাকে! ১১৮ হিজরি সনে সে গভর্নর আসাদ বিন আবদুল্লাহর হাতে নিহত হয়।

সংকটের মুখোমুখি আব্বাসি আন্দোলন

খাদ্দাশের কর্মকাণ্ড জনগণের মাঝে আব্বাসি আন্দোলনের সুনাম নষ্ট করে ফেলে। এর ফলে তারা পরবর্তী নতুন আহ্বায়কের প্রতি আস্থা রাখতে পারেনি। পাশাপাশি গভর্নর আসাদ বিন আবদুল্লাহর সর্বোচ্চ কঠোরতাও এ ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখছিল।

১২২ হিজরি সন পর্যন্ত আব্বাসি আন্দোলন অনেকটা ধীর গতিতেই চলতে থাকে। এরইমধ্যে সৃষ্টি হয় আরেক প্রতিবন্ধকতা। কুফায় যায়দ বিন যায়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে উমাইয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হয়। বিদ্রোহ চলাকালে ও বিদ্রোহ পরবর্তী সময়ে স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরে আসা পর্যন্ত আব্বাসি আন্দোলন স্তিমিত রাখা জরুরি ছিল।

১২৫ হিজরি সনে (৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দে) আব্বাসি আন্দোলনের প্রধান পুরুষ মুহাম্মাদ বিন আলি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তার পুত্র ইবরাহিমকে আন্দোলন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার অসিয়ত করে যান।

১২৫ হিজরি সনেই (৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দে) খলিফা হিশাম বিন আবদুল মালিকের মৃত্যু হলে এবং উমাইয়া রাজপরিবার গৃহসংঘাতে জড়িয়ে পড়লে আব্বাসি আন্দোলনে নতুন গতি সৃষ্টি হয়। পাশাপাশি আব্বাসি আন্দোলনের ইমাম ইবরাহিম বিন মুহাম্মাদের নির্দেশনায় খোরাসানে চলমান গোত্রকেন্দ্রিক সংঘাতকেও কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তখন খোরাসানের গভর্নর ছিলেন নাস্‌র বিন সাইয়ার। তিনি ছিলেন মুযার গোত্রীয়। অপরদিকে খোরাসানে বসবাসরত অধিকাংশ আরব জনগণ ছিল ইয়ামেনি। তারা তাদের গভর্নরকে অপছন্দ করত। তাই আব্বাসি প্রচারণা ইয়ামেনিদের টার্গেট করে পরিচালিত হতে থাকে। এই সাম্প্রদায়িক সংঘাত ইয়ামেনি, মুযারি, তুর্কি, জ্ঞানী ও আলিমসমাজ এবং সামরিক ব্যক্তিবর্গসহ সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের অবস্থা ও স্বার্থে ব্যাপক প্রভাব ফেলছিল। আর চলমান ঘটনাপ্রবাহের এই সবকিছুই তখন আব্বাসি আন্দোলনকে নতুন করে জেগে উঠতে সহায়তা করেছিল।

১২৮ হিজরি সনে আব্বাসি আন্দোলনের কর্মতৎপরতায় এক শক্তিশালী ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ ঘটে, যার নাম আবু মুসলিম খোরাসানি। আবু মুসলিম খোরাসানি পারসিক বংশোদ্ভূত ছিলেন এবং দীর্ঘ কয়েক বছর যাবৎ আব্বাসি আন্দোলনের একজন প্রচারক হিসেবে কাজ করছিলেন। ইমাম ইবরাহিম বিন মুহাম্মাদ তার মধ্যে ব্যতিক্রমী প্রতিভা ও অভিনব দক্ষতার ঝলক দেখতে পেয়ে তাকে খোরাসানে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন এবং আশা প্রকাশ করেন যে, তার দক্ষতার ছোঁয়ায় খোরাসানে আব্বাসি আন্দোলন আরও বিস্তৃত ও বিকশিত হবে।

১২৯ হিজরি সনে ইমামের পক্ষ থেকে আবু মুসলিমের কাছে প্রকাশ্যে প্রচারণা চালানোর নির্দেশনা আসে। নির্দেশনা মোতাবেক আবু মুসলিম

কাজ শুরু করেন। খোরাসানের তৎকালীন গভর্নর তখন অভ্যন্তরীণ সংঘাত ও গোলযোগ দমনে ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। ঈদুল ফিতরের দিন আবু মুসলিম জনগণকে নিয়ে ঈদের নামাজ আদায় করেন।

বনু উমাইয়া-বনু আব্বাসের প্রথম সশস্ত্র সংঘাত

খোরাসানেই উভয় শক্তির মধ্যে প্রথম সশস্ত্র সংঘাতের ঘটনা ঘটে। যুদ্ধে আবু মুসলিম গভর্নর নাস্‌র বিন সাইয়ারের বাহিনীর বিরুদ্ধে জয়লাভ করেন এবং তার অনুসারীর সংখ্যা বেড়ে যায়। এ সময় পরিস্থিতি নিজের নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য আবু মুসলিম অত্যন্ত সূক্ষ্ম একটি কৌশল কাজে লাগান। তিনি ইয়ামেনি ও মুযারি উভয় গোত্রের লোকদের কাছে ভিন্ন ভিন্ন বার্তা পাঠিয়ে উভয় দলকে নিজের পক্ষে টানার চেষ্টা করেন এবং বলেন, আমাদের ইমাম আমাকে আপনাদের সঙ্গে সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং আমি আপনাদের বিষয়ে তার নির্দেশনা অমান্য করব না।

ধীরে ধীরে টানটান উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি হয়। শেষ উমাইয়া খলিফা মারওয়ান বিন মুহাম্মাদ হুমায়মায় অবস্থানকারী আব্বাসি আন্দোলনের ইমাম ইবরাহিম বিন মুহাম্মাদের খোঁজে বাহিনী প্রেরণ করেন। তারা তাকে আটক করে দামেশকে খলিফার কাছে পাঠিয়ে দিলে খলিফা তাকে কারাবদ্ধ রাখার নির্দেশ দেন।

১৩১ হিজরি সনে আবু মুসলিমের বাহিনী ইরাকি বাহিনীর বিরুদ্ধে জয়লাভ করে। এরপর আবু মুসলিম কুফার উদ্দেশে রওনা হন। কুফায় ততদিনে আব্বাসি আন্দোলনের প্রচারক মুহাম্মাদ বিন খালিদ বিন আবদুল্লাহ আল-ক্বাসরি প্রকাশ্যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন।

১৩২ হিজরি সনে (৭৪৯ খ্রিষ্টাব্দে) আব্বাসি ইমাম ইবরাহিম বিন মুহাম্মাদ উমাইয়া খলিফা মারওয়ান বিন মুহাম্মাদের কারাগারে ইন্তেকাল করেন। তিনি তার অবর্তমানে তার ভাই আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ (আস-সাফফাহ)-এর নামে 'খিলাফত'-এর অসিয়ত করে যান। ১৩২ হিজরি সনের রবিউস সানি মাসে (৭৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে) বনু আব্বাস আস-সাফফাহর হাতে খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করে।

একই বছরের ১১ জুমাদাল উখরা (৭৫০ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি) আস-সাফফাহ উমাইয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বাহিনী প্রেরণ করেন। আব্বাসি বাহিনী উমাইয়াদের সমূলে নিঃশেষ করে ফেলে এবং একমাত্র আন্দালুস বাদে পুরো ইসলামি বিশ্বে বনু আব্বাসের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

একই বছরের জিলহজ মাসে (৭৫০ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে) শেষ উমাইয়া খলিফা মারওয়ান বিন মুহাম্মাদ আব্বাসি খলিফা আস-সাফফাহর প্রেরিত বাহিনীর হাতে নিহত হন এবং এর মাধ্যমে উমাইয়া খিলাফতের চূড়ান্ত পতন নিশ্চিত হয়।

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রতাপ ও সমৃদ্ধির আমলের আব্বাসি খলিফাগণের বিবরণ

[রবিউস সানি ১৩২ হিজরি—শাওয়াল ২৪৭ হিজরি]

[ডিসেম্বর ৭৪৯ খ্রিষ্টাব্দ—ডিসেম্বর ৮৬১ খ্রিষ্টাব্দ]

আস-সাফফাহ আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আলি বিন আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি.

[রবিউস সানি ১৩২ হিজরি—জিলহজ ১৩৬ হিজরি]

[ডিসেম্বর ৭৪৯ খ্রিষ্টাব্দ—জুন ৭৫৪ খ্রিষ্টাব্দ]

আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আলি বিন আবদুল্লাহ বিন আব্বাস আস-সাফফাহ[৭৪] আব্বাসি আন্দোলনের সূতিকাগার হুমায়মাতে ১০৪ হিজরি সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই বেড়ে ওঠেন। উমাইয়া খলিফা মারওয়ান যখন আবদুল্লাহর ভাই ইবরাহিমকে গ্রেফতার করেন, তখন তিনি ভাইয়ের পরিবারসহ সপরিবারে কুফায় চলে যান। সাফফাহ 'আল-মুরতাযা' 'আল-কাসিম' ইত্যাদি উপাধিতেও প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি কীভাবে খিলাফত লাভ করেন, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা একটু পূর্বেই প্রদান করেছি। খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর তিনি কুফাতেই বসবাস শুরু করেন। আপন খিলাফত আমলে সাফফাহ বিভিন্ন বিদ্রোহ প্রচেষ্টার সম্মুখীন হন। কিন্তু আব্বাসি খিলাফতের বিশ্বস্ত সহযোগী আবু মুসলিম খোরাসানি এবং আপন পরিজন ও বংশীয় আত্মীয়দের সহায়তায় তিনি সবগুলো বিদ্রোহ প্রচেষ্টা সফলতার সঙ্গে দমন করতে সমর্থ হন। তার সহযোগীগণ সংখ্যায় যেমন অধিক ও শক্তিশালী ছিল; তেমনই ছিল

---

৭৪. সাফফাহ শব্দের অর্থ খুনি, রক্তপিপাসু, প্রচুর দানকারী, বিশুদ্ধভাষী ইত্যাদি। প্রথম আব্বাসি খলিফা আবুল আব্বাস আবদুল্লাহর 'সাফফাহ' নামকরণের কারণ সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের বিভিন্ন মত রয়েছে। একদল ঐতিহাসিকের মত হলো—স্বভাব কঠোরতা এবং নির্বিচারে বনু উমাইয়ার সদস্যদের হত্যা করার কারণে তাকে সাফফাহ বা রক্তপিপাসু উপাধি প্রদান করা হয়। আরেকদলের মত হলো—অধিক দানশীলতার কারণে তাকে উক্ত উপাধি প্রদান করা হয়। এখানে এ তথ্যটিও উল্লেখযোগ্য যে, ইয়াকুবি, তাবারি প্রমুখ প্রাচীন ঐতিহাসিকগণের রচনায় এই উপাধিটির উল্লেখ পাওয়া যায় না। প্রথম তার ক্ষেত্রে এই উপাধিটি ব্যবহার করেন ঐতিহাসিক মাসউদি (মৃত্যু : ৩৪৬ হি.) এবং পরবর্তীগণ তার অনুসরণ করেন।

প্রতিপক্ষের প্রতি নির্মম-নির্দয়। তিনি বিশেষভাবে তিনজন ব্যক্তির ওপর নির্ভর করতেন—

১. ইসলামি প্রাচ্য অঞ্চলে আবু মুসলিম খোরাসানির ওপর।
২. জাযিরা, আর্মেনিয়া ও ইরাক অঞ্চলে ভাই আবু জাফর আল-মানসুরের ওপর।
৩. শাম ও মিশরে চাচা আবদুল্লাহ বিন আলি বিন আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের ওপর।

সাফফাহ তার খিলাফতকালে তার চাচা ও চাচাতো ভাইদের মধ্য থেকেই অধিকাংশ গভর্নর নির্বাচন করেছিলেন। তিনি তার পরবর্তী খলিফা হিসেবে পর্যায়ক্রমে ভাই আবু জাফর আল-মানসুর ও ভ্রাতুষ্পুত্র ঈসা বিন মুসা বিন মুহাম্মাদের নামে আগাম বায়আত গ্রহণ করেন। তার খিলাফতকাল অধিক দীর্ঘায়ত হয়নি। দায়িত্বগ্রহণের বছর চারেক পরই গুটিবসন্তে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করায় তিনি আপন দায়িত্ব ও খিলাফতব্যবস্থা পূর্ণ সুসংহত করে যেতে পারেননি। প্রথম আব্বাসি খলিফা আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ আস-সাফফাহ ১৩৬ হিজরি সনের জিলহজ মাসে ইন্তেকাল করেন।

২ নং আব্বাসি খলিফা

আল-মানসুর আবু জাফর আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আলি বিন আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি.

[জিলহজ ১৩৬ হিজরি—জিলহজ ১৫৮ হিজরি]

[জুন ৭৫৪ খ্রিষ্টাব্দ—অক্টোবর ৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দ]

দ্বিতীয় আব্বাসি খলিফা আল-মানসুর ৯৫ হিজরি সনে হুমায়মাতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৩৬ হিজরি সনে একচল্লিশ বছর বয়সে তিনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর খলিফা মানসুর তার নিরঙ্কুশ ক্ষমতালাভের পথে তিনটি বিষয়কে হুমকি বিবেচনা করে সেগুলো নির্মূল করার প্রতি মূল দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন।

- খিলাফতের দায়িত্ব নিয়ে চাচা আবদুল্লাহ বিন আলি বিন আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আব্বাসি সাম্রাজ্যের বাহিনীসমূহের পরিচালন-দায়িত্ব তার হাতে ছিল। এসব বাহিনী গঠিত হয়েছিল খোরাসান, শাম, জাযিরা, মসুল ইত্যাদি অঞ্চলের সৈন্যদের সমন্বয়ে। বনু আব্বাসের কাছে আবদুল্লাহ বিন আলির যথেষ্ট মর্যাদা ও প্রতিপত্তি থাকলেও ব্যক্তিগতভাবে তার বিচক্ষণতা ও দৃঢ়তার অভাব ছিল।

- আব্বাসি সাম্রাজ্যের অন্যতম স্তম্ভ আবু মুসলিম খোরাসানির প্রবল প্রতিপত্তি। খলিফা তার প্রতি মোটেও প্রসন্ন ছিলেন না। রাষ্ট্রপরিচালনায় কর্তৃত্ব ও প্রভাবসম্পন্ন কারও অংশীদারি মেনে নিতে খলিফা মানসুর রাজি ছিলেন না।

- আলাবি[৭৫] বা আলি বিন আবু তালিব রাযি.-এর বংশধরগণ; যারা সম্পর্কে তার জ্ঞাতিভাই ছিল। ইসলামি বিশ্বের জনগণের হৃদয়জগতে আলিবংশের, বিশেষ করে মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন হাসান বিন যায়দ বিন হাসান বিন আলি বিন আবু তালিবের মর্যাদাসম্পন্ন অবস্থান ছিল। তাই খলিফা মানসুর আশঙ্কা করতেন যে, মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন হাসান হয়তো তার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের চেষ্টা করতে পারেন।

প্রথম হুমকি চাচা আবদুল্লাহ বিন আলি

খলিফা মানসুর এ ক্ষেত্রে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার নীতি অবলম্বন করেন। তিনি চাচা আবদুল্লাহ বিন আলির সঙ্গে আবু মুসলিম খোরাসানির সংঘর্ষ বাধিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। যে-ই মারা যাক, পথের একটি কাঁটা তো দূর হবে!

যেহেতু বনু উমাইয়ার শাসনব্যবস্থা নির্মূলের পেছনে আবদুল্লাহ বিন আলির বড় ভূমিকা ছিল, তাই তিনি প্রতীক্ষায় ছিলেন যে, আস-সাফফাহর পর খিলাফতের দায়িত্ব তার হাতেই আসবে। যখন তিনি সংবাদ পান যে, তাকে নয় বরং আবু জাফর আল-মানসুরকে নতুন খলিফা ঘোষণা করা হয়েছে, তখন তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং নিজেকে খলিফা দাবি করেন। তখন খলিফা মানসুর তাকে দমন করার জন্য আবু মুসলিম খোরাসানির নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। হার্‌রানে (Harran) উভয় বাহিনী মুখোমুখি হয়। একটানা ছয় মাস উভয় বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ চলতে থাকে। অধিকাংশ সময় যুদ্ধের পাল্লা উভয় দিকে দোদুল্যমান থাকলেও শেষদিকে আবু মুসলিম খোরাসানির দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং তিনি জয়লাভ করেন। আবদুল্লাহ বিন আলি পালিয়ে বসরায় তার ভাই সুলায়মানের কাছে চলে যান। সংবাদ পেয়ে মানসুর সুলায়মানের কাছে

---

৭৫. আরবি 'আলাবি' শব্দের অর্থ আলিপন্থি, আলি-অনুরাগী। শব্দটি ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। হজরত আলি রাযি.-এর জীবদ্দশায় শব্দটি তাদের জন্য ব্যবহৃত হতো, যারা সাহাবা-অন্তর্বিরোধের সময় আলি রাযি.-এর পক্ষাবলম্বন করেছিল। হজরত আলি রাযি.-এর ইন্তেকালের পর শব্দটি আলি রাযি.-এর বংশধরদের জন্য ব্যবহৃত হতে থাকে। অবশ্য ব্যাপকার্থে আলি-বংশধরদের খিলাফতদাবির সমর্থনকারীদেরকেও আলাবি বলা হতো। শিয়াদের শাখাগোষ্ঠী নুসায়রি সম্প্রদায়ের উৎপত্তির পর তাদেরকেও আলাবি বলা হতো।

বার্তা পাঠিয়ে আবদুল্লাহ বিন আলিকে তার কাছে উপস্থিত করার নির্দেশ দেন। সুলায়মান যেন তার প্রতি আস্থা রাখেন, এ উদ্দেশ্যে তিনি বার্তায় আবদুল্লাহ বিন আলির জন্য নিরাপত্তা ঘোষণা করেন। ১৩৯ হিজরিতে আবদুল্লাহ বিন আলিকে খলিফা মানসুরের কাছে নিয়ে আসা হলে তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করেন এবং আবদুল্লাহ ও তার সঙ্গীদেরকে কারারুদ্ধ করার নির্দেশ দেন। কারাগারে থাকা অবস্থায়ই আবদুল্লাহ বিন আলি ১৪৭ হিজরি সনে (৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দে) ইন্তেকাল করেন।

দ্বিতীয় হুমকি সেনাপতি আবু মুসলিম খোরাসানি

আবদুল্লাহ বিন আলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষে আবু মুসলিম খোরাসানে ফিরে আসার পূর্বেই খলিফা মানসুর তার একটা বিহিত করার মনস্থ করেন। খলিফা এ-ও চাচ্ছিলেন যে, আবু মুসলিম যেন তার মনোবাঞ্ছা বুঝতে না পারেন।

তিনি আবু মুসলিমের কাছে বার্তা পাঠান, আমি তোমাকে মিশর ও শামের গভর্নর নির্বাচিত করেছি। তোমার জন্য খোরাসানের চেয়ে মিশর ও শামই ভালো হবে। এর ফলে তুমি আমিরুল মুমিনিনের কাছে থাকার সুযোগ পাবে এবং তিনি তোমার সাক্ষাতের আগ্রহ করলে তুমি কাছে থেকে দ্রুত তার দরবারে উপস্থিত হতে পারবে।

মানসুরের বার্তা পেয়ে আবু মুসলিম ক্রুদ্ধ হয়ে মন্তব্য করেন—খোরাসান আমার এলাকা, আর তিনি আমাকে খোরাসান বাদ দিয়ে মিশর ও শামের দায়িত্ব দিতে চাচ্ছেন! এরপর তিনি খলিফার নির্দেশ অমান্য করে খোরাসানেই ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন।

খলিফা মানসুর আবু মুসলিমের সঙ্গে চতুরতা ও কৌশলে অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। শুরু হয় উভয়ের মধ্যে পত্রযুদ্ধ! একে অপরের উদ্দেশে একের পর এক কয়েকটি পত্র প্রেরণ করেন। একপর্যায়ে মানসুর জারির বিন ইয়াযিদ বিন জারির বিন আবদুল্লাহ বাজালিকে একদল আমিরসহ আবু মুসলিমের কাছে প্রেরণ করেন। তিনি জারিরকে বলেন, আবু মুসলিমের সঙ্গে যথাসম্ভব কোমল ভাষায় কথা বলবে এবং তাকে এ কথা বোঝাবে যে, খলিফা আপনাকে অত্যধিক মর্যাদা ও অবাধ কর্তৃত্ব প্রদানে আগ্রহী। যদি সে এ কথা মেনে নেয়, তাহলে তো ভালো। অন্যথায় তাকে বলবে, আপনি যদি মুসলমানদের ঐক্য বিনষ্ট করে যথেচ্ছ চলতে

থাকেন, তাহলে আপনার বিষয়ে আব্বাসি রাজপরিবারের কোনো দায় থাকবে না আর খলিফা নিজে আপনাকে পাকড়াও করতে অগ্রসর হবেন এবং আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করবেন। আপনি যদি অথই সমুদ্রে নেমে পড়েন, খলিফা সেখানেও আপনার পশ্চাদ্ধাবন করে আপনাকে পাকড়াও করে হত্যা করবেন; যদি না এর পূর্বেই তার মৃত্যু এসে যায়।

নির্দেশনা মোতাবেক প্রতিনিধিদল আবু মুসলিম খোরাসানির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। তিনি খলিফার আনুগত্য মেনে নিতে বা খলিফার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অস্বীকৃতি জানান। তখন প্রতিনিধিদল তাকে খলিফার বার্তার শেষ অংশটি জানিয়ে দেয়। আল্লাহর কী কুদরত! খলিফার এবারের হুমকিমূলক এই বার্তা শুনে প্রতাপশালী ও শক্তিধর আব্বাসি সেনাপতি আবু মুসলিম ভীত-প্রকম্পিত হয়ে পড়েন এবং করণীয় নির্ধারণে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন।

এদিকে খলিফা বার্তাবাহক পাঠিয়ে আবু দাউদ ইবরাহিম বিন খালিদকে খোরাসানের সেনাবাহিনীর দায়িত্ব প্রদান করেন এবং তাকে জানিয়ে দেন যে, আমি যতদিন বেঁচে আছি, ততদিন তুমিই খোরাসানের গভর্নর থাকবে। সবদিকের চাপে নতি স্বীকার করে আবু মুসলিম এবার খলিফা মানসুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সিদ্ধান্ত নেন। মানসুর তার চাতুর্য বজায় রেখে আবু মুসলিমের জন্য নিরাপত্তা ঘোষণা করেন এবং আবু মুসলিম মাদায়েনে প্রবেশ করার সময় আমির-উমারাদের সঙ্গে নিয়ে তাকে উষ্ণ সংবর্ধনা প্রদান করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি প্রতারণা করে আবু মুসলিমকে হত্যা করার বিষয়ে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ছিলেন। আবু মুসলিম যখন খলিফার প্রহরীদের প্রহরায় খলিফার সঙ্গে নিশ্চিত মনে কথা বলছিলেন, তখন খলিফার নির্দেশে তাকে হত্যা করা হয়।

ইমাম বায়হাকি রহ. হাকিম রহ. হতে আপন সনদে বর্ণনা করেন যে, হজরত আবদুল্লাহ বিন মুবারক রহ.-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল—আবু মুসলিম ও হাজ্জাজের মধ্যে কে উত্তম? তখন তিনি উত্তর দেন—'আমি বলব না যে, আবু মুসলিম কারও চেয়ে উত্তম ছিলেন। তবে হাজ্জাজ তার চেয়েও নিকৃষ্ট ছিলেন। (আলিমদের) কেউ কেউ তো হাজ্জাজের ঈমান নিয়েই আপত্তি করেছেন এবং তাকে নাস্তিক গণ্য করেছেন। কিন্তু আবু মুসলিম সম্বন্ধে কেউ এ জাতীয় কোনো মন্তব্য করেছেন বলে আমার জানা নেই। বরং এরূপ বর্ণিত আছে যে, আবু মুসলিম আপন কৃতকর্মের কারণে

আল্লাহকে ভয় করতেন। আব্বাসি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তিনি যে রক্তপাত ঘটিয়েছেন, তার জন্য তিনি তাওবা করেছেন বলেও দাবি করতেন। আল্লাহই তার পরিণতি সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানেন।'

তৃতীয় হুমকি মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন হাসান বিন যায়দ

আব্বাসি শাসকপরিবার মনে করত, বনু হাশিম হয়তো সঙ্গোপনে মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন হাসান বিন যায়দকে খিলাফতের জন্য নির্বাচিত করেছে। তাদের এই ধারণার উৎস এই ছিল যে, ইতিপূর্বে বনু উমাইয়ার শাসনামলের শেষদিকে অনেকেই উমাইয়া খলিফা মারওয়ানের বায়আত প্রত্যাহার করে মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন হাসানের হাতে খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করেছিল। স্বয়ং আব্বাসি খলিফা মানসুরও তখন তার হাতে বায়আত গ্রহণ করেছিলেন। উমাইয়াদের পতনের পর আব্বাসি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হলে মানসুর তার পূর্বের বায়আত রক্ষা করেননি। একই কারণে মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন হাসান বিন যায়দও প্রথমে সাফফাহ ও পরে মানসুরের নামে বায়আত গ্রহণ করেননি। তিনি মানসুরের আমলে আত্মগোপন করেন আর মানসুর তার সন্ধান অব্যাহত রাখেন। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পরও মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন হাসান বিন যায়দের সন্ধান না পাওয়ায় মানসুর মুহাম্মাদের পিতা আবদুল্লাহ বিন হাসান বিন যায়দকে গ্রেফতার করেন এবং তার সকল সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেন।

মানসুর মুহাম্মাদের সন্ধান অব্যাহত রাখেন এবং এজন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। কিন্তু তার সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়। এরপর তিনি হাসানবংশের সকলকে বন্দি করেন। এ সংবাদ জানতে পেরে মুহাম্মাদ তার মা হিন্দকে বলেন, 'মা! আমি তো আমার কারণে আমার বাপ-চাচাদের জীবন এমন শঙ্কার মুখে ফেলে দিয়েছি, যা থেকে নিষ্কৃতির শক্তি তাদের নেই। তাই আমি তাদের হাতে হাত রাখার (আব্বাসি খলিফার নামে বায়আত গ্রহণ করার) ইচ্ছা করেছি। এর ফলে শীঘ্রই হয়তো তারা মুক্তি পেয়ে যাবেন।' তার মা এ প্রস্তাবে সরাসরি অসম্মতি জানান। এরপর তিনি কারাগারে গিয়ে মুহাম্মাদের পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে সন্তানের ইচ্ছার বিষয়ে অবহিত করেন। পিতা আবদুল্লাহ বলেন, 'কক্ষনো না; বরং আমরা ধৈর্যধারণ করব। আল্লাহর শপথ! আমি আশা করি যে, আল্লাহ তার হাতে আমাদের জন্য কোনো কল্যাণ বয়ে আনবেন। তাকে বলো, সে যেন তার খিলাফতের প্রচারণা চালিয়ে যায় এবং নবোদ্যমে নতুন করে সবকিছু শুরু

করে। আমাদের নিষ্কৃতি তো আল্লাহর হাতে।' উম্মে মুহাম্মাদ ফিরে আসেন এবং মুহাম্মাদ আত্মগোপনে থেকেই তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন।

এরপর খলিফা মানসুর বন্দিদের সঙ্গে কঠোর ও নির্মম আচরণ শুরু করেন এবং তাদেরকে (মদিনার কারাগার) থেকে ইরাকের কারাগারে স্থানান্তরিত করে কঠিন নির্যাতন করেন। বন্দিদের অধিকাংশ কারাগারেই মৃত্যুবরণ করে।

এই বেদনাদায়ক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন হাসান মদিনায় আত্মপ্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন। ১৪৫ হিজরি সনের ১ রজব (৭৬২ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ সেপ্টেম্বর) তিনি মদিনায় আত্মপ্রকাশ করলে মদিনাবাসী তার পক্ষে নিজেদের সমর্থন ঘোষণা করে। তিনি হারামের মিম্বরে আরোহণ করে মদিনাবাসীর উদ্দেশে খুতবা প্রদান করেন।

প্রকৃতপক্ষে খলিফা মানসুরের কূটকৌশলের শিকার হয়েই মুহাম্মাদ আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। খলিফার গোপন নির্দেশে বিভিন্ন অঞ্চলের গভর্নর ও সেনাপতিগণ মুহাম্মাদকে বার্তা পাঠিয়েছিল যে, আমরা আপনার পক্ষে আছি; আপনি আত্মপ্রকাশ করুন। এসব বার্তা পেয়ে মুহাম্মাদ মনে করেছিলেন—ইসলামি বিশ্বের অধিকাংশ নগরী তার পক্ষে আছে। এ কারণেই তিনি তার সহোদর ইবরাহিম বিন আবদুল্লাহ (তারা উভয়ে আত্মগোপন করে ছিলেন আর খলিফা উভয়কেই খুঁজছিলেন)-এর সঙ্গে একমত হন যে, একই দিনে তিনি মদিনায় এবং ইবরাহিম বসরায় আত্মপ্রকাশ করবেন, যেন এর মাধ্যমে খলিফার ওপর অধিক চাপ সৃষ্টি করা যায়। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে অসুস্থ হয়ে পড়ায় ইবরাহিম আর আত্মপ্রকাশ করেননি।

মুহাম্মাদ নিজেকে মদিনাতেই আবদ্ধ রাখেন। অথচ মদিনা এমন কোনো সামরিক কেন্দ্র ছিল না, যেখানে কোনো নেতার পক্ষে দীর্ঘদিন নিরাপদে অবস্থান করা সম্ভব। কারণ, মদিনার জীবন ও জীবিকাব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণই বাইরের ওপর নির্ভরশীল। তাই অল্প কয়েক দিনের অবরোধেই মদিনাবাসীর দৃঢ়তা ও অবিচলতা ভেঙে পড়া অনিবার্য ছিল।

বাস্তবেও তাই ঘটে। খলিফা মানসুরের নির্দেশে মদিনা অবরোধ করা হয়। খলিফা শক্ত হাতে দৃঢ়তার সঙ্গে পরিস্থিতি নিজের নিয়ন্ত্রণে আনার কৌশল গ্রহণ করেন।

আবারও আবদুল্লাহ বিন যুবায়র রাযি.-এর বিয়োগান্ত ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। অবরুদ্ধ জনগণ মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন হাসানকে নিঃসঙ্গ রেখে সরে পড়ে। তিনি অনন্যসাধারণ বীরত্ব দেখিয়ে একাই লড়াই চালিয়ে একপর্যায়ে নিহত হন। এটি ১৪৫ হিজরি সনের রমজান (৭৬২ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর) মাসের ঘটনা।

ক্ষমতার শেষ হুমকি মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহও নিহত হওয়ার ফলে খলিফা মানসুরের শাসনক্ষমতা সম্পূর্ণ নিষ্কণ্টক হয় এবং নবগঠিত আব্বাসি রাষ্ট্রের ভিত্তিসমূহ দৃঢ়তা লাভ করে। আব্বাসি সাম্রাজ্যের দশদিগন্তে এখন আর কোনো আশঙ্কার কালো মেঘ নেই!

বাগদাদ নগরী নির্মাণ

খলিফা মানসুর আব্বাসি খিলাফতের মূলকেন্দ্র হিসেবে বাগদাদ নগরীর নির্মাণ শুরু করেন এবং ১৪৬ হিজরি সনে এর নির্মাণকাজ সমাপ্ত করেন। কথিত আছে, মানসুর বাগদাদ নির্মাণে আঠারো লক্ষ দিনার ব্যয় করেছিলেন।[৭৬]

---

৭৬. **বাগদাদ :** ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর রাযি.-এর খিলাফতকালে মুসলিম বাহিনী যখন ইরাক জয় করে, তখন বাগদাদ ছিল ক্ষুদ্র ও অখ্যাত একটি বসতি। উমর রাযি.-এর খিলাফতকালে ইরাকে কুফা ও বসরার মতো গুরুত্বপূর্ণ দুই নগরীর পত্তন হলেও বাগদাদ পূর্বের ন্যায় ছোট ও সাধারণ বসতিই রয়ে যায়। আল-মানসুর খলিফা হওয়ার পর অনিবার্য বিভিন্ন কারণে নতুন দারুল খিলাফাহ ও রাজধানী প্রতিষ্ঠার মনস্থ করেন। তিনি নতুন রাজধানীর স্থান নির্বাচনের জন্য কুফা হতে মসুল পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা ভ্রমণ করে অবশেষে বাগদাদ এলাকাকে পছন্দ করেন। বাগদাদকে পছন্দ করার কারণ ছিল—এর এক দিকে ছিল দজলা নদী আর অপর দিকে ফুরাত নদী। দজলা নদীর মাধ্যমে চীনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন সহজ ছিল আর ফুরাত নদীর কারণে শাম অঞ্চলের সঙ্গেও যোগাযোগ রক্ষা সম্ভব ছিল। খলিফা মানসুরের নির্দেশে দজলা নদীর পূর্ব তীরে নির্মিত হয় বাগদাদ নগরী। পরবর্তী সময়ে মানসুর-পুত্র মাহদি নদীর পশ্চিম তীরে সেনাছাউনি স্থাপন করেন এবং ধীরে ধীরে নদীর পশ্চিম তীরও বাগদাদ নগরীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত অংশের নামকরণ করা হয় 'কারখ' (Karkh) আর পূর্ব তীরে অবস্থিত অংশের নামকরণ করা হয় 'রুসাফা' (Al-Rusafa)। বর্তমানেও এলাকা-দুটির এই নামই প্রচলিত আছে।=

খতিব বাগদাদি রহ. লিখেছেন,

> মর্যাদা ও আভিজাত্যে, বিশালতা ও জৌলুসে, জ্ঞানী-গুণী ও বোদ্ধামহলের আধিক্যে পৃথিবীতে বাগদাদের সমকক্ষ দ্বিতীয় কোনো নগরী ছিল না।[৭৭]

মানসুর ইসলামি বিশ্বের প্রত্যেক অঞ্চল ও নগরী হতে আলিমদেরকে এনে বাগদাদে সমবেত করেন। আব্বাসি শাসনামলে বাগদাদ পৃথিবীর প্রাণকেন্দ্র, সর্বশ্রেষ্ঠ নগরী এবং ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতির সূতিকাগারে পরিণত হয়। একসময় বাগদাদের জনসংখ্যা বিশ লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

খলিফা মানসুরের গুণ-বৈশিষ্ট্য, চরিত্র ও অন্যান্য বিবরণ

খলিফা মানসুর ছিলেন শক্তিপ্রয়োগ ও কঠোরতা, দৃঢ়তা ও অটলতা এবং সতর্কতা ও চাতুর্যে বনু আব্বাসের শীর্ষতম শাসক। তিনি দিনের শুরুতে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান, গভর্নরদের কর্মকাণ্ডের খোঁজখবর, গভর্নর ও কর্মকর্তা নিয়োগ-বিয়োগ, সীমান্ত নগরীগুলোর প্রয়োজনীয় রসদ ও নিরাপত্তারক্ষী প্রেরণ, পথঘাটের নিরাপত্তাবিধান, খারাজ ও দরিদ্রদের তত্ত্বাবধান এবং জনকল্যাণমূলক অন্যান্য কাজকর্ম সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতেন। জোহর নামাজ আদায় করে বাড়িতে গিয়ে আছর পর্যন্ত বিশ্রাম করতেন। আছর নামাজ আদায় করে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বসতেন এবং তাদের ব্যক্তিগত বিভিন্ন প্রয়োজনের কথা শুনতেন। এশার নামাজ আদায় করার পর বিভিন্ন অঞ্চল ও সীমান্তনগরী থেকে আগত চিঠিপত্র পাঠ করতেন এবং তার সঙ্গে অবস্থানরত উপদেষ্টাগণের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি নিয়ে পরামর্শ করতেন। রাতের এক-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হলে উপদেষ্টারা চলে যেত, তিনি শয্যাগ্রহণ করতেন। রাতের দুই-তৃতীয়াংশ শেষ হলে তিনি শয্যাত্যাগ করে অজু করতেন এবং সুবহে সাদিক পর্যন্ত

=ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, জনৈক পারস্য সম্রাট তার আস্থাভাজন এক ক্রীতদাসকে উক্ত এলাকা জায়গির হিসেবে দান করেছিলেন। উক্ত ক্রীতদাস 'বাগ' নামক একটি মূর্তির পূজা করত। জায়গির প্রাপ্ত হওয়ার পর সে বলে ওঠে, 'বাগদাদ!' (বাগপ্রদত্ত); অর্থাৎ আমার মূর্তি বাগ আমাকে এ এলাকাটি দান করেছে। এভাবেই এলাকাটির নাম হয়ে যায় বাগদাদ। খলিফা মানসুর প্রাচীন সেই ছোট্ট বসতির স্থানে রাজধানী নগরী নির্মাণ করার পর এর নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম রাখেন 'মদিনাতুস সালাম' বা শান্তির নগরী।

৭৭. আবু বকর খতিব বাগদাদি, *তারিখু বাগদাদ*, ১/৪৪০।

নামাজে নিমগ্ন থাকতেন। সুবহে সাদিকের পর বের হয়ে মসজিদে যেতেন এবং ফজর নামাজ পড়াতেন। এরপর ফিরে এসে প্রাসাদে বসতেন।

খলিফা মানসুর যৌবনে ইলমের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে ইলম অর্জন করেন এবং হাদিস ও ফিকহশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ঐতিহাসিকগণ মানসুরের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে নিচের চমকপ্রদ ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন, যা দ্বারা ইলমের প্রতি তার প্রবল অনুরাগের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়।

একদিন তাকে প্রশ্ন করা হলো, 'আমিরুল মুমিনিন! এমন কোনো দুর্লভ বস্তু কি আছে, যার স্বাদ আপনি আজও উপভোগ করতে পারেননি?'

খলিফা উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, একটি জিনিস আছে।'

সভাসদগণ বিস্ময়ভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'কী সেই বস্তু?!'

'হাদিসের তালিবে ইলম যখন তার শায়খকে প্রশ্ন করে, "মুহতারাম, আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করুন; আপনি কার নাম যেন বললেন?" খলিফা উত্তর দিলেন।

অর্থাৎ হাদিস-শিক্ষার্থী যখন তার শিক্ষকের কাছে রাবি ও বর্ণনাকারীর নাম জানতে চায়, তখন শিক্ষক যে আত্মিক স্বাদ অনুভব করেন, খলিফা জীবনে তা কখনো লাভ করেননি বলে অনুতাপ করছেন!

পরদিন আব্বাসি রাজদরবারের সকল উজির, লিপিকার ও সচিবগণ দরবারে সমবেত হয়ে শিক্ষার্থীদের মতো বসে পড়ল এবং খলিফাকে নিবেদন করল, 'আমিরুল মুমিনিন যদি অনুগ্রহ করে আমাদেরকে কিছু হাদিস লিখিয়ে দিতেন।'

মানসুর উত্তর দিলেন, 'তোমরা তো হাদিসের প্রকৃত শিক্ষার্থী নও (যাদের ইলমের পিপাসা ও জিজ্ঞাসা আমাকে আত্মিক তৃপ্তি দান করবে)! হাদিসের শিক্ষার্থী তো তারা, যাদের পরিচ্ছদ হবে ধূলিমলিন, পদযুগল হবে অধিক পদচারণায় ভগ্ন-ছিন্ন, মাথার চুল হবে এলোমেলো-প্রলম্বিত; ইলমের অন্বেষণে যারা ছুটে বেড়ায় পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে, পাড়ি দেয় দূরদূরান্তের পথ; কখনো ইরাকে, কখনো হিজাযে; আবার কখনো শামে, কখনো-বা ইয়ামেনে। তারাই হলো হাদিসের বর্ণনাকারী ও শিক্ষার্থী।'

ঐতিহাসিকগণ মানসুরের কীর্তি ও অবদান, ধৈর্য ও সহনশীলতা, মার্জনা ও সুশাসন, নিজ পুত্র মাহদিকে ওলিয়ে আহদ (ভবিষ্যৎ খলিফা) ঘোষণার পূর্বে দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত হিসেবে গড়ে তোলা ইত্যাদি অনেক গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আবু মুসলিম খোরাসানি ও আপন চাচা আবদুল্লাহ বিন আলিকে নিরাপত্তাপ্রতিশ্রুতি প্রদানের পরও তাদের সঙ্গে কৃত প্রতারণা তার কর্মজীবনের অন্যতম অন্যায় হিসেবে ইতিহাসের পাতায় চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

খলিফা মানসুরের আমলে বিজয়াভিযান

খলিফা মানসুরের শাসনামলে নিষ্পত্তিমূলক কোনো বিজয়াভিযানের ঘটনা ঘটেনি। তার আমলে পরিচালিত অভিযানগুলো মূলত ছিল আগে থেকেই চলমান ধারাবাহিক বিজয়াভিযানের অংশ। বরং তার খিলাফতকালে মুসলমানদের পারস্পরিক বিবাদবিসংবাদের সুযোগ কাজে লাগিয়ে রোমানরা মাঝেমধ্যেই আব্বাসি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন সীমান্তশহরে হামলা চালানোর দুঃসাহস দেখাত। মানসুরের আমলেই বাইজান্টাইন সম্রাট পঞ্চম কনস্টান্টাইন (Constantine V) মালাতিয়া (Malatya) অঞ্চলে অভিযান চালিয়ে জোরপূর্বক প্রবেশ করেন এবং নগরপ্রাচীর ধ্বংস করে মুসলিম সাম্রাজ্যের দিকে অগ্রসর হন।

অবশ্য ততদিনে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ অনেকটা স্তিমিত হয়ে এসেছিল। তাই রোমানদের অভিযানের বিষয়ে অবগত হওয়ামাত্র মানসুর নতুন করে বিজয়াভিযান শুরু করেন। মুসলিম বাহিনী বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের কিছু অংশে নিজেদের কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়।

এ ছাড়াও আবু জাফর আল-মানসুর ১৪১ হিজরি সনে তাবারিস্তানে (Tabaristan) অভিযান পরিচালনার জন্য তার পুত্র আল-মাহদিকে প্রেরণ করেন।

১৫১ হিজরি সনে খলিফাপুত্র মাহদি যখন খোরাসান থেকে ফিরে আসেন, তখন খলিফা মানসুর পুত্রের জন্য বাগদাদের পূর্ব প্রান্তে রুসাফা নগরীর নির্মাণ শুরু করেন। তিনি রুসাফাকে নিরাপত্তাপ্রাচীর ও পরিখা দ্বারা বেষ্টিত করে দুর্ভেদ্য করে তোলেন। এ বছরই মানসুর প্রথমে তার পক্ষে বায়আতের পুনঃনবায়ন করেন; তারপর তার অবর্তমানে পর্যায়ক্রমে পুত্র মাহদি ও ভ্রাতুষ্পুত্র ঈসা বিন মুসার নামে বায়আত গ্রহণ করে তাদের

দুজনকে পরবর্তী পর্যায়ক্রমিক ওলিয়ে আহদ ঘোষণা করেন। অথচ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পূর্বতন খলিফা সাফফাহ ঈসা বিন মুসাকে[৭৮] মানসুরের পরবর্তী খলিফা ঘোষণা করেছিলেন।

খলিফা মানসুর তেষট্টি বছর বয়সে ১৫৮ হিজরি সনে হজের সফরে পথিমধ্যে ইন্তেকাল করেন এবং মক্কায় সমাহিত হন। খলিফার হাজিব[৭৯] রাবি' বিন ইউনুস বনু হাশিমের নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে মাহদির খিলাফতের বায়আত গ্রহণের আগ পর্যন্ত মানসুরের মৃত্যুসংবাদ গোপন রাখেন। বায়আত সম্পন্ন হওয়ার পর তাকে দাফন করা হয়।

ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন, খলিফা আবু জাফর আল-মানসুরের জীবনের শেষ উক্তি ছিল—'হে আল্লাহ, আপনার সাক্ষাতের সময় আমাকে বরকত দান করুন।'

---

৭৮. পরপর দুজন খলিফা কর্তৃক ওলিয়ে আহদ (ভবিষ্যৎ খলিফা) ঘোষিত হলেও শেষ পর্যন্ত ঈসা বিন মুসা খিলাফতের দায়িত্ব লাভ করতে পারেননি। তৃতীয় আব্বাসি খলিফা আল-মাহদিও তাকে পরবর্তী খলিফা হওয়ার অধিকার হতে বঞ্চিত করে তার পরিবর্তে নিজ পুত্রকে ওলিয়ে আহদ ঘোষণা করার ইচ্ছা করেন। মাহদির উপর্যুপরি চাপ ও প্রস্তাবের মুখে নতি স্বীকার করে শেষ পর্যন্ত ঈসা বিন মুসা নিজের অধিকার প্রত্যাহার করে নেন। তিনি মাহদির শাসনামলেই ১৬৬ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন।

৭৯. তৎকালে প্রধান রাজপ্রহরীকে 'হাজিব' বলা হতো। হাজিব পদধারী ব্যক্তি খলিফার মূল পরামর্শক ও উপদেষ্টা বিবেচিত হতেন। হাজিবের পদমর্যাদা অনেকটা আধুনিক কালের (প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির রাষ্ট্রব্যবস্থার) প্রধানমন্ত্রীর সমপর্যায়ের ছিল।

আল-মাহদি আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন মানসুর বিন মুহাম্মাদ বিন আলি বিন আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি.

[জিলহজ ১৫৮ হিজরি—মুহাররম ১৬৯ হিজরি]
[অক্টোবর ৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দ—জুলাই ৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দ]

তৃতীয় আব্বাসি খলিফা মাহদির জন্ম ১২৭ হিজরি সনে। খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণকালে তার বয়স ছিল একত্রিশ বছর।

মাহদির খিলাফত আমল ছিল জনগণবান্ধব। মানসুরের আমলে যারা তার বিরোধী পরিচয়ে কারাগারে বন্দি ছিল, মাহদি তাদেরকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। জুলুম-অত্যাচারের বিচারের জন্য তিনি নিজেই বসতেন। ফলে তার আমলে সভ্যতা ও বসতির বিস্তৃতির পাশাপাশি রাষ্ট্রের জীবনযাত্রা ও জনজীবনও শৃঙ্খলাপূর্ণ ছিল। তার অন্যতম উল্লেখযোগ্য কীর্তি হলো মসজিদে হারামের পরিসর বৃদ্ধি। তিনি মসজিদে হারামকে বেষ্টন করে রাখা অনেকগুলো বাড়ি মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং মসজিদে নববির দেয়াল থেকে উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিকের নাম মুছে নিজের নাম উৎকীর্ণ করার নির্দেশ দেন।

প্রকৃতপক্ষে পূর্বতন খলিফা মানসুরই পুত্র মাহদির জন্য পরিস্থিতি মজবুত করে দিয়ে গিয়েছিলেন। তিনিই সকলকে তার বশীভূত করে যান এবং পরবর্তীদের জন্য শৃঙ্খলাপূর্ণ সাম্রাজ্যের ব্যবস্থা করে যান।

খলিফা মাহদি তার পুত্রদেরকে নিয়মিত যুদ্ধাভিযানে প্রেরণ করতেন। ১৬৩ হিজরি সনে তিনি পুত্র হারুনুর রশিদকে খোরাসানের এক বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে যুদ্ধাভিযানে প্রেরণ করেন। সঙ্গে পাঠান খালিদ বিন বারমাককে। অভিযানে হারুনুর রশিদ শত্রুপক্ষকে পর্যুদস্ত করে প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অর্জন করেন। অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর মাহদি হারুনুর রশিদকে আব্বাসি সাম্রাজ্যের পশ্চিম অংশের গভর্নরপদ প্রদান করেন।

মাহদির খিলাফত আমলে সম্প্রসারণমূলক উল্লেখযোগ্য কোনো অভিযান সংঘটিত হয়নি এবং বড় কোনো নগরী নতুন করে ইসলামি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তবে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যেসব অভিযান পরিচালিত হয়েছে, সেগুলোতে নিরঙ্কুশ বিজয় ও প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অর্জিত হয়েছে।

১৬৫ হিজরি সনে মাহদি তার পুত্র হারুনুর রশিদকে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত করেন এবং তার সঙ্গে আব্বাসি সেনাবাহিনীর বড় একটি অংশকে প্রেরণ করেন। ১৬৬ হিজরি সনে হারুনুর রশিদ রোমান ভূমি থেকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং যথেষ্ট জাঁকজমক ও আড়ম্বরের সঙ্গে বাগদাদে প্রবেশ করেন। এ সময় পরাজিত রোমানরা স্বর্ণ ও অন্যান্য জিজিয়া বহন করে বাগদাদে নিয়ে আসে।

১৬৭ হিজরি সনে মাহদি তার আরেক পুত্র মুসা আল-হাদিকে আরেকটি বড় বাহিনীসহ জুরজান অভিমুখে প্রেরণ করেন। ঐতিহাসিকগণ মন্তব্য করেছেন, এত বড় বাহিনী ইতিপূর্বে দেখা যায়নি।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, এই বাহিনীকে প্রেরণ করার সময় প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু প্রবাহিত হতে শুরু করে। তখন মাহদি একটি ঘরে প্রবেশ করে মাটির সঙ্গে নিজের গণ্ডদেশ মিশিয়ে দোয়া করতে থাকেন—হে আল্লাহ, এই শাস্তির লক্ষ্য যদি অন্যান্য মানুষ না হয়ে আমিই হয়ে থাকি, তাহলে এই যে আমি আপনার সামনে দণ্ডায়মান! হে আল্লাহ, আমার বিরুদ্ধে বিধর্মী দুশমনদের আনন্দিত করবেন না।

তিনি এভাবে দোয়া করছিলেন; এরই মধ্যে আবহাওয়া শান্ত হয়ে যায়।

খলিফা আল-মাহদির সুপ্রশাসননীতি

একদিন জনৈক ব্যক্তি একজোড়া পাদুকা নিয়ে মাহদির দরবারে উপস্থিত হয়ে বলল, 'এগুলো নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাদুকা; আপনার জন্য হাদিয়া নিয়ে এসেছি।' মাহদি পাদুকাজোড়া হাতে নিয়ে তাতে চুমু খেলেন, চোখে-মুখে ভক্তিভরে স্পর্শ করলেন এবং লোকটিকে দশ হাজার দিরহাম প্রদান করার নির্দেশ দিলেন। লোকটি চলে গেলে মাহদি বললেন, 'আল্লাহর শপথ! আমি নিশ্চিতভাবেই জানি যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ পাদুকাজোড়া পরিধান করা দূরে থাক, দেখেনওনি। কিন্তু আমি যদি তাকে ফিরিয়ে দিতাম, সে

মানুষের কাছে গিয়ে বলত, আমি তাকে নবীজির পাদুকাজোড়া হাদিয়া দিয়েছিলাম; কিন্তু তিনি তা ফিরিয়ে দিয়েছেন। মানুষ তার কথা বিশ্বাসও করত। কারণ, সাধারণ জনগণ এদের প্রতি দুর্বল থাকে। জনসাধারণের ধর্ম হলো শক্তিশালীর বিরুদ্ধে দুর্বলকে সমর্থন করা; এমনকি দুর্বল অত্যাচারী ও অন্যায়কারী হলেও। তাই আমি দশ হাজার দিরহামের বিনিময়ে তার মুখ কিনে নিলাম। আমার কাছে এটিই শ্রেয়তর ও সঠিকতর মনে হয়েছে।'

খলিফা মাহদি ধর্মত্যাগী মুরতাদদের অনুসন্ধান করতেন এবং তাদেরকে হত্যাশাস্তি প্রদান করতেন।

সারকথা, খলিফা মুহাম্মাদ আল-মাহদির কৃতিত্ব ও সৎকর্মের ফিরিস্তি অনেক দীর্ঘ, আলোচ্য গ্রন্থ যা বিস্তারিত আলোচনার ক্ষেত্র নয়। এই মহান খলিফা ১৬৯ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন। ইন্তেকালের পূর্বেই তিনি পুত্র মুসা আল-হাদিকে পরবর্তী খলিফা হিসেবে মনোনীত করে যান।

আল-হাদি আবু মুহাম্মাদ মুসা বিন মাহদি বিন মানসুর বিন মুহাম্মাদ

[মুহাররম ১৬৯ হিজরি—রবিউল আউয়াল ১৭০ হিজরি]
[জুলাই ৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দ—সেপ্টেম্বর ৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দ]

খলিফা আল-হাদি ১৪৬ হিজরি সনে রায় নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর ১৬৯ হিজরি সনে তেইশ বছর বয়সে তিনি খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনিও আপন পিতার ন্যায় ধর্মত্যাগী মুরতাদদের বিরুদ্ধে কঠোর ছিলেন।

ফাখখের যুদ্ধ

হাদির শাসনামলে হুসাইন বিন আলি বিন হাসান (৩য়) বিন হাসান (২য়) বিন হাসান (১ম) বিন আলি বিন আবু তালিবের নেতৃত্বে আলাবিদের বিদ্রোহ প্রচেষ্টা সংঘটিত হয়। হুসাইন বিন আলি মদিনায় অবস্থান করে বিদ্রোহের ডাক দেন। কিন্তু দীর্ঘ নয় মাস আঠারো দিন যুদ্ধ করার পর তিনি খলিফা হাদির প্রেরিত বাহিনীর হাতে নিহত হন। এ যুদ্ধকে ফাখখের যুদ্ধ বলা হয়। যুদ্ধ চলাকালেই হুসাইন বিন আলির পক্ষে যুদ্ধরত তার জ্ঞাতিভাই ইদরিস বিন আবদুল্লাহ বিন হাসান (২য়) বিন হাসান (১ম) বিন আলি বিন আবু তালিব যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে পড়েন এবং প্রথমে মিশরে এবং পরে মাগরিবে চলে যান। পরবর্তীকালে তিনি মাগরিব অঞ্চলে ইদরিসিয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন, যার বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসবে।

খলিফা হাদি অত্যন্ত আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি রাষ্ট্রের সেনাপতি ও গুরুত্বপূর্ণ কমকর্তাদেরকে তার মা খাইজারানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। অথচ ইতিপূর্বে খলিফা মাহদির শাসনামলে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে খাইজারানের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ও ভূমিকা ছিল। ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন, খাইজারান হাদিকে খলিফাপদ না

প্রদানের জন্য মাহদিকে অনুরোধ করেছিলেন। উল্লিখিত কারণে হাদি তার ভাই (ও পরবর্তী খলিফা) হারুনুর রশিদের প্রতিও অসদাচরণ করতেন। তা ছাড়া তিনি চাচ্ছিলেন তার পরবর্তী খলিফা হিসেবে হারুনুর রশিদকে বাদ দিয়ে নিজ পুত্র জাফরকে মনোনীত করতে। নিন্দুক ও দুষ্ট লোকেরা এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে হাদি ও হারুনুর রশিদ—দুই ভাইয়ের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টিতে তৎপর হয়।

খলিফা হাদি রাষ্ট্রশাসনে বিচক্ষণ ও পারদর্শী ছিলেন এবং দানশীল ছিলেন। তার একটি বিখ্যাত উক্তি হলো—'অপরাধীর শাস্তি তরান্বিত করা এবং পদস্খলনকে মার্জনা করা একজন শাসকের জন্য অতি উত্তম আচরণ! এর ফলে শাসনক্ষমতার প্রতি অন্যদের লোভ কমে যায়।' হাদি মনে করতেন যে, শাসক ও খলিফার জন্য জনগণের ও জনসমস্যার পাশে সহাবস্থানেই জনগণের কল্যাণ। তিনি তার হাজিব ফজল বিন রবিকে নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, 'জনগণকে আমার থেকে দূরে রাখবে না। কারণ, তখন আমি বরকত-বঞ্চিত হয়ে যাব।' হাদি অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন। তিনি যখন বাহনে আরোহণ করতেন, তখন তার গায়ে দুটি বর্ম থাকত।

অবশ্য খলিফা মুসা আল-হাদি দীর্ঘদিন শাসনক্ষমতা পরিচালনা করতে পারেননি। ক্ষমতালাভের বছরখানেক পরই ১৭০ হিজরি সনের রবিউল আউয়াল মাসে তিনি ইন্তেকাল করেন। তার ভাই হারুনুর রশিদ তার জানাজা পড়ান।

৫ নং আব্বাসি খলিফা

আর-রশিদ আবু জাফর হারুন বিন মাহদি বিন মানসুর বিন মুহাম্মাদ

[রবিউল আউয়াল ১৭০ হিজরি—জুমাদাল উখরা ১৯৩ হিজরি]
[সেপ্টেম্বর ৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দ—মার্চ ৮০৯ খ্রিষ্টাব্দ]

পঞ্চম আব্বাসি খলিফা হারুনুর রশিদ ১৪৯ হিজরি সনে রায় নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তার ভাই আল-হাদির মৃত্যুর পর ১৭০ হিজরি সনে একুশ বছর বয়সে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

হারুনুর রশিদের কিছু কীর্তি ও বৈশিষ্ট্য

- তিনি ছিলেন নামাজ-অনুরাগী; প্রচুর নফল নামাজ পড়তেন।[৮০]
- খলিফা হারুনুর রশিদ নিজ শাসনামলে মোট নয়বার হজ আদায় করেন। সনগুলো হলো যথাক্রমে : ১৭০, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৭, ১৮০, ১৮১, ১৮৬ ও ১৮৮ হিজরি সন।
- তিনি যে বছর নিজে হজের সফরে যেতেন, আব্বাসি সাম্রাজ্যের ফুকাহায়ে কেরাম ও তাদের সন্তানদের বড় একটি কাফেলাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। আর যে বছর হজে যেতেন না, সে বছর তিনশ মানুষকে পূর্ণ খরচ ও উত্তম পরিচ্ছদ দিয়ে তার পক্ষ থেকে হজে পাঠাতেন।
- প্রসিদ্ধ আছে—তিনি এক বছর হজে যেতেন, আরেক বছর বিজয়াভিযানে বের হতেন।

---

৮০. ঐতিহাসিক ইবনে কাছির রহ. উল্লেখ করেছেন, খলিফা হারুনুর রশিদ প্রতিদিন নিজ সম্পদ হতে এক হাজার দিরহাম সদকা করতেন এবং প্রতিদিন একশ রাকাত নফল নামাজ পড়তেন। দ্রষ্টব্য : ইবনে কাছির দিমাশকি, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ১০/২১৪।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইমাম তাবারি রহ. বলেন—তিনি সশরীরে সাতবার বিজয়াভিযানে অংশগ্রহণ করেছেন আর স্থলে ও নৌপথে জিহাদের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন বিশটি বাহিনী।

খলিফা হারুনুর রশিদের কীর্তি ও অবদান এবং মাহাত্ম্য ও গুণ-বৈশিষ্ট্যের বিবরণ সুদীর্ঘ। বিখ্যাত বুজুর্গ ফুজায়ল বিন ইয়াজ রহ. বলতেন, 'অন্য কারও মৃত্যু আমার কাছে হারুনুর রশিদের মৃত্যু অপেক্ষা কঠিন নয়। কেননা, তার অবর্তমানে আমি বহু কঠিন সংকট ও ফিতনার আশঙ্কা করছি। এজন্য আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি—তিনি যেন আমার আয়ু হ্রাস করে তার আয়ু বৃদ্ধি করে দেন।'

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, যখন হারুনুর রশিদের মৃত্যু হয় এবং আশঙ্কাকে সত্যে পরিণত করে বাস্তবেই বিভিন্ন সংকট ও ফিতনা, বিরোধ ও বিশৃঙ্খলা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে; এমনকি কুরআন সৃষ্ট (মাখলুক)-মতবাদ প্রকাশ পায়, তখন আমরা ফুজায়ল বিন ইয়াজ রহ.-এর আশঙ্কা ও দুশ্চিন্তার যথার্থতা অনুধাবন করতে সক্ষম হই।

হারুনুর রশিদের শাসনামলে বারমাকি পরিবারের দুর্যোগ

উমাইয়া শাসনামলের শেষদিকে খোরাসানে যখন আব্বাসি আন্দোলনের প্রচারণা শুরু হয়, তখন খালিদ বিন বারমাক ছিলেন খোরাসানে উক্ত আন্দোলনের অন্যতম প্রধান আহ্বায়ক। এ কারণেই প্রথম আব্বাসি খলিফা আবুল আব্বাস আস-সাফফাহ তাকে আপন মন্ত্রিসভায় (উজির পর্ষদে) স্থান দেন। আপন গুণ-চরিত্র ও কর্মদক্ষতার কারণে আমৃত্যু ১৬৩ হিজরি পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন আব্বাসি খলিফার শাসনামলে বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত থেকে সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন।

খালিদ বিন বারমাকের পুত্র ইয়াহইয়া ছিলেন গুণ ও আভিজাত্য, ব্যক্তিত্ব ও ভাষাপাণ্ডিত্যে উচ্চস্তরের ব্যক্তি। ১৫৮ হিজরি সন হতে তিনিও আব্বাসি খিলাফতের বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত হতে থাকেন। পিতার ন্যায় তিনিও আব্বাসি শাসকপরিবারের অত্যন্ত প্রিয়ভাজন ছিলেন। হারুনুর রশিদকে তিনি প্রতিপালন করেছিলেন। এ কারণে হারুনুর রশিদ তাকে সবসময় 'বাবা' সম্বোধন করতেন। ইয়াহইয়াই হাদির অনিচ্ছাসত্ত্বেও হারুনুর রশিদকে খিলাফতের দায়িত্বপ্রাপ্তিতে সহায়তা করেছিলেন।

খলিফা হওয়ার পর হারুনুর রশিদ ইয়াহইয়াকে প্রধান উজিরের পদ প্রদান করেন। রাষ্ট্রের যাবতীয় নিয়োগ ও বিয়োগদানের ক্ষমতাও তার হাতে তুলে দেওয়া হয়। হারুনুর রশিদ তাকে বলেন, 'আমি জনগণের দায়িত্ব আপনার কাছে দিয়ে দিলাম। আপনি যা ভালো মনে করবেন, তাই কার্যকর করার নির্দেশ দেবেন; যাকে ভালো মনে করবেন, নিয়োগ দেবেন; যাকে প্রয়োজন মনে করবেন, বরখাস্ত করবেন।'

বারমাকি পরিবারের বংশলতিকা

খালিদ বিন বারমাক (মৃত্যু : ১৬৩ হি.)

↓

ইয়াহইয়া বিন খালিদ (মৃত্যু : ১৯০ হি.)

- ১ ফজল (মৃত্যু : ১৯৩ হি.) (উদ্ধত ও রূঢ় স্বভাববিশিষ্ট ছিলেন)।
- ২ জাফর (মৃত্যু : ১৮৭ হি.) (খলিফা হারুনুর রশিদ তাকে অত্যন্ত ভালো জানতেন। কোমল স্বভাবের জাফরকে খলিফা ১৭৬ হি. সনে মিশরের গভর্নর নিযুক্ত করেন)।
- ৩ মুসা (দুঃসাহসী যোদ্ধাপুরুষ ছিলেন; তবে প্রসিদ্ধি কম ছিল)।
- ৪ মুহাম্মাদ (উচ্চাভিলাষী ছিলেন; তারও তেমন প্রসিদ্ধি ছিল না)।

১৮৪ হিজরি সনে হারুনুর রশিদ তার পুত্র ও ভাবী খলিফা মুহাম্মাদ আল-আমিনের পর পরবর্তী দ্বিতীয় খলিফা হিসেবে আবদুল্লাহ আল-মামুনের নামে জনগণের বায়আত গ্রহণ করেন এবং আল-মামুনের তত্ত্বাবধানের ভার ইয়াহইয়ার পুত্র জাফরের হাতে সোপর্দ করেন।

বারমাকি পরিবার খলিফা হারুনুর রশিদের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ও নিকটভাজন ছিল। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে তারা খলিফাকে সহায়তা করত। এ কারণেই ঐতিহাসিকগণ বারমাকি পরিবারকে 'আব্বাসি সাম্রাজ্যের পুষ্প' নামকরণ করেছিলেন। তারা সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিত, সীমান্তশহরগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করত এবং রাষ্ট্রের যাবতীয় স্বার্থরক্ষায় সচেষ্ট থাকত।

কিন্তু হঠাৎ করেই খলিফা হারুনুর রশিদ বারমাকি পরিবারের প্রতি রুষ্ট হয়ে ওঠেন এবং তাদের সঙ্গে কঠোর আচরণ শুরু করেন। কিন্তু এর প্রকৃত কারণ কী ছিল, তা সুনিশ্চিত নয়। ঐতিহাসিকগণও এ বিষয়ে বিভিন্নমুখী মত উল্লেখ করেছেন। সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মত হলো, এই গুণী পরিবারটি নিজেদের যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতার কারণে সম্মান ও মর্যাদার শীর্ষতম চূড়ায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল। আর সবসময়ই সমাজে হিংসুক ও বক্র হৃদয়ের এমন কিছু লোক থাকে, যারা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ দেখতে চায় না; অন্য কেউ আপন চেষ্টা ও পরিশ্রম, ত্যাগ ও সাধনার মাধ্যমে উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবে—এটা তারা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। বিদ্বেষ ও বিরাগের বশবর্তী হয়ে তারা নানারকম কূটকৌশলের আশ্রয় নেয় এবং কানকথা, পরনিন্দা ও কুৎসা রটনার মাধ্যমে যোগ্য ব্যক্তিদেরকে অপদস্থ করার চেষ্টা চালিয়ে যায়। এ জাতীয় কারও কানকথায় প্রভাবিত হয়েই হয়তো খলিফা হারুনুর রশিদ বারমাকিদের প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

এ বিষয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য ও সঠিক বর্ণনা সম্ভবত এই যে, জাফর বিন ইয়াহইয়া বারমাকি হারুনুর রশিদের কারাগার থেকে ইদরিসি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ইদরিস বিন আবদুল্লাহর সহোদর ইয়াহইয়া বিন আবদুল্লাহ বিন হাসানকে পালাতে সহায়তা করেছিলেন। ইয়াহইয়া নবীবংশের লোক হওয়ায় জাফর তার প্রতি হৃদ্যতা পোষণ করতেন। অধিকন্তু কতক ঐতিহাসিকের মতে বারমাকি পরিবার শিয়াঘেঁষা ছিল। হারুনুর রশিদের আস্থাভাজন উজির ফজল বিন রবি[৮১] পূর্ব থেকেই বারমাকি পরিবারের প্রতি বিক্ষুব্ধ ছিলেন এবং তাদের বিরুদ্ধে খলিফাকে খ্যাপিয়ে তোলার জন্য উপযুক্ত সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিলেন। তিনি একজন গুপ্তচরকে জাফর বিন ইয়াহইয়ার পেছনে লাগিয়ে রেখেছিলেন। গুপ্তচর মারফত জাফর কর্তৃক ইয়াহইয়াকে কারাগার থেকে পালিয়ে যেতে সহায়তা করার সংবাদ

---

৮১. খলিফা হারুনুর রশিদ ফজল বিন রবির যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতায় অত্যন্ত মুগ্ধ ছিলেন। কিন্তু খলিফা-মাতা খাইজুরান তাকে কোনো পদ প্রদান করতে খলিফাকে নিষেধ করেন। ১৭৩ হিজরি সনে খলিফা-মাতার ইন্তেকাল হলে খলিফা তাকে উজির পদে নিয়োগ দান করেন। ফজল বিন রবি ইয়াহইয়া বিন আবদুল্লাহ বিন হাসানকে অপছন্দ করতেন এবং সর্বদা খলিফাকে সতর্ক করতেন যে, ইয়াহইয়া সুযোগ পেলেই নিজেকে খলিফা দাবি করবেন। উল্লেখ্য, ফজল বিন রবির পিতা রবি বিন ইউনুস ছিলেন পূর্বতন খলিফা আল-মানসুরের হাজিব। [মূল গ্রন্থের টীকা]

পাওয়ার পর ফজল বিন রবি কালবিলম্ব না করে তা খলিফাকে অবহিত করেন। ফজল বিন রবিকে হতাশ করে খলিফা বলেন, 'ধিক তোমাকে! জাফর কী করে-না করে, তাতে তোমার কী? সে তো আমার নির্দেশেও এ কাজ করতে পারে।' হারুনুর রশিদের উত্তর শুনে ফজল বিন রবি বিরসবদনে ফিরে যান। কিছুক্ষণ পর খলিফার বন্ধু জাফর বিন ইয়াহইয়া বারমাকি উপস্থিত হলে খলিফা তাকে দুপুরের খাবারের দাওয়াত করেন। দুপুরে খেতে বসে উভয়ে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলছিলেন। শেষদিকে খলিফা ইয়াহইয়া বিন আবদুল্লাহর প্রসঙ্গ তুলে জিজ্ঞেস করেন—'ইয়াহইয়া বিন আবদুল্লাহর কী খবর?'

'আমিরুল মুমিনিন, আগের মতোই কারাগারে শৃঙ্খলিত অবস্থায় আছে।' জাফর সংক্ষেপে উত্তর দেন।

'আমার প্রাণের কসম করে এ কথা বলতে পারবে?' খলিফা প্রশ্ন করেন।

খলিফার প্রশ্ন শুনে জাফর থমকে যান এবং বুঝে ফেলেন যে, নিশ্চয়ই খলিফা ইয়াহইয়ার পলায়নের বিষয়টি জেনে ফেলেছেন। তাই তিনি লুকোছাপা না করে উত্তর দেন, 'না, আমার মালিক! আপনার প্রাণের কসম করে বলতে পারব না। আসলে আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। আমার বিশ্বাস—তার প্রাণ ও প্রাণশক্তির কিছুই অবশিষ্ট নেই এবং অশুভ কিছু করার ক্ষমতাও তার নেই।'

জাফরের স্বীকারোক্তি শুনে হারুনুর রশিদ মন্তব্য করেন, 'তুমি ভালোই করেছ। আমি তার বিষয়ে যা ভাবছিলাম, তুমি তার বিপরীত কিছু করোনি।'

জাফর বিন ইয়াহইয়া বারমাকি যখন মজলিস ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, খলিফা তার দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থেকে আনমনে বলে ওঠেন—'তোমাকে যদি হত্যা না করি, আল্লাহ যেন আমাকে আমার নির্বুদ্ধিতা ও বিভ্রান্তির কারণে হিদায়াতের তরবারি দিয়ে হত্যা করেন।'

এরপর জাফরের পরিণতি যা হওয়ার, তা-ই হয়েছিল।

এ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই বারমাকি পরিবারের প্রতি এই অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় যে, তারা আব্বাসি খিলাফতের মন্ত্রিপরিষদের বিশেষ অবস্থানে অধিষ্ঠিত থেকে সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে কাজ করছে। নিঃসন্দেহে এটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটি অভিযোগ। হারুনুর রশিদের মনে এ

বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, বারমাকিরা খলিফার স্বার্থের ওপর আলাবিদের স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়। খলিফা হারুনুর রশিদের কাছে এ অপরাধ ধর্মত্যাগের অপরাধের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না। এ ঘটনার ফলে খলিফা হারুনুর রশিদ ও বারমাকি পরিবারের মাঝের আস্থার সম্পর্কটি ছিন্ন হয়ে যায়। এরপর থেকে খলিফা তাদের যেকোনো ত্রুটি জানতে পারলেই উত্তেজিত হয়ে যেতেন এবং সামান্য কারণেও তাদেরকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতেন। পরিস্থিতি এভাবেই চলছিল।

১৮৭ হিজরি সনে হারুনুর রশিদের হাতে বারমাকিদের চূড়ান্ত পতন ঘটে। জাফর বিন ইয়াহইয়া বিন খালিদ বারমাকি নির্মমভাবে নিহত হন। তার বাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় এবং বারমাকি পরিবারের ছোট-বড় সকলে দুর্দশার শিকার হয়।[৮২]

অবশ্য বারমাকি পরিবারের প্রতি কঠোর আচরণের কারণে খলিফা হারুনুর রশিদ পরবর্তীকালে অনুতপ্ত হয়েছিলেন। তিনি বলতেন, 'যারা আমাকে বারমাকিদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করেছে, আল্লাহ তাদের অভিসম্পাত করুন। তাদের অবর্তমানে আমি কোনো স্বাদ-শান্তি খুঁজে পাচ্ছি না। আল্লাহর শপথ! আমার অর্ধেক জীবন ও অর্ধেক রাজত্বের বিনিময়েও যদি তাদেরকে পূর্বাবস্থায় ফিরে পেতাম, তবে তাই করতাম।'

হারুনুর রশিদের শাসনামলে বিজয়াভিযান

খলিফা হারুনুর রশিদের আমলেই প্রথম নিকফোরাস (Nikephoros I) বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সম্রাট নির্বাচিত হন। সাম্রাজ্যের অধিপতি হওয়ার পর ১৯০ হিজরি সনে (৮০৬ খ্রিষ্টাব্দে) তিনি হারুনুর রশিদের কাছে নিম্নোক্ত পত্র প্রেরণ করেন।

> রোম সম্রাট নিকফোরাসের পক্ষ থেকে আরব-অধিপতি হারুনের প্রতি।—

---

৮২. খলিফা এ সময় ইয়াহইয়া বিন খালিদ ও তার জীবিত তিন পুত্র ফজল, মুসা ও মুহাম্মাদকে বন্দি করে রাক্কার কারাগারে প্রেরণ করেন। ইয়াহইয়া বিন খালিদ ১৯০ হিজরি সনের মুহাররম মাসে সত্তর বছর বয়সে কারাগারে ইন্তেকাল করেন। খলিফা হারুনুর রশিদের ইন্তেকালের পাঁচ মাস পূর্বে ১৯৩ হিজরি সনের মুহাররম মাসে ফজলও বন্দি অবস্থায় রাক্কার কারাগারে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। হারুনুর রশিদের মৃত্যুর পর তার পুত্র আমিন খলিফা হলে তিনি মুসা ও মুহাম্মাদকে মুক্তিদান করেন।

> পরকথা, আমার পূর্বে যিনি রোমান সাম্রাজ্যের অধিপতি[৮৩] ছিলেন, তিনি তোমাকে দাবার মন্ত্রী-ঘুঁটির ন্যায় মহান ও শক্তিশালী ভেবেছিলেন আর নিজেকে ভেবেছিলেন সৈন্য-ঘুঁটির ন্যায় অসহায় ও দুর্বল। তাই তিনি তোমার কাছে প্রচুর পরিমাণ অর্থসম্পদ প্রেরণ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তো উল্টো তোমারই কর্তব্য ছিল তার কাছে এরূপ অধিক পরিমাণ সম্পদ পাঠানো। আসলে এটি ছিল নারীসুলভ দুর্বলতা ও নির্বুদ্ধিতার ফসল। আমার প্রেরিত এ পত্র পাঠ করামাত্র তুমি তার প্রেরিত সব অর্থসম্পদ ফেরত পাঠাবে এবং আগামীর জন্য নিজের নিরাপত্তা-জামানত হিসেবে আরও সম্পদ পাঠাবে। যদি এর ব্যতিক্রম হয়, তাহলে তরবারিই তোমার ও আমাদের মাঝে ফয়সালা করবে।

পত্র পাঠ করার পর খলিফা হারুনুর রশিদ ক্রোধে অধীর হয়ে যান। কিছুক্ষণ পর তিনি পত্রের উল্টো পিঠে জবাবে লেখেন—

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

> আমিরুল মুমিনিন হারুনের পক্ষ থেকে রোমের কুকুর নিকেফোরাসের প্রতি।
>
> কাফিরজাদা, আমি তোমার পত্র পাঠ করেছি। উত্তর স্বচক্ষেই দর্শন করবে; শ্রবণ করার মতো অবকাশ লাভের সুযোগ তোমার হবে না।

এরপর মুসলিম বাহিনী বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যে অভিযান চালিয়ে হিরাক্লিয়া (Heraclea Cybistra) নগরী জয় করে। মুসলিম বাহিনীর আক্রমণে দিশেহারা হয়ে বাইজান্টাইন সম্রাট নিকফোরাস নিয়মিত বার্ষিক জিজিয়া প্রদানের অঙ্গীকার করে সন্ধিচুক্তির প্রস্তাব দেন। এরপর থেকে নিকফোরাস প্রতি বছর তিন লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা জিজিয়া হিসেবে আব্বাসি রাষ্ট্রের কোষাগারে জমা করতেন।

মোটকথা, খলিফা হারুনুর রশিদের শাসনামলে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত ছিল। স্বয়ং

---

৮৩. নিকফোরাসের পূর্বে রোমান সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন সম্রাজ্ঞী ইরিন (Irene of Athens)। রোমান নেতৃবৃন্দ তাকে অপসারণ করে নিকফোরাসকে তার স্থলাভিষিক্ত করেছিল। [মূল গ্রন্থের টীকা]

খলিফা রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ সেনাপতিদের নিয়ে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানে বের হতেন।

খলিফা হারুনুর রশিদের শাসনামলে ১৭২ হিজরি সনে (৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দে) মাগরিবে ইদরিসিয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ইদরিসিয়া রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা হলেন ইদরিস বিন আবদুল্লাহ বিন হাসান। তিনি আল-হাদির আমলে ফাখখের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যান এবং মাগরিবে আপন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ইদরিসিয়া রাষ্ট্রই ছিল আলাবিদের প্রতিষ্ঠিত প্রথম রাষ্ট্র। হারুনুর রশিদ তার খিলাফতকালের শুরুর দিকে আলাবিদের সঙ্গে সদাচরণ করতেন; কিন্তু ইদরিসিয়া রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা তাকে শঙ্কিত করে তোলে। এরপর থেকে তিনি কাউকে আলাবিদের প্রতি আন্তরিক দেখলে তাকে কঠিন শাস্তি দিতেন।

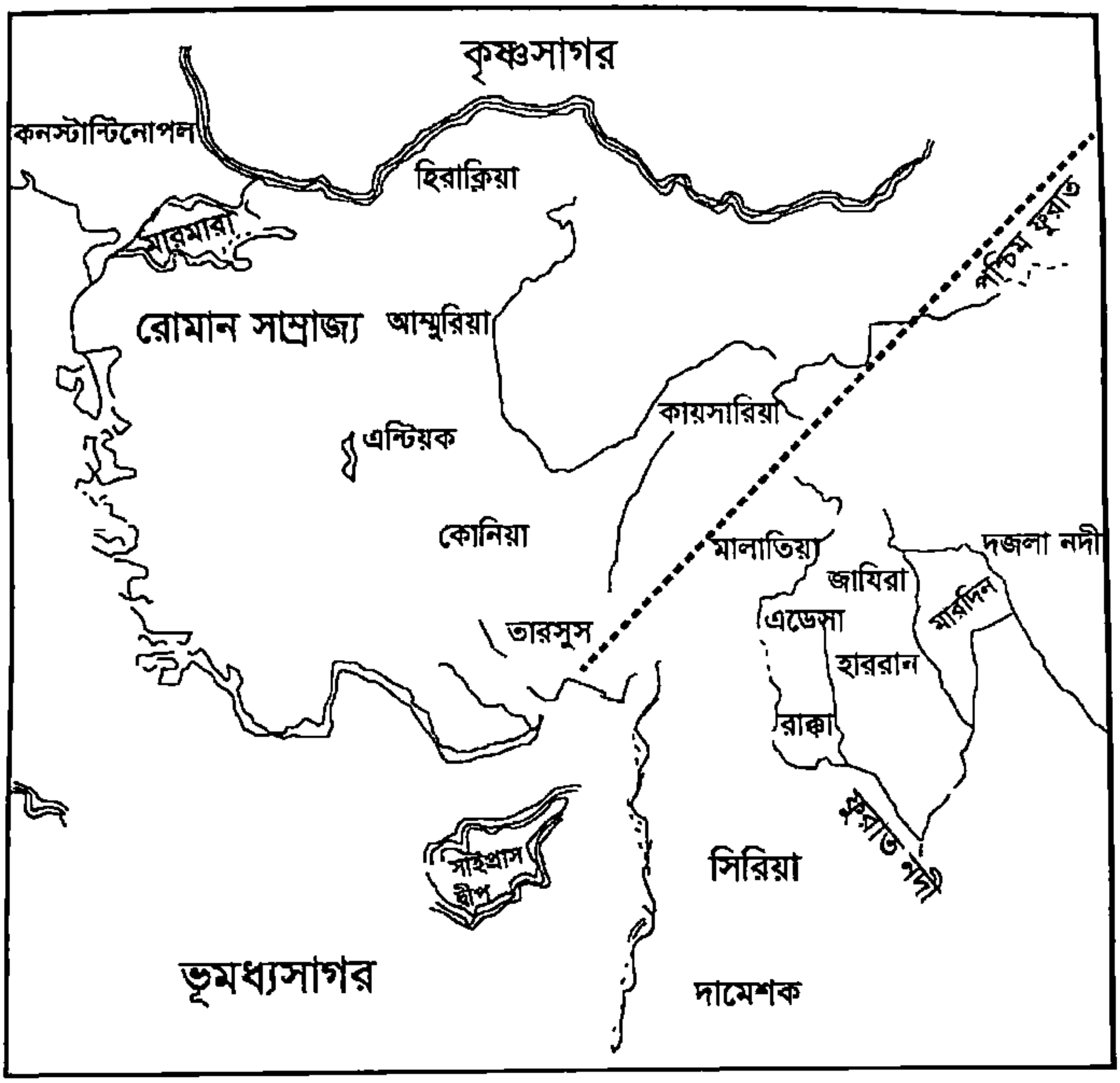
হারুনুর রশিদের শাসনামলেই ১৮৪ হিজরি সনে (৮০০ খ্রিষ্টাব্দে) আফ্রিকায় আগলাবিয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। আগলাবিয়া রাষ্ট্র সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে।

হারুনুর রশিদের মৃত্যু

খলিফা হারুনুর রশিদ মৃত্যুর পূর্বে এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখেছিলেন। বিস্ময়কর সেই স্বপ্নই তার জীবনে বাস্তব হয়েছিল।

তিনি স্বপ্নে দেখেন, একটি হাতে কিছু লাল মাটি; আর অদৃশ্য হতে কেউ বলছে, এটি আমিরুল মুমিনিনের কবরের মাটি। পরে তিনি যখন খোরাসানের উদ্দেশে রওনা হন এবং পথিমধ্যে তুস এলাকায় পৌঁছান, তখন সেখানেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি তার ভৃত্যকে বলেন, 'তুমি এই এলাকার কিছু মাটি নিয়ে এসো।' ভৃত্য হাতে করে কিছু লাল বর্ণের মাটি নিয়ে আসে। লাল মাটি দেখেই খলিফা বলে ওঠেন, 'আল্লাহর শপথ! এ হাতই আমি দেখেছি আর এ মাটিই সেই হাতে ছিল!' এরপর তিনি সেখানে তার জন্য কবর খনন করার এবং কবরের পাশে পূর্ণ কুরআন খতম করার নির্দেশ দেন। অসুস্থ অবস্থায় খলিফাকে কবরটি দেখতে নিয়ে যাওয়া হলে তিনি কবরের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'হে আদমসন্তান, এখানেই তোমার আগামীর নিবাস!' এ কথা বলেই তিনি কাঁদতে থাকেন। এর তিনদিন পরই তিনি ইন্তেকাল করেন।

খলিফা হারুনুর রশিদ ১৯৩ হিজরি সনের জুমাদাল উখরা মাসে চুয়াল্লিশ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।



মানচিত্র নং-৬

খলিফা হারুনুর রশিদের আমলে রোমান সাম্রাজ্যের সীমারেখা

হারুনুর রশিদের শাসনামলে প্রাচুর্য

খলিফা হারুনুর রশিদ মাঝেমধ্যে ভাসমান মেঘমালার দিকে তাকিয়ে বলতেন, 'যেখানে ইচ্ছা গিয়ে বৃষ্টি বর্ষণ করো; তোমার সেচে উৎপাদিত ফসলের খারাজ (কর) আমার কোষাগারেই জমা হবে।' তার শাসনামলে আব্বাসি সাম্রাজ্যের বার্ষিক রাজস্ব সাত কোটি দেড় লক্ষ দিনারে পৌঁছেছিল। পরবর্তী সময়ে আল-মামুনের শাসনামলে রাজস্ব আরও বৃদ্ধি পায়।

হারুনুর রশিদের ওপর আরোপিত কিছু অভিযোগের অপনোদন

আব্বাসি সাম্রাজ্যের খলিফাগণ বিশেষ করে হারুনুর রশিদের ওপর মদপান, সংগীত-বিনোদন ও দাসীদের মজলিসে অংশগ্রহণের অভিযোগ আরোপ করা হয়ে থাকে। নিঃসন্দেহে এসব অভিযোগ সম্পূর্ণই মিথ্যা, বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। বিষয়টি আমরা কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করার ইচ্ছা করেছি।

১ম অভিযোগ : মদপান ও মদের আসর আয়োজন

ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন যে, খলিফা হারুনুর রশিদ নাবিজ (খেজুর ভিজিয়ে তৈরি এক ধরনের পানীয়) পান করতেন। বরং ঐতিহাসিকদের অনেকে ইমাম আবু হানিফা রহ. সম্পর্কেও একই কথা উল্লেখ করেছেন। খলিফা হারুনুর রশিদের শাসনামলে ইরাকবাসী হানাফি মাজহাবের অনুসারী ছিল। হানাফি মাজহাবমতে খেজুর ভেজানো পানি দু-অবস্থায় পান করা বৈধ—

- খেজুর ভেজানো পানি ভিজিয়ে রাখার পর বা জ্বাল দেওয়ার পর টগবগ করা ও তেজ আসার পূর্বেই যদি পান করা হয়, তাহলে মাজহাবের সকল উলামায়ে কেরামের ঐকমত্যে তা হালাল।
- জ্বাল দিতে দিতে যদি পানি টগবগ করতে থাকে এবং তেজ আসে, আর তা থেকে যদি এত অল্প পরিমাণ পান করা হয় যে, পানকারীর প্রবল ধারণামতে এর কারণে সে মাতাল হবে না, আর পানও করা হয় আমোদ-প্রমোদের উদ্দেশ্যে নয়; বরং শক্তিবর্ধনের উদ্দেশ্যে, তাহলে তার বিধান বিষয়ে হানাফি ইমামগণের মধ্যে মতানৈক্য আছে। (ইমাম আবু হানিফা একে হালাল বিবেচনা করেন।) হ্যাঁ, যদি এ জাতীয় জ্বাল দেওয়া পানীয় হতে এত বেশি পরিমাণ পান করা হয়, যার কারণে সাধারণত নেশাভাব সৃষ্টি হয়, তাহলে তা সকলের ঐকমত্যে হারাম।

এসব বিধান হলো জ্বাল দেওয়ার ক্ষেত্রে। আর যদি জ্বাল দেওয়ার পরিবর্তে ভিজিয়েই রাখা হয় এবং দীর্ঘ সময় ভিজিয়ে রাখার কারণে উথলে ওঠে এবং তেজ আসে, তাহলে তা অল্প বা অধিক পরিমাণ সর্বাবস্থায়ই হানাফি আলিমগণের ঐকমত্যে হারাম।

এখন প্রশ্ন হলো, খলিফা হারুনুর রশিদ কোন ধরনের নাবিজ পান করতেন? নেশাউদ্রেককারী প্রকারের, নাকি হালাল প্রকারের?

এ বিষয়ে ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন রহ. লিখেছেন—

> আর হারুনুর রশিদের মাদকাসক্তি এবং বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে নিয়ে মদের আসর জমানো সম্পর্কে যেসব গালগল্প প্রচলিত আছে, তা সম্পর্কে আমাদের কথা হলো—আল্লাহ মাফ করুন—আমরা তার জীবনচরিতে এ জাতীয় কিছু বিন্দুমাত্র খুঁজে পাইনি। বরং তার জীবনচরিতে দ্বীনদারি ও ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে খিলাফতের দায়িত্বপালন, আলিম-উলামা ও বুজুর্গ ব্যক্তিদের সাহচর্য গ্রহণ, ফুজায়ল বিন ইয়াজ, ইবনুস সাম্‌মাক প্রমুখের সঙ্গে নিয়মিত দ্বীনি আলোচনা, সুফিয়ান সাওরির সঙ্গে পত্রবিনিময়, বুজুর্গদের নসিহত শুনে অঝোর ধারায় কান্না, মক্কায় কাবা শরিফের তাওয়াফ করার সময় দোয়া এবং তার ইবাদত ও নফলপ্রীতির বিবরণই পাওয়া যায়।[৮৪]

ইবনে খালদুন রহ. আরও লিখেছেন—

> প্রকৃতপক্ষে হারুনুর রশিদ ইরাকিদের (ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর) মাজহাবমতে বৈধ খেজুরের নাবিজ পান করতেন। খেজুরের নাবিজ সম্পর্কে তাদের ফতোয়া তো সুপ্রসিদ্ধ। কিন্তু খলিফা হারুনুর রশিদের বিরুদ্ধে মদপানের অভিযোগ তোলার এবং এ সম্পর্কে প্রচলিত ভিত্তিহীন বর্ণনাসমূহের অনুসরণের কোনো অবকাশই নেই।[৮৫]

২য় অভিযোগ : আব্বাসি রাষ্ট্রে মদের অবাধ উৎপাদন ও বিস্তার

হারুনুর রশিদের শাসনামলে মদের অবাধ বিস্তারের যে অভিযোগ প্রচলিত আছে, সে সম্পর্কে আমাদের কথা হলো—যে যুগ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে এ অভিযোগ তোলা হয়, বাস্তবতা কিন্তু তাকে মোটেই সমর্থন করে না। এটি তো স্বীকৃত সত্য যে, খলিফা হারুনুর রশিদের একান্ত ঘনিষ্ঠজনদের শীর্ষ কাতারে ছিলেন মালিক বিন আনাস রহ., আবু ইউসুফ রহ., শাফেয়ি

---

৮৪. ইবনে খালদুন, *তারিখে ইবনে খালদুন*, ১/২৩।
৮৫. প্রাগুক্ত, ১/২৫।

রহ., ফুজায়ল বিন ইয়াজ রহ. ও আবদুল্লাহ বিন মুবারক রহ.-এর ন্যায় সমকালীন আস্থাভাজন, বিশ্বস্ত ও জগদ্বিখ্যাত ইমামগণ। বিরুদ্ধবাদী ও বাতিলপন্থিরা খলিফা হারুনুর রশিদের আমলে মদের অবাধ বিস্তারের যে চিত্র তুলে ধরে থাকে, বাস্তবেই যদি মদ সে যুগে এত সহজলভ্য হতো, তাহলে কি এসব ক্ষণজন্মা আল্লাহওয়ালা আলিম ও বুজুর্গ নিশ্চুপ থাকতেন? সঙ্গে এ তথ্যটিও যোগ করুন যে, সে যুগে ইসলামি রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধরনের পানীয় প্রচলিত ছিল আর সবগুলোকেই 'শরাব' বলা হতো। যেমন : পানি, দুধ, শরবত, বিভিন্ন ফলের নির্যাস ইত্যাদি। এগুলো চিনিমিশ্রিত পানি দ্বারা তৈরি হতো এবং তাতে ভায়োলেট ফুল, কলা, গোলাপ, বেরি ফল ইত্যাদির নির্যাস দিয়ে সুবাসিত করা হতো। সব ধরনের পানীয়কেই তখন 'শরাব' বা পানীয় নামে অভিহিত করা হতো।

৩য় অভিযোগ : সংগীত ও আমোদ-প্রমোদের আয়োজন

প্রশ্ন হলো—আব্বাসি খিলাফতকালে সংগীতের রূপ ও পদ্ধতি কেমন ছিল? আর সংগীত সম্পর্কে ইসলামের বিধানই-বা কী?

মৌলিকভাবে ইসলামে সংগীত বৈধ, যদি তা নির্দোষ ও আপত্তিকর কার্যকারণমুক্ত হয়। আপত্তিকর কার্যকারণ দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য এমন বিষয়, যা ফিতনা সৃষ্টি করে; যেমন: কুফরি বাক্য, অশ্লীল বাক্য, কৌতুক বা রং-তামাশা, বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ইত্যাদি।

'*আন-নুজুমুয যাহিরা*' গ্রন্থকার জামালুদ্দিন আবুল মাহাসিন [মৃত্যু : ৮৭৪ হি.] হারুনুর রশিদের শাসনামলে প্রচলিত প্রসিদ্ধ সংগীতশিল্পীদের আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন—

> ১৭৪ হিজরি সনে ঈসা বিন জাফর বিন মানসুর-এর ক্রীতদাস মানসুর মৃত্যুবরণ করে। এই মনসুরের উপাধি ছিল যালযাল। মানসুর ছিল সে যুগের সুপ্রসিদ্ধ এক সংগীতশিল্পী। তার সংগীত ও লাঠিতে ছন্দবদ্ধ আঘাতের কথা দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করা হতো। সে যুগের সংগীত বর্তমানের ন্যায় বাদ্যযুক্ত ছিল না। তখন সংগীত বলে প্রসিদ্ধ বিভিন্ন মাত্রা ও ছন্দে রচিত ধ্বনিসমষ্টিকে বোঝানো হতো। মূলত সে যুগের সংগীত ছিল

আমাদের বর্তমান যুগের স্তাবক ও বক্তাদের সুললিত আবৃত্তির ন্যায় এক ধরনের পরিবেশনা।[৮৬]

সে যুগে বিদ্যমান গীতি-কাব্যের কিছু নমুনা নিচে তুলে ধরা হলো।

نُرَاعُ بِذِكْرِ الْمَـوْتِ سَـاعَةَ ذِكْرِهِ ❋ وَنَفْتُرُ بِالدُّنْيَـا فَنَـلْهُوْ وَنَلْعَبُ

وَنَحْنُ بَنُو الدُّنْيَا خُلِقْنَـا لِغَيْرِهَـا ❋ وَمَـا كَانَ مِنْهَا فَهُوَ شَيْءٌ مُحَبَّبُ

মরণের ভয়ে আপনারে ভুলি মরণের স্মরণে
ভুলে যাই সব দুনিয়ার ঘোরে
আমোদ-প্রমোদ বিনোদ বিহারে
পড়ে থাকি মায়ায়-প্রবঞ্চনায় সেই দুনিয়ার চরণে।
জগৎ-সংসারের অধিবাসী মোরা, জগতের লাগি সৃজিত নয়,
পৃথিবী যতই আবেদনময়ী, হোক না যত আনন্দময়।

اَلْـمَرْءُ فِيْ تَـأَخُّرِ مُدَّتِـهِ ❋ كَالثَّوْبِ يَبْلَى بَعْدَ جِدَّتِهِ

عَجَبًـا لِمُتَنَبِّهٍ يُضَيِّعُ مَا ❋ يَحْتَاجُ فِيْـهِ لِيَوْمِ رَقْدَتِهِ

পোশাক যেমন পুরাতন হয়, মিলিয়ে যায় তার নতুন ভাঁজ
মানুষেরও তেমন জীর্ণ বয়সে হারিয়ে যায় সব যৌবন-সাজ।
তবুও মানুষ অলস-উদাস, বিস্ময় জাগে দেখে তার আশ—
সজাগ জীবনে হেলায় হারায় নিদ্রাজীবনের পাথেয়-বিলাস!

৪র্থ অভিযোগ : দাসীসঙ্গ উপভোগ ও প্রচুর দাসী গ্রহণ

হ্যাঁ, এটি ঐতিহাসিক স্বীকৃত সত্য যে, খলিফা হারুনুর রশিদের কাছে প্রচুর দাসী ছিল।

'*শুবুহাতুন ফিল আছরিল আব্বাসিল আউয়াল*' গ্রন্থের লেখক ড. মুআইয়াদ ফাযিল লিখেছেন—

---

৮৬. জামালুদ্দিন ইউসুফ আবুল মাহাসিন, *আন-নুজুমুয যাহিরা ফি মুলূকি মিসর ওয়াল কাহিরা*, ২/৭৮।

> ক্রীতদাসী সংক্রান্ত আলোচনাটি হলো আমাদের এবং তাদের চিন্তা-ধারণার মধ্যে ভিন্নতার আরেকটি দৃষ্টান্ত।[৮৭] খলিফাদের প্রতি অপবাদ আরোপ করা হয়েছে যে, তারা দাসীদের মধ্য হতে বাছাই করে নিজেদের জন্য প্রণয়িনী ও রক্ষিতা গ্রহণ করতেন এবং তাদের সৌন্দর্য ও গুণকীর্তন করে গীতি-গদ্যের আসর জমাতেন। মূলত সংগীত ও দাসী সম্পর্কে আমাদের ধারণা ও কল্পনায় যে ভাব ও মর্ম বিদ্যমান আছে, তা-ই আমাদেরকে এ ধরনের চিত্র কল্পনা করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। আমরা একে খলিফা-চরিত্রের জন্য অশোভনীয় ও অপরাধ বিবেচনা করেছি। যদি আমরা দাসীগ্রহণ সম্পর্কে শরিয়তের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি লক্ষ করতাম, তাহলে জানতে পারতাম যে, দাসীগ্রহণ মূলত স্বত্বাধিকার, যার ভিত্তিতে মালিক দাসীকে উপভোগ ও তার সেবা গ্রহণের অধিকার লাভ করে। মালিকের জন্য আপন স্ত্রীদের মাঝে যেমন সমতাবিধান আবশ্যক, দাসীদের ক্ষেত্রে তা আবশ্যক নয়।

ইবনে কুদামা রহ. *'কিতাবুল মুগনি'* গ্রন্থে লিখেছেন—

> একজন পুরুষের জন্য প্রচুর সংখ্যক দাসী গ্রহণের অধিকার আছে। আর পুরুষ তার অধীনস্থ দাসীদের কাছে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পারে।

নিম্নের ঘটনাগুলোর মাধ্যমে ইসলামি ইতিহাসের এই শ্রেষ্ঠতম ও মহান খলিফাদের ব্যক্তিত্বের প্রকৃত রূপ কিছুটা হলেও উপলব্ধি করা যাবে বলে আশা করা যায়।

[এক]

ইমাম মালিক বিন আনাস রহ. বর্ণনা করেন—

> খলিফা আবু জাফর আল-মানসুর একদিন ইবনে তাউসের কাছে দূত প্রেরণ করে তাকে সাক্ষাৎ করতে বললেন। আমরা (ইবনে

---

৮৭. 'আমাদের' মানে ইসলামি চিন্তাধারা লালনকারী ঐতিহাসিকগণ, আর 'তাদের' মানে ইসলামি শিক্ষা ও চিন্তা-চেতনা হতে দূরে অবস্থানকারী বস্তুবাদী ঐতিহাসিকগণ। [মূল গ্রন্থের টীকা]

তাউস ও মালিক বিন আনাস) খলিফার দরবারে উপস্থিত হলাম। তখন তিনি সুসজ্জিত বিছানায় উপবিষ্ট ছিলেন। তার সামনে (জল্লাদের কাজে ব্যবহৃত) চামড়ার মাদুর ছড়িয়ে রাখা ছিল এবং মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার দায়িত্বে নিয়োজিত জল্লাদরা তরবারি হাতে দণ্ডায়মান ছিল। তিনি আমাদেরকে ইঙ্গিতে বসার নির্দেশ দিলে আমরা বসলাম। খলিফা কিছুক্ষণ অবনত মস্তকে নিশ্চুপ বসে রইলেন। তারপর তিনি মাথা উঁচু করে ইবনে তাউসের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমাকে আপনার পিতার সূত্রে কোনো হাদিস শোনান।' ইবনে তাউস বললেন, 'হ্যাঁ, শোনাচ্ছি। আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি যে, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

«إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَشْرَكَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيْ سُلْطَانِهِ، فَأَدْخَلَ عَلَيْهِ الْجَوْرَ فِيْ عَدْلِهِ»

কিয়ামতের দিন সবচেয়ে অধিক আজাব ওই ব্যক্তির হবে, যাকে আল্লাহ পাক আপন শাসনক্ষমতায় অংশীদারি দান করেছেন (অর্থাৎ পৃথিবীতে ক্ষমতার অধিকারী করেছেন) আর সে আল্লাহর ন্যায়ের মাঝে আপন অন্যায়ের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে।'

ইমাম মালিক রহ. বলেন, (এখনই ইবনে তাউসের শিরশ্ছেদ করা হবে আর) তার রক্তে আমার কাপড় রঞ্জিত হবে—এই আশঙ্কায় আমি আমার কাপড় গুটিয়ে নিলাম। এরপর আল-মানসুর তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমাকে কিছু নসিহত করুন।' ইবনে তাউস বললেন, 'হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۝ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۝ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ۝ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۝ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ۝ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ۝ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ۝ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۝ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾

> তুমি কি দেখোনি তোমার প্রতিপালক আদ (জাতি)-এর প্রতি কী আচরণ করেছেন? ইরাম সম্প্রদায়ের প্রতি, যারা উঁচু উঁচু স্তম্ভের অধিকারী ছিল; যাদের সমান পৃথিবীতে আর কোনো জাতিকে সৃষ্টি করা হয়নি এবং কী আচরণ করেছেন ছামুদ (জাতি)-এর প্রতি, যারা উপত্যকায় বড় বড় পাথর কেটে ফেলেছিল এবং কী আচরণ করেছেন পেরেকওয়ালা ফেরাউনের প্রতি? যারা দুনিয়ার দেশে দেশে অবাধ্যতা প্রদর্শন করেছিল এবং তাতে অশান্তি বিস্তার করেছিল। ফলে তোমাদের প্রতিপালক তাদের ওপর শাস্তির কষাঘাত হানলেন। দৃঢ় বিশ্বাস রাখো, তোমার প্রতিপালক সকলের প্রতি দৃষ্টি রাখছেন। [সুরা ফাজর : ৬-১৪]

মালিক রহ. বলেন, আমি আবারও তার রক্তে আমার কাপড় রঞ্জিত হওয়ার ভয়ে আমার কাপড় গুটিয়ে নিলাম। আল-মানসুর কিছুক্ষণ নিশ্চুপ রইলেন; ফলে পরিবেশ ভারী হয়ে উঠল।

এরপর খলিফা বললেন, 'ইবনে তাউস! আমাকে ওই দোয়াতটি দিন তো।' ইবনে তাউস বসে রইলেন। খলিফা দ্বিতীয়বার একই নির্দেশ দিলে ইবনে তাউস এবারও বসে রইলেন। খলিফা আল-মানসুর জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি আমাকে দোয়াতটি এগিয়ে দিচ্ছেন না কেন?' ইবনে তাউস উত্তর দিলেন, 'আমার আশঙ্কা হচ্ছে, তা দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টিবিরোধী কোনো ফরমান লেখা হবে; আর আমি সেই অন্যায়ে শরিক হয়ে যাব।' এ কথা শোনার পর আল-মানসুর বললেন, 'আপনারা দুজন আমার সামনে থেকে চলে যান।' ইবনে তাউস বললেন, 'আমরা তো তা-ই চাচ্ছিলাম।'

ইমাম মালিক রহ. বলেন, সেদিন যেন আমি ইবনে তাউসের প্রকৃত অবস্থান ও মর্যাদা উপলব্ধি করতে সক্ষম হলাম।

[দুই]

আমিরুল মুমিনিন হারুনুর রশিদ হজের সফরে ছিলেন। মিনায় প্রথম দিন অতিবাহিত করার পরের দিনের ঘটনা। রাতের বেলা উজির ফজল বিন রবি তার সঙ্গে ছিলেন। ঘুমের সময় হলে উজির ফজল নিজ তাঁবুতে ফিরে ঘুমিয়ে পড়লেন। রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হওয়ার পর তাঁবুর

দরজায় করাঘাতের শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘কে এখানে?’ উত্তর এলো, ‘আমিরুল মুমিনিনের আহ্বানে সাড়া দাও।’

খলিফার স্বর শুনতে পেয়ে উজির ফজল বিন রবি দ্রুত তাঁবু থেকে বের হয়ে এসে খলিফাকে দরজায় দণ্ডায়মান দেখতে পেলেন। তিনি বললেন, ‘আমিরুল মুমিনিন, সংবাদ পাঠালে আমি নিজেই তো আপনার কাছে উপস্থিত হতাম।’

হারুনুর রশিদ বললেন, ‘ধিক তোমাকে! আমি একটি বিষয় নিয়ে বেশ চিন্তিত। কোনো আলিমই কেবল তার সমাধান করতে পারবেন। সুতরাং আমাকে কোনো আলিমের কাছে নিয়ে চলো; আমি তাকে জিজ্ঞেস করে সমাধান জেনে নেব।’ ফজল বললেন, ‘এই তো এখানেই বিশিষ্ট আলিম ও মুহাদ্দিস সুফিয়ান হিলালি আছেন।’

‘আমাকে তার কাছে নিয়ে চলো।’

ফজল বলেন, এরপর আমরা সুফিয়ানের তাঁবুর কাছে গিয়ে আওয়াজ দিলাম। ভেতর থেকে তিনি বললেন, ‘কে এখানে?’ আমি উত্তর দিলাম, ‘আমিরুল মুমিনিনের আহ্বানে সাড়া দিন।’ তিনি দ্রুত বের হয়ে এলেন এবং তাঁবুর সামনে আমিরুল মুমিনিনকে দণ্ডায়মান দেখে বললেন, ‘আমিরুল মুমিনিন, আমাকে ডেকে পাঠালে আমি নিজেই তো আপনার কাছে উপস্থিত হতাম।’

হারুনুর রশিদ বললেন, ‘আমরা যে উদ্দেশ্যে এসেছি, অনুগ্রহ করে তা পূর্ণ করে দিন।’ এরপর খলিফা কিছুক্ষণ তার সঙ্গে কথা বললেন। শেষে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনার কোনো ঋণ আছে?’ তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ।’

খলিফা এবার আমার দিকে ফিরে বললেন, ‘আবুল আব্বাস! তার ঋণগুলো পরিশোধ করে দিয়ো।’ এরপর আমরা সেখান থেকে ফিরে এলাম।

পথিমধ্যে আমিরুল মুমিনিন আমাকে বললেন, ‘তোমার এই সঙ্গী তো আমার (কাঙ্ক্ষিত মাসআলায়) কোনো কাজে আসেনি। সুতরাং আমাকে অন্য কারও কাছে নিয়ে চলো, আমি তাকে বিষয়টি জিজ্ঞেস করে সমাধান জেনে নেব।’

আমি বললাম, 'এই তো এখানেই বিশিষ্ট আলিম আবদুর রাযযাক বিন হুমাম হিময়ারি ছানআনি আছেন।'

'আমাকে তার কাছে নিয়ে চলো।'

ফজল বলেন, এরপর আমরা তার তাঁবুর কাছে গিয়ে আওয়াজ দিলাম। ভেতর থেকে তিনি বললেন, 'কে এখানে?' আমি উত্তর দিলাম, 'আমিরুল মুমিনিনের আহ্বানে সাড়া দিন।' তিনি দ্রুত বের হয়ে এলেন এবং তাঁবুর সামনে আমিরুল মুমিনিনকে দণ্ডায়মান দেখে বললেন, 'আমিরুল মুমিনিন! আমাকে ডেকে পাঠালে আমি নিজেই তো আপনার কাছে উপস্থিত হতাম।'

হারুনুর রশিদ বললেন, 'আমরা যে উদ্দেশ্যে এসেছি, অনুগ্রহ করে তা পূর্ণ করে দিন।' এরপর খলিফা কিছুক্ষণ তার সঙ্গে কথা বললেন। শেষে তাকেও জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার কোনো ঋণ আছে?'

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।'

খলিফা এবারও আমার দিকে ফিরে বললেন, 'আবুল আব্বাস! তার ঋণগুলো পরিশোধ করে দিয়ো।'

ফেরার পথে আমিরুল মুমিনিন আমাকে বললেন, 'তোমার এই সঙ্গীও আমার (কাঙ্ক্ষিত মাসআলায়) কোনো কাজে আসেনি। সুতরাং আমাকে অন্য কারও কাছে নিয়ে চলো।'

আমি সবিনয়ে আরজ করলাম, 'এই তো এখানেই হারামের শায়খ ও হেদায়েতের ইমাম ফুজায়ল বিন ইয়াজ তামিমি আছেন।'

'আমাকে তার কাছে নিয়ে চলো।'

এরপর আমরা তার তাঁবুর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। তিনি তখন তাঁবুর ভেতরে নামাজে দণ্ডায়মান ছিলেন এবং একটি আয়াত বারবার তেলাওয়াত করছিলেন। আমি আওয়াজ দিলে ভেতর থেকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কে এখানে?' আমি উত্তর দিলাম, 'আমিরুল মুমিনিনের আহ্বানে সাড়া দিন।' তিনি ভেতর থেকেই বললেন, 'আমার কাছে আমিরুল মুমিনিনের কী কাজ?!' আমি বললাম, 'সুবহানাল্লাহ! আপনার জন্য কি তার আনুগত্য আবশ্যক নয়?'

তিনি দরজা খুললেন; এরপর বাতি নিভিয়ে দিয়ে তাঁবুর এক কোণে চলে গেলেন। আমরা উভয়ে তার খোঁজে তাঁবুর ভেতর ঘুরতে লাগলাম। খলিফাই আমার পূর্বে তার নাগাল পেলেন। খলিফার হাতের স্পর্শ পেয়ে ফুজায়ল বলে উঠলেন, 'হায়রে হাত! কত কোমল এ হাত! যদি কাল কিয়ামতের দিন আজাব থেকে রক্ষা পায়!'

ফুজায়লের এ কথা শুনে আমি মনে মনে বলতে লাগলাম, অবশ্যই আজ রাতে আল্লাহভীতিতে প্রকম্পিত এক হৃদয় হতে নিঃসৃত কিছু পরিচ্ছন্ন নসিহত শুনতে পাব।

হারুনুর রশিদ বললেন, 'আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করুন; আমরা যে উদ্দেশ্যে এসেছি, অনুগ্রহ করে তা পূর্ণ করে দিন।'

'কেন এসেছেন?' ফুজায়ল বলতে শুরু করলেন। 'আপনি তো নিজের কাঁধে বোঝা চাপিয়েই নিয়েছেন, আর আপনার চারপাশের অনুচররা আপনার কাঁধে আরও বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। আপনি যদি তাদেরকে আপনার গোনাহর সামান্য অংশের বোঝাও বহন করতে অনুরোধ করেন, তারা রাজি হবে না। বরং যে আপনার সবচেয়ে প্রিয়ভাজন ছিল, সে সবচেয়ে দ্রুত আপনার কাছ থেকে পালাবে।'

ফুজায়ল কিছুক্ষণ চুপ রইলেন। এরপর সেই নির্জন রজনীর নীরব প্রহরে আবারও তিনি বলতে শুরু করলেন। নীরবতার মাঝে খলিফার হৃদয়ের স্পন্দনও যেন শোনা যাচ্ছিল।

এরপর ফুজায়ল বললেন, 'আমিরুল মুমিনিন উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. যখন খিলাফতের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হন, তখন তিনি সালিম বিন আবদুল্লাহ বিন উমর ইবনুল খাত্তাব, মুহাম্মাদ বিন কা'ব কারযি ও রজা বিন হাইওয়াকে আহ্বান করেন। এরপর তাদেরকে বলেন, "আমি তো এই পরীক্ষায় আটকে গেছি। আপনারা আমাকে পরামর্শ দিন।" তিনি খিলাফতের দায়িত্বকে বিপদ ও পরীক্ষা মনে করেছিলেন আর আপনি ও আপনার সঙ্গীরা একে নিয়ামত ভাবছেন!

তখন সালিম তাকে বলেন, 'আপনি যদি কাল (কিয়ামতের দিন) আল্লাহর আজাব থেকে মুক্তি পেতে চান, তাহলে মনে করবেন—প্রবীণ মুসলমানগণ আপনার পিতৃসম, তরুণ ও যুবকেরা আপনার ভ্রাতৃসম আর ছোটরা আপনার সন্তানের ন্যায়। সুতরাং পিতার সঙ্গে আপনি সদাচরণ

করবেন, ভাইয়ের প্রতি অনুগ্রহ করবেন আর সন্তানের প্রতি স্নেহশীল হবেন।"

রজা বিন হাইওয়া তাকে উপদেশ দেন, "আপনি যদি কাল আল্লাহর আজাব থেকে নিষ্কৃতি পেতে চান, তাহলে নিজের জন্য যা ভালোবাসেন, সকল মুসলমানের জন্য তা ভালোবাসবেন। এরপর যখন চান, মৃত্যুবরণ করবেন। আমি যদিও আপনাকে এ কথা বলছি; কিন্তু আপনাকে নিয়ে আমার সেদিনের জন্য বড় ভয় হয়, যেদিন কত পদযুগল স্খলনের শিকার হবে! আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন, সেদিন কি আপনার সঙ্গে এরা থাকবে?"

ফুজায়ল বিন ইয়াজের নসিহত শোনার পর খলিফা অনেকক্ষণ কাঁদলেন। আমি (ফজল বিন রবি) ফুজায়লকে বললাম, 'আমিরুল মুমিনিনের সঙ্গে কোমল আচরণ করুন।' তিনি আমাকে উত্তর দিলেন, 'ইবনে রবি, তুমি ও তোমার সঙ্গীরা তো তাকে মেরেই ফেলেছ আর আমি তার সঙ্গে কোমল আচরণ করব?!'

কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ার পর হারুনুর রশিদ ফুজায়লকে বললেন, 'আমাকে আরও কিছু নসিহত করুন।'

ফুজায়ল বললেন, 'আমিরুল মুমিনিন! আমার কাছে এ বর্ণনাও পৌঁছেছে যে, উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ.-এর নিযুক্ত জনৈক কর্মকর্তা একবার তার কাছে (দায়িত্বের অধিক চাপের কারণে) রাত্রিজাগরণের অভিযোগ করল। তখন উমর ইবনে আবদুল আজিজ তাকে লিখলেন, "ভাই, জাহান্নামে জাহান্নামবাসীর অনন্তকাল অবস্থান ও বিনিদ্র রজনীর কথা স্মরণ করো। এই স্মরণ তোমাকে নিদ্রায়-জাগরণে সর্বাবস্থায় তোমার রবের দিকে পরিচালিত করবে। আর আমি তোমাকে সাবধান করছি যে, এ পথ থেকে যেন তোমার কদম বিচ্যুত না হয়। আত্মব্যস্ততা যেন তোমার অন্তিম অবস্থা না হয় এবং তোমার বিষয়ে আমাদের নিরাশার কারণ না হয়।" উক্ত কর্মকর্তা পত্রপাঠ করার পর সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে উমর ইবনে আবদুল আজিজের কাছে উপস্থিত হলো। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কেন এসেছ?" সে উত্তর দিলো, "আপনি তো আপনার পত্রের মাধ্যমে আমার অন্তর্জগৎ খুলে দিয়েছেন! আমি আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করার আগ পর্যন্ত কখনো কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করব না।"

হারুনুর রশিদ এবার আগের বারের চেয়েও বেশি কাঁদতে লাগলেন। এরপর তিনি ফুজায়লকে বললেন, 'আমাকে আরও নসিহত করুন।'

ফুজায়ল বললেন, 'আমিরুল মুমিনিন! নবীজির চাচা আব্বাস রাযি. একদিন নবীজির দরবারে এসে বললেন, "আল্লাহর রাসুল, আমাকে কোনো এলাকার (প্রশাসনিক) দায়িত্ব প্রদান করুন।" নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "হে আব্বাস, হে নবীর চাচা, যে দায়িত্ব আপনি যথার্থভাবে পালন করতে পারবেন না, তা গ্রহণ করার চেয়ে দায়িত্বমুক্ত থাকা শ্রেয়। কারণ, নিঃসন্দেহে নেতৃত্ব ও দায়িত্বগ্রহণ কিয়ামতের দিন পরিতাপ ও আফসোসের কারণ হবে। তাই যদি আপনি আমির না হয়ে পারেন, তাহলে তা-ই করুন।"

হারুনুর রশিদ এবারও অনেক কাঁদলেন। এরপর বললেন, 'আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করুন; আমাকে আরও নসিহত করুন।'

ফুজায়ল বললেন, 'হে সুঠাম ও সুদর্শন দেহকাঠামোর অধিকারী, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা আপনাকেই এই কাঠামো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। সুতরাং আপনি যদি আপন অবয়বকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করতে পারেন, তাহলে তা-ই করুন। সাবধান, সকাল-সন্ধ্যা যে সময়েই উপনীত হন, কখনোই জনগণের প্রতি খিয়ানত করবেন না। কেননা, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

«مَنْ أَصْبَحَ غَاشًّا لِرَعِيَّتِهِ لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ»

> যে আপন প্রজাদের সঙ্গে খিয়ানত করবে, সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।'[৮৮]

হারুনুর রশিদ এবারও অনেক কাঁদলেন। তারপর ফুজায়লকে বললেন, 'আপনার কি কোনো ঋণ আছে?' ফুজায়ল উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, আছে।

---

৮৮. আবু নুআইম আল-আসবাহানি, *হিলইয়াতুল আউলিয়া*, ৮/১০৫। অপরদিকে *সহিহ মুসলিম* গ্রন্থে হাদিসটি নিম্নোক্ত শব্দে এসেছে—

«مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ»

আল্লাহ তাআলা যে বান্দাকে জনগণের দায়িত্ব দিয়েছেন, সে যদি খিয়ানতকারীরূপে মারা যায়, তাহলে আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন। [*সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ১৪২]

আমার কাছে আমার রবের একটি পাওনা আছে, যার হিসাব তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে। তিনি যদি আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন, তাহলে তো আমার দুর্ভোগ! তিনি যদি আমাকে প্রশ্ন করেন, তাহলে তো বড় দুর্যোগ! সেই সঙ্গিন মুহূর্তে তিনি যদি আমাকে সঠিক উত্তর প্রদানের তাওফিক দান না করেন, তাহলে তো আমার কঠিন বিপদ!'

হারুনুর রশিদ বললেন, 'আমি তো মানুষের ঋণের কথা জিজ্ঞেস করেছি।' এবার ফুজায়ল বললেন, 'আমার রব তো আমাকে এর আদেশ করেননি; তিনি আমাকে তার সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি নিষ্ঠার সঙ্গে আদায় করার এবং তার বিধান পালন করার আদেশ করেছেন।'

হারুনুর রশিদ বললেন, 'এখানে এক হাজার দিনার আছে। এগুলো গ্রহণ করুন; আপনার পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করবেন এবং এর দ্বারা আপনার রবের ইবাদতে শক্তি গ্রহণ করবেন।'

ফুজায়ল বললেন, 'সুবহানাল্লাহ! আমি আপনাকে দেখাচ্ছি ন্যায় ও কল্যাণের পথ আর আপনি আমাকে তার প্রতিদান দিচ্ছেন এগুলো দিয়ে! আল্লাহ আপনাকে নিরাপদ রাখুন এবং কল্যাণের তাওফিক দান করুন।' ফুজায়ল দিনারগুলো গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালেন।

ফজল বিন রবি বলেন, এরপর ফুজায়ল চুপ হয়ে গেলেন এবং আমাদের সঙ্গে আর কোনো কথা বললেন না। আমরা তার কাছ থেকে বের হয়ে এলাম। খলিফা আমাকে বললেন, 'তুমি যদি আমাকে কোনো ব্যক্তির কাছে নিয়ে যাও, তাহলে এমন ব্যক্তির কাছেই নিয়ে যেয়ো।'[৮৯]

[তিন]

আমিরুল মুমিনিন আবু জাফর আল-মানসুর একবার আবু আমর আওযায়ি রহ.-কে তার দরবারে আহ্বান করলেন। আওযায়ি রহ. খলিফার দরবারে উপস্থিত হয়ে তাকে সালাম করলে খলিফা মানসুর তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আওযায়ি, আমাদের কাছে আসতে বিলম্ব করলেন যে?!'

'আমিরুল মুমিনিন, আমার কাছে কী চাচ্ছেন?' আওযায়ি জিজ্ঞেস করলেন।

'আপনার কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করতে চাই।' খলিফা উত্তর দিলেন।

---

৮৯. আবু নুআইম আল-আসবাহানি, *হিলইয়াতুল আউলিয়া*, ৮/১০৫-১০৭।

'আমিরুল মুমিনিন, তাহলে আমার কথা লক্ষ করে শুনুন; কোনোকিছু সম্পর্কে যেন অজ্ঞতা থেকে না যায়।'

'আমি কীকরেই-বা অজ্ঞ থাকব?' খলিফা অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আমিই তো আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি এবং আপনার নির্দেশনা কামনা করছি।'

'(অজ্ঞ থাকা বলতে বুঝিয়েছি) আমি যা বলব, আপনি তা শুনবেন; কিন্তু আমল করবেন না।' আওযায়ি রহ. উত্তর দিলেন।

আওযায়ি রহ.-এর কথা শুনে দরবারে উপবিষ্ট খলিফা মানসুরের উজির রবি চিৎকার করে উঠলেন এবং তরবারির দিকে হাত বাড়ালেন। কিন্তু খলিফা তাকে ধমক দিয়ে বললেন, 'রবি, এটা দণ্ডদানের মজলিস নয়; অর্জন ও প্রদানের মজলিস।'

খলিফার কথা শুনে আওযায়ি রহ.-এর মন প্রসন্ন হয়ে গেল এবং তিনি মন খুলে কথা বলতে লাগলেন। তিনি বললেন, 'আমিরুল মুমিনিন! মাকহুল আমাকে ইবনে বুসরের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

«أَيُّمَا عَبْدٍ جَاءَتْهُ مَوْعِظَةٌ مِنَ اللهِ فِيْ دِيْنِه فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ مِنَ اللهِ سِيْقَتْ إِلَيْهِ، فَإِنْ قَبِلَهَا بِشُكْرٍ وَإِلَّا كَانَتْ حُجَّةً عَلَيْهِ مِنَ اللهِ لِيَزْدَادَ بِهَا إِثْمًا، وَيَزْدَادَ اللهُ بِهَا عَلَيْهِ سَخْطَةً»

> বান্দার কাছে যখন দ্বীনি কোনো বিষয়ে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হিতোপদেশ আসে, (বিশ্বাস করতে হবে যে,) নিঃসন্দেহে তা আল্লাহ তাআলার এক নিয়ামত; এর মাধ্যমে তাকে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। যদি সে তা শোকরের সঙ্গে গ্রহণ করে, তাহলে তা তার জন্য কল্যাণকর হবে; অন্যথায় সেই সদুপদেশ তার গোনাহ বৃদ্ধি এবং তার প্রতি আল্লাহ তাআলার ক্রোধ বৃদ্ধির জন্য আল্লাহ তাআলার একটি দলিল হবে।

আমিরুল মুমিনিন, মাকহুল আমাকে ইবনে বুসর হতে আরও বর্ণনা করেছেন যে, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে দায়িত্বশীল ব্যক্তি আপন অধীনস্থদের সঙ্গে প্রতারণা করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন।

'আমিরুল মুমিনিন, যে হক ও সত্য বিষয়কে অপছন্দ করে, সে তো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলাকেই অপছন্দ করে। কারণ, আল্লাহ তাআলাই তো সুস্পষ্ট হক।

'আমিরুল মুমিনিন, আপনি তো জনসাধারণের পরিবর্তে কেবল আপনাকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। নানা বর্ণের মুসলিম-অমুসলিম সকল জনসাধারণ তো এখন আপনার অধীনস্থ। প্রত্যেকের আপনার কাছ থেকে ন্যায় আচরণ পাওয়ার অধিকার আছে। তখন কেমন পরিস্থিতি হবে, যখন তারা দলে দলে আপনার পিছু নেবে? প্রত্যেকেই আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনবে যে, আপনি তাদের জীবনে কোনো দুর্যোগ টেনে এনেছেন বা কোনো জুলুম করেছেন।

'আমিরুল মুমিনিন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন উম্মতের প্রতি দয়ালু ও অনুগ্রহশীল ছিলেন। নবীজির অস্তিত্ব ও উপস্থিতিও উম্মতের জন্য সান্ত্বনা ছিল। তিনি উম্মতের মাঝে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাদের ক্রটি গোপন রেখেছেন। উম্মতের জন্য তার গৃহদ্বার উন্মুক্ত ছিল, রুদ্ধ ছিল না। উম্মতের নিয়ামতপ্রাপ্তিতে তিনি আনন্দিত হয়েছেন, উম্মতের দুর্যোগ ও বিপদে তিনি ব্যথিত ও বিষণ্ন হয়েছেন।

'আমিরুল মুমিনিন, মাকহুল আমাকে যিয়াদ বিন জারিয়ার সূত্রে হাবিব বিন মাসলামা রাযি. হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার অনিচ্ছাকৃতভাবে জনৈক বেদুইনকে আঁচড় দিয়ে ফেলার পর নিজেই তাকে প্রতিশোধ নিতে অনুরোধ করলেন। আঁচড় দেওয়ার পর জিবরাইল আ. এসে নবীজিকে বললেন, "হে মুহাম্মাদ, আল্লাহ তাআলা আপনাকে স্বেচ্ছাচারী ও অহংকারী হিসেবে প্রেরণ করেননি।" তখন নবীজি বেদুইন লোকটিকে ডেকে বললেন, "আমার কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করো।" বেদুইন সাহাবি উত্তরে বলল, "আল্লাহর রাসুল, আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক! আপনি যদি আমার বিরুদ্ধে কিছু করেনও, তবু আমি কক্ষনো তার প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা করব না।" তখন নবীজি তার জন্য কল্যাণের দোয়া করেন।

আমিরুল মুমিনিন, তাহলে বলুন, যে ব্যক্তি সমাজে রক্তপাত ঘটায়, মানুষ হত্যা করে, ঘরবাড়ি ধ্বংস করে এবং নির্বাসনে বাধ্য করে, তার অবস্থা কীরূপ হবে?

'আমিরুল মুমিনিন, আপনি আপনার কল্যাণের জন্য আপন নফস ও প্রবৃত্তিকে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলুন আর নফসের নিরাপত্তা আপনার রবের কাছ থেকে গ্রহণ করুন। এমন জান্নাতের প্রতি প্রত্যাশী হোন, যার বিস্তৃতি আসমান-জমিনের ন্যায়; যে জান্নাত সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

«لَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»

> জান্নাতে তোমাদের কারও ধনুকের দূরত্ব পরিমাণ স্থান দুনিয়া ও তাতে যা কিছু আছে, সবকিছুর চেয়ে উত্তম।দ

'আমিরুল মুমিনিন, ক্ষমতা তো চিরস্থায়ী নয়। তাই যদি হতো, তাহলে আপনার পূর্বে যারা ক্ষমতা ও খিলাফতের অধিকারী হয়েছিল, ক্ষমতা তাদের কাছেই থাকত, আপনার পর্যন্ত পৌঁছত না। সুতরাং, তাদের মতো আপনার ক্ষমতাও চিরদিন থাকবে না।

﴿مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّآ اَحْصٰهَا﴾

> এটা কেমন কিতাব, যা আমাদের ছোট-বড় যত কর্ম আছে, সবই পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব করে রেখেছে?! [সুরা কাহফ : ৪৯]

'আমিরুল মুমিনিন, এই আয়াতটির ব্যাখ্যায় আপনার পিতামহ (আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি.) কী বলেছেন, জানেন?

'এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন—আয়াতে ছোট দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মৃদু হাসি, আর বড় দ্বারা উদ্দেশ্য স্বাভাবিক আওয়াজের হাসি। তাহলে ভেবে দেখুন, কথা ও কাজের হিসাব কীরূপ হবে?!

'আমিরুল মুমিনিন, আমার কাছে এ বর্ণনাও পৌঁছেছে যে, হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. বলেছেন—"ফুরাতের তীরে একটি মেষশাবকও যদি অবহেলিত অবস্থায় মারা যায়, আমার আশঙ্কা হয় যে, আল্লাহ আমাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।" তাহলে আপনার চাটাইয়ে বসেও যে ব্যক্তি আপনার ন্যায় আচরণ হতে বঞ্চিত হবে, তার ক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের আচরণ কী হতে পারে?!

'আমিরুল মুমিনিন, আপনি তো বিরাট এক পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। আকাশমণ্ডল, পৃথিবী ও পর্বতমালাকে যদি এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে বলা

হতো, অবশ্যই তারা শঙ্কিত হয়ে অস্বীকৃতি জানাত। ইয়াযিদ আমাকে জাবির বিন আবদুর রহমানের সূত্রে আবু আমরা আনসারি রাযি. হতে বর্ণনা করেছেন যে, উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. জনৈক আনসারিকে সদকা উসুলের দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন। কয়েকদিন পরও তিনি তাকে মদিনাতেই দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি তোমার কর্মস্থলে যাচ্ছ না কেন? তুমি কি জানো না যে, তোমার জন্য মুজাহিদদের সমপরিমাণ সাওয়াব রয়েছে?"

সে উত্তর দিলো, "না।"

উমর জিজ্ঞেস করলেন, "তাহলে?!"

আনসারি বলল, "আমি জানতে পেরেছি যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

«مَا مِنْ وَالٍ يَلِيْ شَيْئًا مِنْ أُمُوْرِ النَّاسِ إِلَّا يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُوْقَفُ عَلَى جِسْرٍ مِنْ نَارٍ، فَيَنْتَفِضُ بِهِ الْجِسْرُ انْتِفَاضًا يُزِيْلُ كُلَّ عُضْوٍ مِنْهُ عَنْ مَوْضِعِهِ، ثُمَّ يُعَادُ فَيُحَاسَبُ، فَإِنْ كَانَ مُحْسِنًا نَجَا بِإِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيْئًا انْخَرَقَ بِهِ ذٰلِكَ الْجِسْرُ فَهَوٰى بِهِ فِي النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا»

যে ব্যক্তি জনগণের কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করবে, কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের একটি সেতুর ওপর দাঁড় করানো হবে। তখন তাকে নিয়ে সেতুটি এমনভাবে ধসে পড়বে যে, তার প্রত্যেক অঙ্গ স্থানচ্যুত হয়ে যাবে। এরপর তাকে পুনরায় দাঁড় করিয়ে তার হিসাব গ্রহণ করা হবে। যদি সে সৎকর্মশীল হয়ে থাকে, তাহলে তার সৎকর্মের মাধ্যমে নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে। আর যদি সে মন্দ হয়ে থাকে, তাহলে সেতুটি তাকে নিয়ে ভেঙে পড়বে এবং সত্তর খারিফ (সত্তর হাজার বছরের পথ) নিচে পতিত হবে।"[৯০]

উমর রাযি. বললেন, "তুমি কার কাছ থেকে এ হাদিস শুনেছ?"

"আবু যর ও সালমান থেকে।" আনসারি লোকটি উত্তর দিলো।

---

৯০. আবু বকর বায়হাকি, *শুআবুল ঈমান*, ৯/৫০৭ ও আবু নুআইম আল-আসবাহানি, *হিলইয়াতুল আউলিয়া*, ৬/১৩৮।

তখন উমর রাযি. তাদের দুজনের কাছে লোক পাঠিয়ে এ হাদিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। উভয় সাহাবি জানালেন যে, তারা নবীজির কাছ থেকে এ হাদিসটি শুনেছেন। উমর বললেন, "হায়! তাহলে উমরের কী অবস্থা হবে! এই পরিণাম সামনে রেখে কে দায়িত্ব গ্রহণ করবে?" আবু যর রাযি. বললেন, "আল্লাহ যার নাক কর্তিত করবেন এবং গণ্ডদেশ মাটিতে মিশিয়ে দেবেন!"

আওযায়ি রহ.-এর উপদেশ শুনে খলিফা আবু জাফর আল-মানসুর রুমাল নিয়ে চেহারায় রাখলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে লাগলেন। তিনি নিজে অঝোর ধারায় কাঁদলেন, আওযায়ি রহ.-কেও কাঁদালেন। এরপর কান্নারত অবস্থায়ই ইমাম আওযায়ি রহ. বললেন, 'আমিরুল মুমিনিন! আপনার পিতামহ হজরত আব্বাস রাযি. নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে মক্কা ও তায়েফের প্রশাসনিক দায়িত্ব প্রার্থনা করেছিলেন। নবীজি তাকে বলেছিলেন, "হে আব্বাস, হে নবীর চাচা, যে দায়িত্ব আপনি যথার্থভাবে পালন করতে পারবেন না, তা গ্রহণ করার চেয়ে দায়িত্বমুক্ত থাকা শ্রেয়।" এটি ছিল আপন চাচার প্রতি নবীজির কল্যাণকামিতা ও দয়ানুভূতি। কারণ, তিনি তো আল্লাহর দরবারে চাচার কোনো কাজে আসবেন না।

যখন আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাজিল করেন—

﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾

> এবং হে নবী, আপনি আপনার নিকটতম খান্দানকে সতর্ক করে দিন। [সুরা শুআরা : ২১৪]

তখন নবীজি বলেন, "হে আব্বাস, হে নবীর ফুফু সাফিয়্যা, আল্লাহর দরবারে আমি আপনাদের কোনো কাজে আসব না। সাবধান! আমার আমল আমার কাজে আসবে, আপনাদের আমল আপনাদের কাজে।"

উমর রাযি. বলেছেন, "জনসাধারণের শাসনদায়িত্ব সে-ই পালন করতে পারে, যে বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ, দূরদর্শী ও সচেতন হয়। সে কারও গোপন দোষত্রুটি তালাশ করে না, কারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে না। আল্লাহর দ্বীন বাস্তবায়নে সে কোনো নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করে না।"

উমর রাযি. আরও বলেছেন, শাসক চার শ্রেণির হয়ে থাকে।

১. শক্তিশালী শাসক; যে নিজেকেও সংযত রাখে, অধীনস্থ কর্মকর্তাদেরকেও নিবৃত্ত রাখে। তার মর্যাদা আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদের ন্যায়। আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহ তার প্রতি প্রসারিত থাকে।

২. দুর্বল শাসক; যে নিজেকে নিবৃত্ত রাখে আর কর্মকর্তাদেরকে ছেড়ে রাখে। আল্লাহ দয়া ও অনুগ্রহ না করলে সে ধ্বংসের প্রান্তসীমায় পৌঁছে যায়।

৩. যে শাসক কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে নিবৃত্ত রাখে আর নিজেকে ছেড়ে রাখে। এ শাসকই হলো সেই অত্যাচারী শাসক, যার সম্পর্কে নবীজি বলেছেন, "সবচেয়ে নিকৃষ্ট রাখাল (শাসক ও দায়িত্বশীল) হচ্ছে অত্যাচারী শাসক।" সে কেবল নিজেই ধ্বংস হয়।

৪. এমন শাসক, যে নিজেকেও ছেড়ে রাখে, কর্মকর্তাদেরকেও ছাড় দিয়ে রাখে। ফলে নিজেও ধ্বংস হয়, অন্যরাও ধ্বংস হয়।

'আমিরুল মুমিনিন, আমার কাছে এ বর্ণনাও পৌঁছেছে যে, উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. বলেছেন, "হে আল্লাহ, যখন আমার সামনে বাদী-বিবাদী উপস্থিত থাকে, তখন যদি আমি কাছ থেকে বা দূর থেকে (প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে) হকের বিষয়ে কোনো হস্তক্ষেপ করি, তাহলে আমাকে চোখের পলক পরিমাণও অবকাশ দেবেন না।"

'আমিরুল মুমিনিন, সবচেয়ে কঠিন দাবি হচ্ছে আল্লাহর হক নিয়ে আল্লাহর সামনে দাঁড়ানো। আর আল্লাহর কাছে সর্বাধিক মর্যাদার বিষয় হচ্ছে তাকওয়া। যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে মর্যাদা পেতে চায়, আল্লাহ তার মর্যাদা বুলন্দ করেন আর যে মর্যাদা খুঁজে বেড়ায় আল্লাহর অবাধ্যতায়, আল্লাহ তাকে অপদস্থ ও হীনবল করেন।

'এই হলো আমার নসিহত। আসসালামু আলাইকুম।'

কথা শেষ করে আওযায়ি রহ. উঠে দাঁড়ালেন। খলিফা আল-মানসুর জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় যাচ্ছেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'আমিরুল মুমিনিন, অনুমতি দিলে ইনশাআল্লাহ আপন এলাকায় ফিরে যাব।'

খলিফা আল-মানসুর বললেন, 'অনুমতি দিচ্ছি আর আপনার সদুপদেশের জন্য আল্লাহর শোকর আদায় করছি। আল্লাহই নেক কাজের

তাওফিকদাতা, তিনিই সৎকর্মে সহায়তাকারী। আমার প্রতি আপনার এই পর্যবেক্ষণ যেন ভবিষ্যতেও বজায় থাকে; আমাকে তা থেকে বঞ্চিত করবেন না। আপনার নসিহত সর্বদা সাদরে গৃহীত হবে, কোনো অভিযোগ থাকবে না।'

'ইনশাআল্লাহ, করব।' আওযায়ি রহ. উত্তর দিলেন।

এরপর খলিফা পথখরচ হিসেবে আওযায়ি রহ.-কে কিছু অর্থ প্রদান করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু আওযায়ি তা গ্রহণ করতে সম্মত হলেন না। তিনি বললেন, 'আমার এ অর্থের প্রয়োজন নেই। আর আমি আমার নসিহতকে পুরো দুনিয়ার সম্পদের বিনিময়েও বিক্রি করতে রাজি নই।' খলিফা আল-মানসুর আওযায়ির আদর্শ ও নীতির কথা জানতেন। তাই তার এই প্রত্যাখ্যানের কারণে খলিফা অসন্তুষ্ট হলেন না।[৯১]

মোটকথা, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, আব্বাসি খিলাফতের প্রথম স্তরের খলিফাগণ হতে কিছু ভুলক্রটি অবশ্যই সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু তাদের ব্যক্তিত্বের বিচার করার ক্ষেত্রে আমার-আপনার অবশ্যই বস্তুনিষ্ঠ ও বাস্তবধর্মী মূল্যায়ন করতে হবে। উম্মাহর বিদগ্ধ উলামায়ে কেরামের মতে একজন মুসলমানের মন্দের তুলনায় সৎকর্মের মান ও পরিমাণ যদি অধিক হয়, তাহলে তাকে ন্যায়পরায়ণ ও আস্থাভাজন মুসলমান বিবেচনা করতে হবে। এই মূলনীতিটি সব সময় মনে রাখুন। আর যারা মুসলমানদের যাবতীয় কীর্তি ও কৃতিত্বের আলোচনা বাদ দিয়ে কেবল মন্দ বিষয়গুলোকে বড় করে দেখাতে চায় এবং ইসলামি ইতিহাসের প্রতি আমাদের আস্থা ও বিশ্বাসের জায়গাটি নড়বড়ে করে দিতে চায়, কখনোই তাদের পেছনে পরিচালিত হবেন না।

---

[৯১]. আবু নুআইম আল-আসবাহানি, *হিলইয়াতুল আউলিয়া*, ৬/১৩৬-১৪০।

আল-আমিন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ[৯২] বিন হারুনুর রশিদ বিন মাহদি বিন মানসুর

[জুমাদাল উখরা ১৯৩ হিজরি—মুহাররম ১৯৮ হিজরি]
[মার্চ ৮০৯ খ্রিষ্টাব্দ—সেপ্টেম্বর ৮১৩ খ্রিষ্টাব্দ]

খলিফা আল-আমিনের জন্ম ১৭০ হিজরি সনে বাগদাদে। তিনি তেইশ বছর বয়সে ১৯৩ হিজরি সনে পিতার স্থলাভিষিক্ত হন।

খলিফা আমিনের শাসনামল বেশি দীর্ঘ হতে পারেনি। খলিফা ও তার ভাই মামুনের মধ্যকার দুঃখজনক বিরোধ ও সংঘাতকে কেন্দ্র করে একদিকে আমিনের খিলাফতের অবসান ঘটে, অপরদিকে মুসলিম উম্মাহর মাঝেও ভাঙন সৃষ্টি হয়।

মামুন বয়সে বড় হওয়া সত্ত্বেও খলিফা হারুনুর রশিদ আপন উত্তরাধিকারী হিসেবে তার পরিবর্তে আমিনের নামে বায়আত গ্রহণ করেছিলেন। আমিনকে প্রাধান্যদানের একমাত্র কারণ ছিল, তিনি ছিলেন হারুনুর রশিদের প্রিয়তমা স্ত্রী জুবায়দার পুত্র।

পরে অবশ্য হারুনুর রশিদ আপন ভুলের প্রতিকার বিধানের চেষ্টা করেন। কিন্তু ভুল সংশোধন করতে গিয়ে তিনি এমন এক সিদ্ধান্ত নেন, যার ফলে ক্ষতির মাত্রা আরও বৃদ্ধি পায়। তিনি প্রথমে আমিনের পরবর্তী খলিফা বা দ্বিতীয় ওলিয়ে আহদ হিসেবে মামুনের নাম ঘোষণা করেন; এরপর মামুনকে খোরাসান ও রায় অঞ্চলের স্বতন্ত্র ক্ষমতা প্রদান করেন। ফলে আব্বাসি সাম্রাজ্যে আমিন ও মামুন দুই ভাইয়ের অধীনে আলাদা আলাদা সেনাবাহিনী তৈরি হয়। হারুনুর রশিদ এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ না থেকে

---

৯২. খলিফা হারুনুর রশিদের ছয়জন পুত্রের নাম ছিল মুহাম্মাদ, যাদের মধ্য হতে দুজন পরবর্তীকালে খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হন—১. আল-আমিন মুহাম্মাদ ২. আল-মুতাসিম মুহাম্মাদ।

তার আরেক পুত্র কাসিমকে তৃতীয় ওলিয়ে আহদ ঘোষণা করেন এবং তাকে জাযিরা ও আর্মেনিয়া অঞ্চলের প্রশাসনক্ষমতা প্রদান করেন।

ফলে খলিফা হওয়ার পর আমিন ইসলামি সাম্রাজ্যের একটি খণ্ডিত অংশের কর্তৃত্ব লাভ করেন। আব্বাসি সাম্রাজ্যের বিরাট অংশ এবং সেখানকার জনগণ ও সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব তখন তার অপর দুই ভাইয়ের হাতে। খলিফা আমিনের মনে হচ্ছিল—তিনি যেন দু-ডানাকাটা এক পাখি!

খলিফা হারুনুর রশিদের দরবারে উজির ফজল বিন রবি-এর উপস্থিতিও পরিস্থিতি জটিলকরণে বড় ভূমিকা রেখেছিল। ফজলই হারুনুর রশিদকে এসব সিদ্ধান্ত নিতে এবং বারমাকি পরিবারকে নির্মূল করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। হারুনুর রশিদের মৃত্যুর পর ফজল এবার নতুন খলিফা আমিনের পক্ষাবলম্বন করেন। আমিনের যদিও ভাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিগ্রহে জড়ানোর ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু ফজল তাকে মামুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্ররোচিত করেন। নিজের স্বার্থহানির ভয়ই মূলত ফজলকে এরূপ করতে উৎসাহ যুগিয়েছিল।

উজির ফজল বিন রবির প্ররোচনায় দুই ভাইয়ের মধ্যকার বিরোধ একসময় যুদ্ধে গড়ায়। বাস্তব কথা হলো, খলিফা আমিনের রাষ্ট্রপরিচালনার যথেষ্ট প্রশাসনিক যোগ্যতা ছিল না। তিনি আমোদ-প্রমোদেই অধিক ব্যস্ত থাকতেন। তার বিশ্বাস ছিল যে, তিনি সহজেই তার ভাইকে পরাভূত করতে পারবেন। অপরদিকে মামুন আপন কর্মদক্ষতা ও সুষ্ঠু প্রশাসনিক যোগ্যতার মাধ্যমে তার দরবারে সমকালীন খ্যাতনামা জ্ঞানী-গুণী, আলিম-উলামা ও ফুকাহায়ে কেরামকে সমবেত করতে সক্ষম হন। তিনি তাদের সাহচর্য অবলম্বন করতেন এবং তাদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। ফলে আলিমসমাজের অন্তরে তার প্রতি প্রীতি ও হৃদ্যতা তৈরি হয়। সংক্ষেপ কথা, মামুনের জনৈক সেনাপতির হাতে আমিনের হত্যার মাধ্যমে এই সংঘাতের সমাপ্তি ঘটে এবং জনগণ মামুনের নামে বায়আত গ্রহণ করে।

ষষ্ঠ আব্বাসি খলিফা আমিন ১৯৮ হিজরি সনে আটাশ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

আল-মামুন আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ বিন হারুনুর রশিদ বিন মাহদি বিন মানসুর

[মুহাররম ১৯৮ হিজরি—রজব ২১৮ হিজরি]
[সেপ্টেম্বর ৮১৩ খ্রিষ্টাব্দ—আগস্ট ৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দ]

খলিফা মামুনের জন্মও ১৭০ হিজরি সনে বাগদাদে। তার মা মারাজিল ছিলেন হারুনুর রশিদের দাসী। মামুন যে রাতে জন্মগ্রহণ করেন, সে রাতেই তৎকালীন খলিফা আল-হাদি মৃত্যুবরণ করেন এবং হারুনুর রশিদ খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মামুন আটাশ বছর বয়সে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

আমিনের শাসনামলে মামুন খোরাসানের মার্ভ নামক স্থানে অবস্থান করতেন। আমিনের পতনের পর তিনি মার্ভে অবস্থান করেই খিলাফতের দায়িত্ব পালনের সিদ্ধান্ত নেন এবং ২০৪ হিজরি সন পর্যন্ত তার শাসনামলের উল্লেখযোগ্য একটি সময় খোরাসানেই অবস্থান করেন। এরপর তিনি বাগদাদে ফিরে আসেন।

ইরাকে খলিফা আমিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে মামুনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় দুজন মহান ও নিষ্ঠাবান সেনাপতি সবিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন। তারা হলেন তাহির বিন হুসাইন ও হারছামা বিন আইয়ান। এ কারণে মামুন তার শাসনামলের শুরুর দিকে ইরাকের প্রশাসননিয়ন্ত্রণ তাদের দুজনের হাতেই ছেড়ে দিয়েছিলেন।

মার্ভে খলিফা মামুনকে প্রশাসনকার্য পরিচালনায় সহায়তা করতেন উজির ফজল বিন সাহল। তিনি মনে করতেন যে, মামুনের খিলাফত প্রতিষ্ঠায় তার যথেষ্ট অবদান রয়েছে। তাই মামুন খলিফা হওয়ার পর তিনি মামুনের ক্ষমতা ব্যবহার করে নিজের কর্তৃত্ব বিস্তারের মনস্থ করেন। কিন্তু ইরাকে তাহির ও হারছামার কর্তৃত্ব তার স্বপ্নপূরণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। উজির ফজল বিন সাহল তাহিরকে ইরাক ও পার্শ্ববর্তী

অঞ্চল থেকে বরখাস্ত করে সেখানে তার ভাই হাসান বিন সাহলকে নিয়োগ দেওয়ার জন্য খলিফাকে প্ররোচিত করেন। খলিফা মামুন তাহিরকে বরখাস্ত করলে তাহির তা মেনে নেন। এরপর ফজলের প্ররোচনাতেই হারছামাকে খোরাসানে ডেকে পাঠানো হয়। হারছামাও খলিফার নির্দেশ মেনে নেন এবং খোরাসান অভিমুখে রওনা হন।

তাহিরকে অপসারণের পর ইরাকে এ কথা ছড়িয়ে পড়ে যে—খোরাসানে উজির ফজল বিন সাহল খলিফা মামুনকে প্রাসাদে বন্দি করে রেখেছেন এবং ফজলই এখন তার মনমতো রাষ্ট্র পরিচালনা করছেন। ফলে ইরাকবাসী বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং নতুন প্রশাসক হাসান বিন সাহলকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। ইরাকের বিভিন্ন নগরীতে বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে। অবস্থা বেগতিক দেখে হাসান বিন সাহল হারছামা বিন আইয়ানের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে তাকে ইরাকে ফিরে আসার অনুরোধ করেন। হারছামা তখন খোরাসানের পথে ছিলেন। হাসানের আহ্বানে হারছামা ১৯৯ হিজরি সনের শাবান মাসে (৮১৫ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে) বাগদাদে ফিরে আসেন এবং বেশ কয়েকটি যুদ্ধের পর ২০০ হিজরি সনের মুহাররম মাসে (৮১৫ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে) পরিস্থিতি পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন। এসব বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলার অধিকাংশ সংঘটিত হয়েছিল আলাবিদের নেতৃত্বে।

কুফায় মুহাম্মাদ বিন ইবরাহিম বিন ইসমাইল বিন ইবরাহিম বিন হাসান (২য়) বিন হাসান (১ম) বিন আলির নেতৃত্বে বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। মক্কায় আরেক আলাবি নেতা হুসাইন বিন হাসান বিন আলি বিন হুসাইন বিন আলি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। মক্কায় যাদেরই আব্বাসি শাসক পরিবারের সঙ্গে হৃদ্যতা বা সম্পর্ক ছিল, তিনি তাদেরকে দমন করার জন্য কঠিন নির্যাতন চালান। আব্বাসিদের শাস্তি দেওয়ার জন্য 'দারুল আজাব' নামে একটি নির্যাতনকেন্দ্রও চালু করা হয়।

হুসাইন বিন হাসান বিন আলি যখন সংবাদ পান যে, আব্বাসি সেনাপতি হারছামা ইরাকে আলাবিদের দমন করে ফেলেছেন, তখন তিনি তার সঙ্গীদের নিয়ে মুহাম্মাদ বিন জাফর সাদিকের সঙ্গে মিলিত হন। মুহাম্মাদ বিন জাফর সাদিক একজন খোদাভীরু বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। জনগণ তাকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখত এবং ভালোবাসত। তৎকালীন অধিকাংশ আলাবি নেতার বিপরীতে তিনি শান্তিপ্রিয় ও সচ্চরিত্রের অধিকারী ছিলেন।

হুসাইনের সঙ্গীরা মুহাম্মাদ বিন জাফর সাদিকের হাতে খিলাফতের বায়আত গ্রহণের ইচ্ছাপ্রকাশ করে। তিনি প্রথমে অসম্মতি ও দ্বিধাপ্রকাশ করলেও পরে সম্মতি দান করেন। মক্কাবাসী ইচ্ছা-অনিচ্ছায় তার হাতে বায়আত গ্রহণ করে এবং তাকে 'আমিরুল মুমিনিন' সম্বোধন করতে থাকে। বেশ কয়েক মাস এভাবেই অতিবাহিত হয়। প্রকৃতপক্ষে মুহাম্মাদ বিন জাফর সাদিকের খিলাফত নামমাত্র ছিল এবং তার উল্লেখযোগ্য কোনো কর্তৃত্ব বা নিয়ন্ত্রণ ছিল না। মক্কায় অশান্তি সৃষ্টিকারী হুসাইন বিন হাসান বিন আলি এবং মুহাম্মাদ বিন জাফর সাদিকের পুত্র আলি ছিল অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্বভাবের লোক। এ সময় তারা মানুষের ওপর নানাবিধ জুলুম-নির্যাতন চালাচ্ছিল।

আব্বাসি সেনাপতি হারছামা বিন আইয়ান মক্কার বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য বাহিনী প্রেরণ করলে আব্বাসি বাহিনী বিদ্রোহী আলাবিদের পরাজিত করতে সক্ষম হয়। মুহাম্মাদ বিন জাফর নিজের ও সঙ্গীদের নিরাপত্তা প্রার্থনা করেন এবং মক্কা থেকে বেরিয়ে যেখানে ইচ্ছা চলে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তাদেরকে অনুমতি প্রদান করে তিনদিনের অবকাশ দেওয়া হয়। তিনদিন শেষ হওয়ার পর হারছামার সৈন্যরা মক্কায় প্রবেশ করে নগরীর নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করে।

মক্কাবিদ্রোহের সফল সমাধানের পর সেনাপতি হারছামা মার্ভে গিয়ে খলিফা মামুনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ইরাকের প্রকৃত পরিস্থিতি তুলে ধরার মনস্থ করেন। কারণ, খলিফার প্রতি ইরাকি জনগণের অসন্তোষ এবং ফজল বিন সাহলের স্বেচ্ছাচারিতা সম্পর্কে খলিফা মোটেও অবহিত ছিলেন না। কিন্তু উজির ফজল এই নিষ্ঠাবান সেনাপতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন এবং খলিফাকে বোঝাতে সক্ষম হন যে, হারছামা আব্বাসি সাম্রাজ্যে ফাসাদ সৃষ্টি করে সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। হারছামা যখন খলিফার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য রওনা হন, তখন পথেই তার কাছে খলিফার বার্তা পৌঁছায় এবং তাকে ফিরে গিয়ে শাম ও হিজাযের গভর্নরের দায়িত্ব গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু হারছামা খলিফার সঙ্গে সাক্ষাৎ ব্যতিরেকে না ফেরার সিদ্ধান্ত নেন। মার্ভের কাছাকাছি পৌঁছার পর হারছামা আশঙ্কা করেন যে, তার আগমনের সংবাদ হয়তো খলিফা মামুনের কাছে গোপন রাখা হবে। তাই তিনি দামামা বাজিয়ে খলিফার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন। খলিফা আওয়াজের উৎস সম্পর্কে জিজ্ঞেস

করায় তাকে জানানো হয় যে, হারছামা নগরীর কাছে উপস্থিত হয়ে শক্তিপ্রদর্শন করছে।

হারছামা জানতেন না যে, ইতিমধ্যে পাশার দান উল্টে গেছে এবং তার প্রতি মামুনের মনোভাব পরিবর্তন হয়ে গেছে। তিনি খলিফার সামনে উপস্থিত হলে খলিফা তার কোনো কথার শোনার পরিবর্তে তাকে বন্দি করার নির্দেশ দেন। খলিফার নির্দেশে হারছামাকে টেনে হিঁচড়ে জিন্দানখানায় নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর খলিফার সৈন্যরা তাকে পদদলিত করে হত্যা করে এবং প্রচার করে যে, তিনি মারা গেছেন।

হারছামার সঙ্গে এই অমানবিক আচরণের সংবাদ বাগদাদে পৌঁছলে সেখানকার সেনাবাহিনী উত্তেজিত হয়ে হাসান বিন সাহলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং তার পরিবর্তে খলিফা মামুনের চাচা মানসুর বিন মাহদিকে নিজেদের প্রশাসক নির্ধারণ করে। বাগদাদ ও ইরাক কার্যত খলিফার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। বাগদাদে যেহেতু তখন শক্তিশালী ও নিয়মিত কোনো বাহিনী ছিল না, তাই বাগদাদের নিয়ন্ত্রণ চলে যায় বিশৃঙ্খলাকারীদের হাতে। দুরাচার ও মন্দ শ্রেণির সৈনিকরা রাহাজানি শুরু করে, প্রকাশ্যে নারী ও শিশুদের ধরে নিয়ে যায় এবং জনসাধারণের ওপর জোরপূর্বক বিভিন্ন কর আরোপ করে। তাদেরকে বাধা দেওয়ার মতো কেউ তখন বাগদাদে ছিল না।

পরিস্থিতির ভয়াবহতা ও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে খলিফা মামুনের নীরব ভূমিকা প্রত্যক্ষ করে ইরাকের বিভিন্ন অঞ্চলের সৎ ও কল্যাণকামী নেতৃবৃন্দ অগ্রসর হয়। তারা পরস্পর যোগাযোগ করে এসব সন্ত্রাসীদের দমনের বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়। খালিদ দারইয়ুশ নামক জনৈক ব্যক্তি নিজ এলাকায় শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারে কাজ শুরু করেন। তার আহ্বানে আশেপাশের লোকজনও তাকে সহযোগিতা করে। সবাইকে সঙ্গে নিয়ে খালিদ বিশৃঙ্খলাকারীদের বাধা প্রদান করেন এবং ন্যায়ের পথে ফিরে আসার আহ্বান জানান। দুরাচার সন্ত্রাসীরা তার আহ্বানে সাড়া দিতে অস্বীকৃতি জানালে তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে পরাজিত করেন। কিছু সন্ত্রাসীকে আটক করে বাগদাদ-প্রশাসকের হাতে তুলে দেওয়া হয়। খালিদ দারইয়ুশ মনে করতেন যে, প্রশাসকের বিরুদ্ধাচরণ করার অধিকার তার নেই। সালামা বিন সালামা আনসারি নামক জনৈক ব্যক্তিও নিজ অঞ্চলে একই ভূমিকা পালন করেন।

উজির ফজল বিন সাহলের 'কল্যাণে' মার্ভে অবস্থানরত খলিফা মামুনের কাছে বাগদাদের কোনো সংবাদই পৌঁছত না। এ সময় মামুন অতি বিস্ময়কর এক কাণ্ড করে বসেন। তিনি নিজের ওলিয়ে আহদ ও পরবর্তী খলিফা হিসেবে আব্বাসি রাজপরিবারের কাউকে নির্বাচিত করার পরিবর্তে আলি বিন মুসা বিন জাফর সাদিক নামক জনৈক আলাবিকে নির্বাচিত করেন এবং তাকে 'রিযা মিন আলি মুহাম্মাদ' উপাধি দান করেন। খলিফা মামুন তার সেনাবাহিনীকে আব্বাসিদের প্রতীক হিসেবে পরিচিত কালো পোশাক বাদ দিয়ে সাম্রাজ্যের নতুন প্রতীক হিসেবে সবুজ পোশাক পরিধানের নির্দেশ দেন। সম্ভবত এ সবকিছু ঘটে পারসিক বংশোদ্ভূত উজির ফজল বিন সাহলের পরামর্শ ও প্রচেষ্টায়। পারসিকদের মনে-প্রাণে কামনা ছিল, মুসলমানদের ইমাম ও শাসক যেন কোনো আলাবি ব্যক্তি হয়। উজির ফজল বিন সাহলের প্রচেষ্টার পাশাপাশি আরেকটি বিষয় এসব সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করেছিল। আর তা হলো, স্বয়ং খলিফা মামুনও আলাবি চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তিনি খোলাফায়ে রাশিদিনের অন্য তিন সদস্যের তুলনায় আলি রাযি.-কে শ্রেষ্ঠ ও খিলাফতের অধিকতর উপযুক্ত মনে করতেন। শৈশবেই মামুনের মন-মস্তিষ্কে আলাবি চিন্তাধারার বীজ রোপণ করা হয়েছিল। শৈশবে তিনি প্রথমে জাফর বারমাকির[৯৩] কাছে প্রতিপালিত হয়েছিলেন। এরপর তিনি গ্রহণ করেন ফজল বিন রবি-এর সাহচর্য। আর এরা দুজনই ছিল শিয়া মতাদর্শ লালনকারী।

বাগদাদে বসবাসরত আব্বাসি রাজপরিবার স্বাভাবিকভাবেই খলিফা মামুনের এসব সিদ্ধান্তে চরম অসন্তুষ্ট হয়। তারা মামুনের আনুগত্য পরিত্যাগ করে মামুনের চাচা ইবরাহিম বিন মাহদির হাতে খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করে। এটি ২০২ হিজরি সনের ঘটনা।

অবশেষে বাগদাদের প্রকৃত পরিস্থিতি খলিফা মামুনের কর্ণগোচর হয়। কথিত আছে, মামুনের নির্বাচিত ওলিয়ে আহদ আলি রিযাই তাকে সবকিছু অবহিত করেন! তিনিই খলিফাকে জানান যে—তার ভাই আমিন নিহত হওয়ার পর থেকেই ইরাকের জনগণ কঠিন বিশৃঙ্খল পরিবেশে দিন

---

৯৩. পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, জাফর বারমাকি হারুনুর রশিদের খিলাফত আমলে নিহত হন। জাফর বারমাকির শিয়া মতাদর্শী হওয়ার এটিও একটি প্রচ্ছন্ন লক্ষণ যে, তিনিই আল-মামুনকে প্রতিপালন করেছিলেন আর পরবর্তী সময়ে আল-মামুন শিয়া মতাদর্শ-অনুরাগী হয়েছিলেন। [মূল গ্রন্থের টীকা]

গুজরান করছে, উজির ফজল বিন সাহল তার কাছ থেকে সবকিছু গোপন করছে এবং ফজলই ষড়যন্ত্র করে হারছামা ও অন্যদের হত্যা করেছে।

উজির ফজল বিন সাহলের প্রতারণা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার পর খলিফা মামুন বাগদাদে গমনের সিদ্ধান্ত নেন। খলিফা ফজলকেও তার সঙ্গী হতে বলেন। পথেই ফজল বিন সাহলকে হত্যা করা হয়, এরপর হত্যা করা হয় ওলিয়ে আহদ আলি রিযাকেও! মামুন নাহরাওয়ানে পৌঁছলে বাগদাদে বসবাসকারী আব্বাসি রাজপরিবারের সদস্যবৃন্দ ও সেনাপতিরা বেরিয়ে এসে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং তাকে অভিবাদন জানায়। অপসারিত সেনাপতি তাহির বিন হুসাইনও সাক্ষাৎ করে খলিফার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। ২০৪ হিজরি সনের সফর মাসে (৮১৯ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে) মামুন বাগদাদে প্রবেশ করেন। তার চাচা ইবরাহিম বিন মাহদি এ সময় পালিয়ে আত্মগোপন করেন। অবশ্য খলিফা মামুন তাকে ক্ষমা করে দেন।

ঐতিহাসিকগণের বর্ণনার আলোকে আমরা এ কথা দাবি করতে পারি যে, মূলত বাগদাদে প্রত্যাবর্তনের পরই খলিফা মামুনের প্রকৃত শাসনামল শুরু হয়। এ সময় থেকেই তার সুউচ্চ বৈশিষ্ট্য ও চারিত্রিক গুণাবলি উদ্ভাসিত হতে থাকে। খলিফা মামুন রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে দুর্বলতামুক্ত কোমল নীতি ও নিপীড়নমুক্ত কঠোর নীতি অবলম্বন করেন। মামুনের সুদক্ষ তত্ত্বাবধানে বাগদাদ আবারও হারুনুর রশিদের আমলের জৌলুস ও সৌন্দর্য ফিরে পায়। এ ছাড়াও মামুনের শাসনামলে বাগদাদে জ্ঞানবিজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চাও উচ্চতম শিখরে উপনীত হয়। এর বিবরণ সামনে আসবে, ইনশাআল্লাহ।

বাগদাদে প্রত্যাবর্তনের পর মামুন তার নতুন উজির হিসেবে আহমাদ বিন আবু খালিদকে নির্বাচন করেন। শামীয় বংশোদ্ভূত আহমাদ ছিলেন খলিফা মামুনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও নিষ্ঠাবান উজির। উজির আহমাদ বিন আবু খালিদ ২১১ হিজরি সনে মৃত্যুবরণ করেন। এরপর খলিফা মামুনের উজির মনোনীত হন আহমাদ বিন ইউসুফ। দরবারের হিংসুক শ্রেণির কিছু লোকের চক্রান্তে প্রভাবিত হয়ে খলিফা মামুন এই নিষ্ঠাবান উজিরকে বরখাস্ত করেন। তারপর মামুন উজির হিসেবে বেছে নেন ইয়াহইয়া বিন আকছামকে। ইয়াহইয়া বিন আকছাম ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ আলিম ও ফকিহ।

মাত্র বিশ বছর বয়সে তিনি বসরার বিচারক পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ২১৫ হিজরি সনে খলিফা মামুন তাকেও বরখাস্ত করেন।

৪০—দ্রষ্টব্য—০২

সুশাসনে বিজ্ঞ ও নিষ্ঠাবান সহকর্মীর ভূমিকা

নিম্নে আমরা খলিফা মামুনের দুজন উজিরের দুটি ঘটনা তুলে ধরছি। আশা করি—এর মাধ্যমে একদিকে উজির ও মন্ত্রী নির্বাচনে সতর্কতা ও দূরদর্শিতার প্রয়োজনীয়তা সুস্পষ্ট হবে, অপরদিকে একজন আদর্শ উজির বা অধীনস্থের আচরণ ও কর্মপন্থা কেমন হওয়া উচিত, তাও বোধগম্য হবে।

[এক]

খলিফা মামুন একদিন দরবারে আমর বিন মাসআদা[৯৪] সম্পর্কে বললেন, 'আমর তো কাজকর্মে যথেষ্ট ধীর ও মন্থর।' এরপর তিনি বললেন, 'আমর মনে করে যে, আমি তার খোঁজখবর জানি না; সে কী পছন্দ করে, মানুষের সঙ্গে কেমন আচরণ করে, কিছুই জানি না।'

দরবারে উজির আহমাদ বিন আবু খালিদও উপস্থিত ছিলেন। তিনি দরবার ত্যাগের পর আমরের কাছে গিয়ে তাকে খলিফার মন্তব্য সম্পর্কে অবহিত করলেন।

এরপর আমর দ্রুত খলিফার দরবারে উপস্থিত হলেন। তিনি তার তরবারি খলিফার সামনে রেখে বললেন, 'আমিরুল মুমিনিন! আমি তো এর যোগ্য নই যে, আমিরুল মুমিনিন কারও কাছে আমার বিষয়ে অভিযোগ করবেন কিংবা আমার দোষ গোপন করবেন। আমি তো এতটুকু গুরুত্বলাভেরও উপযুক্ত নই। সম্ভবত বিশেষ কোনো কল্যাণস্বার্থেই আমিরুল মুমিনিন কোনো বিষয় প্রকাশ করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন।' আমরের আচরণ-উচ্চারণে

---

৯৪. আবুল ফজল আমর বিন মাসআদা আব্বাসি আমলের একজন প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও কবি। তিনি খলিফা মামুনের খিলাফতকালে দিওয়ানে রাসাইলের প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন। মৃত্যু ২১৭ হিজরি সনে।

বিস্মিত খলিফা মামুন প্রশ্ন করলেন, 'কী ব্যাপার?! খুলে বলো।' আমর যা জানতে পেরেছেন, তা খলিফাকে জানালেন; কিন্তু সংবাদদাতার নাম বললেন না। তখন খলিফা বললেন, 'তোমার প্রতি আমি মন্দ বা অপছন্দনীয় কোনো ধারণা পোষণ করি না। সুতরাং শান্ত হও, সুধারণা রাখো।' একান্ত আস্থাভাজন আমরের প্রতি খলিফার মনোভাব আমর জেনে ফেলায় খলিফা মামুনের চেহারায় অপ্রস্তুতভাব ফুটে উঠল।

উজির আহমাদ যখন খলিফার দরবারে উপস্থিত হলেন, তখন খলিফা তাকে বললেন, 'দেখো তো আহমাদ! আমার দরবারের কি কোনো মানসম্মান নেই?!' তখনও খলিফা জানতেন না যে, উজির আহমাদই আমরকে দরবারের আলোচনা পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। আহমাদ খলিফাকে অসন্তুষ্টির কারণ জিজ্ঞেস করলে খলিফা তাকে জানালেন যে, তিনি একান্ত মজলিসে আমর সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন, দরবারে উপস্থিত কোনো হাশিমি ব্যক্তি তা আমরকে জানিয়ে দিয়েছে।

তখন উজির আহমাদ বললেন, 'আমিরুল মুমিনিন! বনু হাশিমের কেউ নয়; আমিই এ সংবাদ আমরকে জানিয়েছি। আর আমি এ কাজ করেছি আমিরুল মুমিনিনের প্রতি হৃদ্যতা, কল্যাণকামিতা ও কৃতজ্ঞতাবোধের দাবিতে। আমি চেয়েছি, প্রিয়জন ও সেবকদের প্রতি আপনার অনুগ্রহ-দান যেন পূর্ণতা লাভ করে। আমি জানি যে, কেবল প্রিয়জন ও আস্থাভাজনদেরই নয়; আমিরুল মুমিনিন তার শত্রু ও দুশমনদেরও সংশোধন কামনা করেন। বিশেষ করে আমর তো আপন কর্মদক্ষতা ও আনুগত্যগুণের কারণে আমিরুল মুমিনিনের অত্যন্ত আস্থাভাজন ব্যক্তি। আমিরুল মুমিনিনকে তার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করতে দেখে তার সংশোধনের উদ্দেশ্যে আমি তাকে বিষয়টি জানিয়ে দিয়েছি। আমার এই পদক্ষেপের কারণে যদি আমিরুল মুমিনিনের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়ে থাকে কিংবা কোনো গোপনীয় বিষয় ফাঁস হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে নিঃসন্দেহে আমি অবশ্যই অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ করেছি।'

উজির আহমাদের কথা শুনে খলিফা দীর্ঘক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'তুমি কীভাবে এ কথা বললে?' আহমাদ পুনরায় একই উত্তর দিলেন। খলিফা বললেন, 'আবার বলো।' আহমাদ আবারও একই কথা বললেন। এবার খলিফা মামুন বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি সঠিক কাজই করেছ। আর বিষয়টি যে আমাকে জানিয়ে দিলে, তা আমার কাছে তিন লক্ষ দিনারের চেয়েও প্রিয়।' এ কথা বলে খলিফা কনিষ্ঠাঙ্গুলি, অনামিকা ও মধ্যমা ভাঁজ করলেন। এরপর বললেন, 'এক লক্ষ হলো তোমার প্রতি আমার মন্দ ধারণা দূর করার কারণে।' এ কথা বলে খলিফা মধ্যমা ছেড়ে দিলেন। 'আর এক লক্ষ তোমার স্বতঃস্ফূর্ত সত্যকথনের কারণে।' এ কথা বলে তিনি অনামিকা ছেড়ে দিলেন। 'আর এক লক্ষ তোমার গোছানো ও চমৎকার উত্তরদানের কারণে।' এ কথা বলে খলিফা কনিষ্ঠ আঙুলও ছেড়ে দিলেন।

[দুই]

খলিফা মামুন একবার মুতআ বিয়ে বৈধ ঘোষণা কবার মনস্থ করলেন।[৯৫] খলিফার মনোবাসনা জানার পর উজির ইয়াহইয়া বিন আকছাম বিমর্ষচিত্তে খলিফার দরবারে উপস্থিত হলেন। খলিফা তাকে বিষণ্নতার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর

---

৯৫. সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোনো নারীকে বিয়ে করা হলে তাকে মুতআ বিয়ে বলে। জাহিলি যুগে যেসব বিয়ে-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, তার একটি হলো মুতআ। ইসলাম বিভিন্ন অনিবার্য কারণে অন্যান্য আরও অনেক বিধানের মতো মুতআ বিয়েকে প্রথমে বৈধ রাখলেও পরে তা চিরতরে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। সাহাবায়ে কেরামের যুগসহ সর্বযুগের উলামায়ে কেরামের ঐকমত্যে মুতআ বিয়ে ইসলামে হারাম। হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি. প্রথমে একে বৈধ বিবেচনা করলেও হজরত আলি রাযি. যখন তাকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত হাদিসটি সম্পর্কে অবগত করেন, তখন তিনিও আপন মত প্রত্যাহার করেন। [দ্রষ্টব্য : *জামে তিরমিজি*, হাদিস নং ১১০৪]।
ইছনা আশারিয়া (দ্বাদশবাদী) শিয়া মতাবলম্বীরা (ইসলামে নিষিদ্ধ) মুতআ বিয়েকে বৈধ মনে করে থাকে। অবশ্য তারা মুতআ বিয়ের যে পদ্ধতি অবলম্বন করে, তা ইসলামের প্রথম যুগেও বৈধ ছিল না। তাদের মতে মুতআ বিয়েতে স্ত্রীর সম্মতি, অভিভাবকের অনুমতি, আকদ, মোহর, সাক্ষী—কিছুরই প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ তাদের মুতআ মূলত ব্যভিচারেরই নামান্তর।

দিলেন, 'আমিরুল মুমিনিন, ইসলামে জিনা ও ব্যভিচারকে বৈধতাদানের দাবি তোলা হচ্ছে, তাই আমি চিন্তিত ও বিমর্ষ।' খলিফা মামুন অবাক হয়ে বললেন, 'ব্যভিচারের বৈধতা?!'

'হ্যাঁ, মুতআ বিয়ের অনুমোদন তো প্রকৃতপক্ষে ব্যভিচারেরই অনুমোদন।' ইয়াহইয়া উত্তর দিলেন।

খলিফা প্রশ্ন করলেন, 'তুমি এ কথা কীসের ভিত্তিতে বলছ?'

'কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে।' উজির ইয়াহইয়া বিন আকছাম উত্তর দিলেন। 'আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

﴿وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۝ اِلَّا عَلٰۤى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۝ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ﴾

যারা নিজ লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে। নিজেদের স্ত্রী ও মালিকানাধীন দাসীদের ছাড়া অন্য সকলের থেকে। কেননা, এতে তারা নিন্দনীয় হবে না। তবে কেউ এ ছাড়া অন্য পন্থা অবলম্বন করতে চাইলে তারা হবে সীমালঙ্ঘনকারী।

[সুরা মুমিনুন : ৫-৭]

আমিরুল মুমিনিন, মুতআ বিয়ের পত্নী কি মালিকানাধীন দাসী?'

খলিফা উত্তর দিলেন, 'না।'

ইয়াহইয়া এবার জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে মুতআ বিয়ের পত্নী কি শরিয়ত-নির্ধারিত স্ত্রী-অধিকার লাভ করে থাকে? সে কি স্বামীর মৃত্যুতে স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পদ লাভ করে? কিংবা তার মৃত্যুতে তার স্বামী কি তার পরিত্যক্ত সম্পদ লাভ করে? তার সন্তানরা কি পিতৃপরিচয় লাভ করে? মুতআ বিয়ের পত্নীর জন্য কি সেসব শর্ত ও অধিকার আছে, যেসব শর্ত ও অধিকার শরয়ি বিয়ের স্ত্রীর জন্য আছে?'

খলিফা উত্তর দিলেন, 'না।'

উজির ইয়াহইয়া বললেন, তাহলে এই দু-পন্থার বাইরে যারা যাবে, কুরআনের বিধান অনুসারে তো তারা সীমালঙ্ঘনকারী। আমিরুল মুমিনিন! যুহরি আবদুল্লাহ ও হাসান বিন মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়্যা হতে এবং তারা দুজন তাদের পিতা আলি বিন আবু তালিব রাযি. হতে বর্ণনা করেছেন যে, আলি রাযি. বলেছেন, 'নবীজি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন—আমি যেন পূর্বে ঘোষিত মুতআ বিয়ের বৈধতা বাতিল ঘোষণা করে হারাম ও নিষিদ্ধ হওয়ার কথা ঘোষণা করে দিই।' খলিফা মামুন জিজ্ঞেস করলেন, যুহরির বর্ণনাটি কি নির্ভরযোগ্য? ইয়াহইয়া জানালেন যে, ইমাম মালিক হাদিসটি রেওয়ায়েত করেছেন। তখন খলিফা বললেন, 'আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করছি।' এরপর খলিফা মুতআ বিয়ে হারাম হওয়ার ঘোষণা প্রদানের নির্দেশ দেন।

ইয়াহইয়া বিন আকছামের পর পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন উজির দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু বাস্তব কথা হলো, বারমাকিদের বিষয়ে হারুনুর রশিদের অভিজ্ঞতা, উজির ফজল বিন সাহলের প্রতি অতিনির্ভরতার কারণে শাসনামলের শুরুর দিকে খলিফা মামুনের নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতা ইত্যাদি কারণে মামুন পরবর্তী সময়ে তার উজিরদেরকে বড় ধরনের নির্বাহী ক্ষমতা দিতেন না। বরং তিনি নিজেই যাবতীয় বিষয়ে নিয়মিত খোঁজখবর রাখতেন; পাশাপাশি উজির নির্বাচনেও যথেষ্ট যাচাই-বাছাই করতেন।

খলিফা মামুনের শাসনামলেই ২০১ হিজরি সনে (৮১৬ খ্রিষ্টাব্দে) ভ্রান্ত 'খুররামিয়া' গোষ্ঠী আত্মপ্রকাশ করে। একদল ঐতিহাসিকের মতে পারস্যের একটি গ্রাম 'খুররাম'-এর প্রতি সম্বন্ধ করে তাদেরকে খুররামিয়া বলা হতো। অন্য আরেক দলের মত হলো—যেহেতু এ মতাদর্শের অনুসারীরা নিজেদের মনোবাসনাকেই দ্বীন মনে করত, মদ ও বিভিন্ন হারাম বস্তুকে বৈধ বিবেচনা করত, আপন মাহরামকে বিয়ে করা বৈধ মনে করত, এ কারণে তাদেরকে খুররামিয়া নামকরণ করা হয়। কারণ, প্রাচীন ফার্সি ভাষায় পছন্দনীয় বস্তুর প্রতি মনের আকর্ষণকে খুররাম বলা হতো। ভ্রান্ত গোষ্ঠীটির প্রধান আহ্বায়ক ছিল বাবাক খুররামি। বাবাক তার

অনুসারীদের নিয়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আব্বাসি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ত্রাস সৃষ্টি করেছিল। বেশ কয়েকটি যুদ্ধক্ষেত্রে বাবাক খলিফা মামুনের বাহিনীর বিরুদ্ধে জয়লাভ করে। একপর্যায়ে ২১৮ হিজরি সনে মামুন বাবাককে পরাস্ত করতে সেনাপতি ইসহাক বিন ইবরাহিমকে প্রেরণ করেন এবং ইসহাক খুররামি বাহিনীকে পরাজিত করতে সক্ষম হন। অবশ্য অভিযান সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই মামুন ইন্তেকাল করেন। তিনি খুররামিয়া সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ইসহাকের বাহিনীর বিজয়ের সংবাদ শুনে যেতে পারেননি। ইসহাকের বাহিনীর হাতে পরাজিত হওয়ার পরও খুররামিয়া সম্প্রদায়ের অপতৎপরতা অব্যাহত ছিল। অবশেষে ২২৩ হিজরি সনে (৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দে) অষ্টম আব্বাসি খলিফা আল-মুতাসিমের শাসনামলে খুররামিয়া সম্প্রদায়ের চূড়ান্ত পতন ঘটে।

খলিফা মামুনের শাসনামলে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চায় বিশেষ গুরুত্বারোপ

খলিফা মামুনের শাসনামলেই মুসলিম বিশ্বে ইলমুল কালাম চর্চার সূচনা ও উৎকর্ষ ঘটে। মেধা ও যুক্তিনির্ভর এই শাস্ত্রের মূল আলোচ্য বিষয় হলো আকিদা-বিশ্বাস, ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মের মৌলিক নীতিসমূহ। মুতাজিলা সম্প্রদায়ের প্রভাব বিস্তারের সূচনা এবং সম্প্রদায়টির প্রখ্যাত পণ্ডিত ইবরাহিম বিন সাইয়ার (নাযযাম)-এর আত্মপ্রকাশও মামুনের আমলেই হয়।[৯৬]

ইলমুল কালামকে উপজীব্য করেই কুরআন-সুন্নাহর অনুসারী আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর সঙ্গে মুতাজিলা সম্প্রদায়ের বিরোধের সূচনা হয়। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআ আকিদা ও ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহকেই মূল নির্ভরতা মনে করে আর মুতাজিলা সম্প্রদায় এ ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহর ওপর যুক্তি ও মুক্তবুদ্ধির দাবিকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

---

৯৬. হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরুতে উমাইয়া খিলাফতের শেষদিকে বসরায় ভ্রান্ত মুতাজিলা মতাদর্শের উৎপত্তি হয়। আব্বাসি আমলে বিশেষ করে খলিফা মামুন, মুতাসিম ও ওয়াসিকের শাসনামলে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করায় মুতাজিলা মতাদর্শ উৎকর্ষ ও বিস্তৃতি লাভ করে এবং ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উভয় অঙ্গনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। মুতাজিলা মতাদর্শীরা কুরআন-সুন্নাহর বর্ণনার ওপর নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি ও মুক্তচিন্তার দাবিকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে এবং কোনো আয়াত বা হাদিস বাহ্যত মুক্তচিন্তার বিরোধী মনে হলে নির্দ্বিধায় তা প্রত্যাখ্যান করে। ওয়াসিল বিন আতাকে (মৃত্যু : ১৩১ হিজরি) মুতাজিলা মতাদর্শের জনক বিবেচনা করা হয়।

এই মৌলিক মতবিরোধকে কেন্দ্র করে উভয় পক্ষের মধ্যে যেসব মাসআলায় মতানৈক্য ঘটে, তার মধ্যে প্রসিদ্ধ একটি হলো—আল্লাহর কালাম কুরআন নিত্য ও শাশ্বত, নাকি মাখলুক ও সৃষ্ট?

মূল মাসআলার বিবরণ ও সমাধান তো অতি সরল। কিন্তু একে কেন্দ্র করে প্রথমে খলিফা মামুন ও তারপর খলিফা মুতাসিমের শাসনামলে খলিফাদ্বয়ের প্রত্যক্ষ মদদে সমকালীন মুসলিম উম্মাহর প্রথিতযশা আলিমগণের ওপর প্রচণ্ড দুর্যোগ নেমে আসে। কারণ, উভয় খলিফা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর মতাদর্শের বিপরীতে গিয়ে মুতাজিলা মতবাদকেই গ্রহণ করেছিলেন, যাদের দাবি ছিল—কুরআন সৃষ্ট।

যেহেতু বৃহত্তর জনসাধারণের সমর্থন ছিল আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর বরেণ্য আলিমগণের পক্ষে, তাই বিরোধী দল জনরোষের ভয়ে নিজেদের মতাদর্শ যথেচ্ছ প্রচার করতে পারত না। মামুন খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর উভয় পক্ষের জন্য তর্কবিতর্কের ক্ষেত্র উন্মুক্ত করে দেন। কালাম শাস্ত্রবিদ, ফিকহ গবেষক, হাদিস বিশারদসহ সকল শ্রেণি ও শাস্ত্রের উলামায়ে কেরামকে তিনি তার দরবারে আহ্বান করতেন এবং তাদের মাঝে বিতর্কসভার আয়োজন করতেন। খলিফা মামুন আশা করেছিলেন যে, এর মাধ্যমে বিরোধপূর্ণ মাসআলাসমূহে সকল আলিম ঐকমত্যে পৌঁছতে সক্ষম হবে এবং পুরো জাতি সেই এক ও অভিন্ন মত গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। আর এর ফলে পুরো মুসলিম উম্মাহ বিশেষ করে দ্বীনের মৌলিক বিষয়সমূহ এবং ইমামত ও নেতৃত্বের মাসআলায় ঐক্যবদ্ধ থাকবে।

বর্ণিত আছে—একদিন খলিফা মামুনের উপস্থিতিতে তার দরবারে দুজন শিয়া আলিম বিতর্ক করছিল। তাদের একজন ছিল ইছনা আশারিয়া মতাদর্শী, অপরজন যায়দিয়া মতাদর্শী। বিতর্কের একপর্যায়ে একজন উত্তেজিত হয়ে অপরজনকে বলে উঠল, 'বেটা নিবতি! কালাম শাস্ত্রের তুই কী জানিস?' তখন মামুন বললেন, 'কটুভাষণ হলো মূর্খতা ও ভ্রষ্টতা আর অশ্লীল আচরণ হলো এক ধরনের হীনতা ও নিকৃষ্টতা। আমরা তো ইলমুল কালামের চর্চা বৈধ করে দিয়েছি এবং মতপ্রকাশের ক্ষেত্র উন্মুক্ত করে দিয়েছি। যে ন্যায় ও সত্য কথা বলবে, আমরা সাদরে তার প্রশংসা করব; আর যে মূর্খতা প্রদর্শন করবে, আমরা তাকে বাধা দেবো। সুতরাং আগে তোমরা দুজন মূলনীতি নির্ধারণ করে নাও। কারণ, ইলমুল কালাম তো

হলো শাখাগত বিষয়। যখন তোমরা শাখাগত কোনো বিষয়ে তর্ক করবে, তখন পূর্ব-নির্ধারিত মূলনীতির দিকে প্রত্যাবর্তন করে তার সমাধান করে নেবে।'

আলোচ্য ঘটনাটি দ্বারা এ বিষয়টিও প্রমাণিত হয় যে, খলিফা মামুন বুদ্ধিবৃত্তিক বিতর্ক, মুক্তচিন্তা ও মুক্তবুদ্ধির চর্চা সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। কারণ, আলোচ্য ঘটনায় উভয় তার্কিক ছিল শিয়া মতাবলম্বী। উভয়ের মতাদর্শ এই বিন্দুতে এক ও অভিন্ন ছিল যে, বিতর্কে যে-ই জয়ী হবে, সে বনু আব্বাসের ক্ষমতা ও রাজত্বের পতনে অগ্রগামী হবে। এতৎসত্ত্বেও খলিফা মামুন তাদেরকে স্বাধীন মতামত প্রকাশের সুযোগ দিয়েছিলেন।

সরকারি তত্ত্বাবধানে উন্মুক্ত বিতর্কের যে ধারা খলিফা মামুন চালু করেছিলেন, তার কিছু ইতিবাচক প্রভাব যেমন ছিল, ছিল নেতিবাচক প্রভাবও। যেমন:

- এর অন্যতম ইতিবাচক দিক এই ছিল যে, এসব জ্ঞান-বিতর্কের মাধ্যমে দ্বীনি ইলমের এক বিশাল সম্পদভান্ডার গড়ে উঠেছে। মুসলিম উম্মাহ এর মাধ্যমে ইসলামি জীবনব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ ইলমুল ফিকহের অমূল্য অনেক জ্ঞানসম্পদ লাভ করেছে।
- মুক্তবুদ্ধি ও দর্শনের মাধ্যমে ইসলামি আকিদাকে প্রমাণ করার জন্য ইলমুল কালামের এই উৎপত্তি ও বিকাশ বিশেষ করে পারসিক নওমুসলিমদের দাওয়াত প্রদানে যথেষ্ট কার্যকরী ছিল। পারসিকরা পূর্ব থেকেই এ পদ্ধতিতে অভ্যস্ত ছিল বিধায় তাদেরই পরিচিত পদ্ধতিতে তাদের সামনে ইসলামকে উপস্থাপন অত্যন্ত উপযোগী বিবেচিত হয়েছিল।
- কিন্তু ইসলামি আকিদা ও মৌলিক বিশ্বাসসমূহকে প্রমাণ করার জন্য নিছক যুক্তিনির্ভরতা মারাত্মক বিভ্রান্তি ও বিশ্বাসগত বিচ্যুতিও সৃষ্টি করেছিল। কারণ, এটি একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয় যে, মানবিক বিচার-বুদ্ধি একদিকে যেমন সীমিত, অপরদিকে দৃষ্টিগ্রাহ্য বিষয় দ্বারা প্রভাবিত। বিপরীতে আকিদা ও বিশ্বাস অদৃশ্য বিষয়কেন্দ্রিকও হয়, যা কুরআন-সুন্নাহর বিশুদ্ধ ও অকাট্য বিবরণ দ্বারা প্রমাণিত। যুক্তিনির্ভরতা ও মুক্তচিন্তার চর্চার ফলে এ জাতীয় অনেক মাসআলায়

বিচ্যুতি ও বিকৃতি ঘটে এবং উম্মাহর মাঝে বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়।

- এমনই একটি মাসআলা হলো 'খালকুল কুরআন' বা কুরআন সৃষ্ট হওয়ার মাসআলা। তর্কবিতর্কের দীর্ঘ ধারা অতিবাহিত হওয়ার পর খলিফা মামুন এ মাসআলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর মতাদর্শের বিরুদ্ধে গিয়ে কুরআন সৃষ্ট হওয়ার মতবাদ গ্রহণ করেন। মামুনের ধারণা ছিল—বিরোধপূর্ণ এ বিষয়ে তার মত সকলের সামনে প্রকাশিত হওয়ার পর উলামায়ে কেরাম তার মতের প্রতি সমর্থন প্রকাশ করবেন। কিন্তু বাস্তবে ঘটে এর সম্পূর্ণ উল্টো। নিষ্ঠাবান উলামায়ে কেরাম 'খালকুল কুরআন' মতাদর্শের কঠোর সমালোচনা করেন এবং এ ধরনের দাবিকে বিদআত আখ্যায়িত করেন। অবশ্য বিরোধিতা করতে গিয়ে কেউ কেউ সীমালঙ্ঘনও করেন এবং কুরআন সৃষ্ট-মতাদর্শ গ্রহণকারীদের কাফির আখ্যা দেন।

২১২ হিজরি সন হতে পরবর্তী কয়েক বছর এভাবেই চলতে থাকে। ২১৮ হিজরি সনে (৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে) খলিফা মামুন ক্ষমতাপ্রয়োগের মাধ্যমে উলামায়ে কেরামকে কুরআন সৃষ্ট মতবাদ গ্রহণে বাধ্য করার সিদ্ধান্ত নেন। নিঃসন্দেহে এটি ছিল খলিফা মামুনের সম্পূর্ণ ভুল ও অবিবেচনাপ্রসূত একটি সিদ্ধান্ত।

সে বছর মামুন রোমান সাম্রাজ্যে বিজয়াভিযান পরিচালনা করেছিলেন। রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তিনি তখন তারসুসে (Tarsus) অবস্থান করছিলেন। তিনি সেখান থেকেই বাগদাদের গভর্নর ইসহাক বিন ইবরাহিমের কাছে বার্তা পাঠিয়ে উলামায়ে কেরামকে সমবেত করার নির্দেশ দেন এবং উক্ত মাসআলায় তাদের মতামত যাচাই ও আকিদা পরীক্ষা করতে বলেন। খলিফার নির্দেশ মোতাবেক ইসহাক ত্রিশজন আলিমকে একত্র করেন এবং খালকুল কুরআন বিষয়ে তাদের মতামত যাচাই করেন। এ সময় উভয় পক্ষের মধ্যে যে কথোপকথন হয়, তার একটি নমুনা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

ইসহাক বিন ইবরাহিম : 'কুরআন সম্পর্কে আপনার কী মত?'

বিশর ইবনুল ওয়ালিদ : 'কুরআন আল্লাহর কালাম।'

'আমি জানতে চাচ্ছি, কুরআন সৃষ্ট কি না?'

'আল্লাহ সকল বস্তুর স্রষ্টা।'

'কুরআন কি বস্তু নয়?'

'হ্যাঁ, একটি বস্তু।'

'তাহলে কুরআনও সৃষ্ট?!'

'স্রষ্টা নয়।'

'তা তো জানতেও চাইছি না। আমার প্রশ্ন হলো—কুরআন কি সৃষ্ট?'

'যা বলেছি, তার চেয়ে ভালো কিছু বলতে পারব না। আমি ইতিপূর্বে আমিরুল মুমিনিনের সঙ্গে অঙ্গীকার করেছি যে, এ বিষয়ে কোনো কথা বলব না। যা বলেছি, তার বাইরে আমার আর কিছুই বলার নেই।'

গভর্নর ইসহাক উলামায়ে কেরামের প্রত্যেকের উত্তর নাম ধরে ধরে হুবহু লিখে খলিফা মামুনের কাছে পাঠিয়ে দেন। খলিফা তাদের উত্তর পেয়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং চাপপ্রয়োগের মাধ্যমে সকলকে বাধ্য করার জন্য ইসহাককে নির্দেশ দেন। ইসহাকের চাপে সকলে নতি স্বীকার করলেও আহমাদ বিন হাম্বল রহ. ও মুহাম্মাদ বিন নুহ রহ. আপন নীতিতে অটল-অবিচল থাকেন। গভর্নর ইসহাক তাদের দুজনকে বন্দি করে খলিফার কাছে পাঠিয়ে দেন।

ঐতিহাসিক ইবনে কাছির রহ. বলেন—

> পরীক্ষায় যখন আহমাদ বিন হাম্বলের পালা এলো, ইসহাক তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি মানেন যে, কুরআন মাখলুক ও সৃষ্ট?' আহমাদ উত্তর দিলেন, 'কুরআন আল্লাহর কালাম; আমি এর বেশি কিছু বলব না।'[৯৭]

এরপর ইবনে কাছির রহ. বলেন—

> উপস্থিত অনেকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও মৌখিকভাবে 'খালকুল কুরআন'-এর স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। কেননা, যারা এর পক্ষে সাক্ষ্য দিতে রাজি না হতো, প্রশাসকবর্গ তাদেরকে আপন দায়িত্ব হতে অপসারণ করত, বাইতুল মালে ভাতা চালু থাকলে তা বন্ধ করে

---

[৯৭]. ইবনে কাছির দিমাশকি, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ১০/২৭৬।

দিত, ফিকহবিদ হলে ফতোয়া প্রদান এবং হাদিসবিশারদ হলে হাদিসের দরস দান নিষিদ্ধ করে দিত। এভাবে একটি মারাত্মক ফিতনা, জঘন্য দুর্যোগ ও কঠিন বিপর্যয় সৃষ্টি করা হয়।[৯৮]

এটি ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায় যে, খালকুল কুরআনের মাসআলায় যারাই নমনীয়তা অবলম্বন করে খলিফা মামুনের পক্ষাবলম্বন করেছে, মুহাদ্দিসিনে কেরাম তাদেরকে উপেক্ষা করেছেন, তাদের স্তর-মর্যাদা অবনমিত করেছেন এবং এ বিষয়টিকে একটি ত্রুটি ও দোষ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। কারণ, যে আলিম আকিদা ও বিশ্বাসের প্রশ্নে নির্যাতন ও নিপীড়নে অটল-অবিচল থাকতে পারে না, সে কিছুতেই মান্যবর আলিমদের কাতারে গণ্য হতে পারে না। এ কারণেই আমরা দেখি, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের ন্যায় যারা শত নির্যাতনের মুখেও অটল-অবিচল ছিলেন, তারা সুউচ্চ সম্মান ও মর্যাদা এবং অসাধারণ কবুলিয়াত ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন এবং ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন।

আপন কর্মপন্থার স্বপক্ষে খলিফা মামুনের যুক্তি এই ছিল যে, তিনি এর মাধ্যমে মতবিরোধপূর্ণ মাসআলাসমূহে উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করতে চাচ্ছেন।[৯৯] অথচ বাস্তবতা হলো—মামুনের শাসনামলে ঐক্য ও সম্প্রীতি দূরে থাক; অতি সহজ, সাধারণ ও তুচ্ছ 'খালকুল কুরআন'-এর মাসআলাতেও মতবিরোধ বিরাটাকার ধারণ করেছিল এবং একে কেন্দ্র করে উম্মাহর হকপন্থি উলামায়ে কেরামের ওপর নির্যাতন-নিপীড়নের খড়্গ নেমে এসেছিল। কিন্তু মামুন তারপরও আপন অবস্থানে অটল ছিলেন। তিনি বলতেন, 'অতি ক্ষুদ্র মাসআলাও যখন কোনো মৌলিক বিশ্বাসে

---

৯৮. প্রাগুক্ত, ১০/২৭৭।

৯৯. প্রকৃতপক্ষে মামুনের এ চিন্তাধারা ছিল সম্পূর্ণই বাস্তবতাবিবর্জিত। শাখাগত মাসআলা ও যেসব বিষয়ে একাধিক মত গ্রহণের অবকাশ থাকে, সেসব ক্ষেত্রে পুরো উম্মাহকে এক মত ও পথে আনতে বাধ্য করা অসম্ভব একটি বিষয়। এটি সুন্নাতুল্লাহ ও মহান আল্লাহর রীতিরও বিরোধী। সালাফ ও উম্মাহর পূর্বসূরি মনীষীগণ শাখাগত মাসআলায় একাধিক মতের উপস্থিতিকে দূষণীয় মনে করতেন না এবং উম্মাহকে এ জাতীয় বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে বাধ্য করা বৈধও মনে করতেন না। বরং তারা বলতেন, 'যে ব্যক্তির শাখাগত মাসআলাতে মতভিন্নতার ইলম নেই, সে ফিকহের ঘ্রাণও পাবে না।' [মূল গ্রন্থের টীকা]

এ বিষয়ে প্রশস্তিদায়ক অবগতির জন্য অধ্যয়ন করা যেতে পারে—মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক, *উম্মাহর ঐক্য : পথ ও পন্থা*।

পরিণত হয় বা নেতৃত্বের কারণ হয়, তখন তাকে কেন্দ্র করে বিরোধ ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। অপরদিকে অতি জটিল কোনো বিষয়েও কঠিন বিরোধ হলে তাতে কোনো সমস্যা হয় না, যদি তা কোনো মৌলিক আকিদা বা নেতৃত্ব-নির্ধারণী বিষয় না হয়।'

খালকুল কুরআনের মাসআলায় যদি খলিফা মামুনের স্খলন না ঘটত এবং যদি তিনি খোলাফায়ে রাশিদিনের অন্যান্য সদস্যের তুলনায় আলি রাযি.-এর শ্রেষ্ঠত্বের দাবি না করতেন, তাহলে নিঃসন্দেহে তিনি ইসলামের শ্রেষ্ঠতম খলিফাদের কাতারে অন্তর্ভুক্ত হতেন। ঐতিহাসিক ইবনে কাছির রহ. তার বিভিন্ন কীর্তি ও চরিত্রগুণের বিবরণদানের পর লিখেছেন—

> তার কর্মকাণ্ডে শিয়াবাদ ও মুতাজিলা মতবাদের প্রভাব ছিল এবং তার বিশুদ্ধ সুন্নাহ সম্পর্কে অজ্ঞতা ছিল।[১০০]

খলিফা মামুন ২১৮ হিজরি সনে আটচল্লিশ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন এবং মৃত্যুর পূর্বেই ভাই আল-মুতাসিম বিল্লাহকে পরবর্তী খলিফা ঘোষণা করে যান।

---

১০০. ইবনে কাছির দিমাশকি, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ১০/২৭৮।

আল-মুতাসিম বিল্লাহ আবু ইসহাক মুহাম্মাদ বিন হারুনুর রশিদ বিন মাহদি বিন মানসুর

[রজব ২১৮ হিজরি—রবিউল আউয়াল ২২৭ হিজরি]
[আগস্ট ৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দ—জানুয়ারি ৮৪২ খ্রিষ্টাব্দ]

খলিফা মুতাসিম বিল্লাহ ১৭৯ হিজরি সনে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। ভাই মামুনের মৃত্যুর পর ২১৮ হিজরি সনে উনচল্লিশ বছর বয়সে তিনি খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হন। রোমান সাম্রাজ্যে অভিযান চলাকালে যখন খলিফা মামুনের মৃত্যু হয়, তখন মুতাসিম বিল্লাহ ভাইয়ের সঙ্গেই ছিলেন। রোমান অঞ্চলেই তার নামে বায়আত গ্রহণ সম্পন্ন হয়। এরপর তিনি বাহিনীসহ বাগদাদে ফিরে আসেন।

মুতাসিম ছিলেন বীর, দুঃসাহসী ও সুউচ্চ সংকল্পশক্তির অধিকারী। নিজে যেমন বীর যোদ্ধা ছিলেন, তেমনই বীরত্ব ও বীর যোদ্ধাদের পছন্দ করতেন। অস্বাভাবিক শক্তির অধিকারী মুতাসিম বিল্লাহ কয়েকজন পুরুষের ভার একাই বহন করতে পারতেন। তিনি দীর্ঘ পদক্ষেপে পথ চলতেন। বড় বড় বীর যোদ্ধারা অক্ষম হওয়ার পর তিনি কয়েকবার লোহাকে দু-টুকরা করতে সক্ষম হন। তার উজির আহমাদ বিন আবু দাউদ বলেন, মুতাসিম নিজ বাহু বের করে দিয়ে আমাকে বলতেন, আবু আবদুল্লাহ, তোমার সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে আমার বাহুতে কামড় দাও। আমি বলতাম, আমিরুল মুমিনিন! আল্লাহর শপথ! আপনার বাহুতে আঘাত করা আমার মনঃপূত নয়। তিনি বলতেন, তাতে আমার কোনো ক্ষতি হবে না। তখন আমি সর্বশক্তি দিয়ে তার বাহুতে কামড় দিতাম; কিন্তু কোনো ক্ষতি হওয়া দূরে থাক, দাঁতের দাগও দেখা যেত না।

অবশ্য স্বাভাবিকভাবে মুতাসিম সদয় স্বভাবের ছিলেন। তবে যখন তিনি ক্রুদ্ধ হতেন, তখন কাউকে হত্যা করতেও দ্বিধা করতেন না।

খলিফা মুতাসিম নিজের সম্পর্কে বলতেন, 'আমি জানি যে, শিষ্টাচার ও শিক্ষায় আমি আমার ভাইদের চেয়ে ক্ষুদ্র। কারণ, আমিরুল মুমিনিন (হারুনুর রশিদ) আমাকে স্নেহ করতেন। শৈশব হতেই আমার খেলাধুলার প্রতি আকর্ষণ ছিল। তাই আমার অন্য ভাইয়েরা যেরূপ জ্ঞান অর্জন করেছেন, আমি তা পারিনি।'

এর কারণ হিসেবে ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন যে, মুতাসিম শৈশবে একটি বালকের সঙ্গে মকতবে পড়তে যেতেন। বালকটি কিছুদিন পর মারা গেলে খলিফা হারুনুর রশিদ তার পুত্রকে বললেন, 'মুহাম্মাদ! তোমার সঙ্গী তো মারা গেছে।' তখন তিনি উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, আমার সাইয়িদ! সে মক্তব থেকে নিস্তার পেয়ে গেছে!' মুতাসিমের উত্তর শুনে বিস্ময়ে হতবাক হারুনুর রশিদ বললেন, 'মক্তবের প্রতি তোমার বিতৃষ্ণা এই পর্যায়ে পৌঁছেছে?!' এরপর তার অভিভাবকগণ তাকে আর মক্তবে পাঠাননি। ফলে তার পড়াশোনার পর্ব সেখানেই শেষ হয়ে যায়। বর্ণিত আছে, তিনি কোনোমতে লিখতে পারতেন এবং সামান্য পড়তে পারতেন।

মৃত্যুর পূর্বে খলিফা মামুন মুতাসিম বিল্লাহকে অসিয়ত করে বলেন, জনগণকে 'কুরআন সৃষ্ট'-মতবাদ মেনে নিতে বাধ্য করবে। খুররামিয়া সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দৃঢ় সংকল্প, সতর্কতা ও বীরত্বের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাবে। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রয়োজনমতো অর্থসম্পদ, অস্ত্রশস্ত্র, পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য—কোনোকিছু প্রেরণে দ্বিধা করবে না। যদি যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হয়, তাহলে তোমার সঙ্গী ও আপনজনদের সঙ্গে নিয়ে নিজেই তাদের মোকাবিলায় বেরিয়ে পড়বে। আর লড়াই করবে আল্লাহপ্রদত্ত সাওয়াব ও প্রতিদান প্রাপ্তির আশায় নিষ্ঠাপূর্ণ নিয়ত সহকারে।

মামুনের অসিয়ত মোতাবেক মুতাসিম তার সর্বোচ্চ চেষ্টা ও সম্পদ বাবাক খুররামির আন্দোলন দমনে ব্যয় করেন।

বাবাক খুররামি ছিল সমকালীন ইসলামি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর যোদ্ধা। সে ইসলামি ভূখণ্ডে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল, ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিল এবং মুসলমানদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। বাবাক খুররামি আজারবাইজান ও অন্যান্য অঞ্চলে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার পর সেখানে জরথুস্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট ছিল। নিজেকে খোদা দাবি

করে এই দুষ্ট লোকটি আরব ইসলামি রাষ্ট্রকে পারসিক রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেয়েছিল। এ উদ্দেশ্যে সে ও তার অনুসারীরা ইসলাম ও আরবের বিরুদ্ধে এক তীব্র ও প্রচণ্ড যুদ্ধের সূচনা করে।

খলিফা মুতাসিম বাবাক খুররামিকে দমন করার জন্য তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম সেনাপতি আফশিন (হায়দার বিন কাউস)-কে প্রেরণ করেন। মুতাসিম এ যুদ্ধে প্রচুর অর্থ ব্যয় করলেও কাঙ্ক্ষিত ফল লাভে দীর্ঘ সময় লেগে যায়। প্রতিদিন যুদ্ধের সংবাদ জানার জন্য খলিফা কিছু দূর পরপর ডাক স্থাপন করেছিলেন। বাবাক খুররামি নামক এই পাপিষ্ঠ বিশ বছরে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার লোককে হত্যা করেছিল। আফশিনের হাতে ধৃত হয়েই তার পতন ঘটে।

আফশিনের বাহিনীর উপর্যুপরি আক্রমণে কোণঠাসা হয়ে পড়ে একপর্যায়ে বাবাক খুররামি তার মিত্র বাইজান্টাইন সম্রাট থিওফেল (Theophilos)-এর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে এবং মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে তাকে যুদ্ধ করতে প্ররোচিত করে। কিন্তু থিওফেল বাবাকের সাহায্যে রওনা হতে বিলম্ব করেন। বাবাক নিহত হওয়ার পর ২২৩ হিজরি সনে থিওফেল তার বাহিনী নিয়ে আব্বাসি রাষ্ট্রের সীমান্ত নগরী যিবাত্‌রায় হামলা চালান এবং হত্যাযজ্ঞ চালানোর পাশাপাশি অনেক নারীকে বন্দি করে নিয়ে যান। ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন রহ. লিখেছেন—

> খলিফা মুতাসিম এ সংবাদ জানার পর অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে পরিস্থিতি বিবেচনা করলেন। তিনি যখন জানতে পারলেন যে, জনৈকা হাশিমি নারী রোমানদের হাতে বন্দি অবস্থায় 'হায় মুতাসিম!' বলে চিৎকার করেছে, তখন সিংহাসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে গেলেন ও অস্থির চিত্তে বলে উঠলেন, লাব্বাইক! আমি উপস্থিত আছি। এরপর তিনি নাফিরে আম[১০১]-এর ঘোষণা দিলেন এবং যুদ্ধপ্রস্তুতি শুরু করলেন।

থিওফেলকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে সীমান্তের উদ্দেশে রওনা হওয়ার পর মুতাসিম তার উপদেষ্টাদের জিজ্ঞেস করলেন, 'রোমান সাম্রাজ্যের সবচেয়ে

---

১০১. জরুরি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম শাসক যদি যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করার জন্য মূল সেনাবাহিনীর পাশাপাশি সাধারণ জনগণকেও ব্যাপকভাবে বাহিনীতে শরিক হতে নির্দেশ দেন, তাহলে তাকে 'নাফিরে আম' বলে।

দুর্ভেদ্য ও সুরক্ষিত নগরী কোনটি?' তাকে জানানো হলো, 'আম্মুরিয়া'। খ্রিষ্টানরা আম্মুরিয়া নগরীকে কনস্টান্টিনোপলের চেয়েও অধিক মর্যাদার চোখে দেখত। খলিফা বিরাট সেনাবাহিনী, পর্যাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র, অবরোধের প্রয়োজনীয় উপকরণ, দাহ্য পদার্থ ইত্যাদি নিয়ে আম্মুরিয়ার উদ্দেশে রওনা হন। মুসলিম বাহিনী গন্তব্যে পৌঁছে নগরীটি অবরোধ করে। খলিফার নেতৃত্বে ছয় রমজান হতে শাওয়াল মাসের শেষ পর্যন্ত পঞ্চান্ন দিন স্থায়ী অবরোধ চলাকালে উপর্যুপরি গোলার আঘাতে একপর্যায়ে আম্মুরিয়ার নিরাপত্তাব্যবস্থা ভেঙে পড়ে এবং মুসলমানরা আম্মুরিয়া জয় করে। অপহৃত হাশিমি মুসলিম নারীকেও এ সময় উদ্ধার করা হয়।

এই অভিযানকে উপজীব্য করেই বিখ্যাত কবি আবু তামাম তার সেই সুবিখ্যাত কাসিদা রচনা করেন; যার প্রথম পঙ্‌ক্তি হলো—

اَلسَّيْفُ أَصْدَقُ أَنْبَاءً مِنَ الْكُتُبِ ❋ فِيْ حَدِّهِ الْحَدُّ بَيْنَ الْجِدِّ وَاللَّعْبِ

খবর প্রচারে গ্রন্থের চেয়ে তরবারি অধিক কার্যকরী,

তীক্ষ্মতা-ধারে তরবারি যে চেষ্টা ও তামাশার ফারাককারী।

আম্মুরিয়ার অভিযান শেষে বাগদাদে প্রত্যাবর্তনের পর খলিফা মুতাসিম আব্বাসি সেনাবাহিনীকে নতুন করে ঢেলে সাজানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ইরাকি সেনাবাহিনী ইতিপূর্বে খলিফাদের বিরুদ্ধে বারবার বিদ্রোহ করার কারণে তিনি তাদের ওপর মোটেও আস্থা রাখতে পারছিলেন না। খলিফা এবার তুর্কিনির্ভর সেনাবাহিনী প্রতিষ্ঠা করার মনস্থ করেন। কারণ, তুর্কিরা ছিল যথেষ্ট শক্তি-সামর্থ্যের অধিকারী। তিনি পূর্ববর্তী খলিফা মামুনের চেয়েও অধিক হারে তুর্কি দাস সংগ্রহ করতে থাকেন। খলিফা মুতাসিম নতুন তুর্কি দাসদের বাগদাদেই থাকার ব্যবস্থা করে দেন। অনারব তুর্কিরা কঠোর ও জেদি স্বভাবের ছিল। তারা ঘোড়ায় আরোহণ করে বাগদাদের রাস্তাঘাটে টহল দিত এবং নারী-পুরুষ ও শিশুদের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটাত। ফলে আরব সৈন্যগণ তাদের প্রতিরোধ করতে শুরু করে এবং মাঝেমধ্যেই রক্তপাতের ঘটনা ঘটতে থাকে। বাধ্য হয়ে তুর্কিরা খলিফা মুতাসিমের কাছে অভিযোগ জানায়। তখন তিনি তুর্কি সৈন্যদের সেনাছাউনি হিসেবে নতুন একটি শহর নির্মাণের পরিকল্পনা করেন এবং এর নামকারণ করেন 'সুররা মান রআ'। বর্তমানে নগরীটি

সামাররা[১০২] নামে পরিচিত। এরপর থেকে মুতাসিম তার সৈন্যসামন্তসহ এই নগরীতেই বসবাস করতেন। সামাররা বাগদাদ হতে পৃথক ভিন্ন একটি নগরী।

মুতাসিম যেসব সেনাপতির ওপর নির্ভর করতেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলো আফশিন হায়দার বিন কাউস, ইতাখ, আশনাছ, আজিফ বিন আমবাসা, ওয়াসিফ, আবু মুসা বুগা আল-কাবির প্রমুখ। তারা প্রত্যেকেই ছিল তুর্কি। তাদের বীরত্ব ও যুদ্ধদক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে খলিফা মুতাসিম তাদেরকে সেনাপতি নির্বাচিত করেন এবং তাদের হাতেই তার পূর্বপুরুষের রেখে যাওয়া আরব সাম্রাজ্যের লাগাম তুলে দেন। তিনি আরবদেরকে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব হতে অপসারণ করেন, তাদের নাম রাষ্ট্রীয় দপ্তর হতে বাদ দিয়ে দেন এবং সংগৃহীত তুর্কি সৈন্যদের মাধ্যমে রাষ্ট্রপরিচালনাতে স্বস্তি অনুভব করতে থাকেন।

আব্বাসি রাজপরিবারের পরবর্তী প্রজন্ম ধীরে ধীরে তুর্কিদের কর্তৃত্বাধীন হয়ে পড়ে। তুর্কিরা তাদের সঙ্গে যথেচ্ছ আচরণ করত এবং রাজপরিবারকে নিয়ন্ত্রণ করত। অথচ তারা সুপ্রসিদ্ধ কোনো বংশপরিচয়ের অধিকারী ছিল না, তাদের অন্তর্জগৎ পরিচ্ছন্ন ও নিষ্ঠাপূর্ণও ছিল না। এ কারণেই ঐতিহাসিকগণ মন্তব্য করেছেন—মুতাসিম-পরবর্তী আব্বাসি শাসকগণ যেসব বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলা, অস্থিতিশীল পরিস্থিতি ও প্রশাসন-দুর্বলতার শিকার হয়েছেন এবং তুর্কিদের হাতে আরব জাতি নিগৃহীত হয়েছে, তার মূল দায়ভার এক মুতাসিমের কাঁধেই বর্তায়। আব্বাসি রাষ্ট্রের স্বার্থ ও কল্যাণের প্রতি তুর্কিদের আত্মনিবেদনের পরিমাণ, খলিফার প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালনে তাদের উপযুক্ততা এবং তাদের বংশমূল ও পরিচিতি ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক ধারণা না থাকা সত্ত্বেও খলিফা মুতাসিম তাদের প্রতি আস্থা রাখতেন। আর তাই স্বীকার করতেই হবে যে, মুতাসিম যদিও দুঃসাহসী বীর যোদ্ধা ছিলেন; কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরিকল্পনা প্রণয়নে তিনি মোটেও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন না।

---

১০২. **সামাররা :** বর্তমান বাগদাদ নগরী হতে ১২৫ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত একটি নগরী। ২২১ হিজরিতে (৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দে) খলিফা মুতাসিম বিল্লাহ নগরীটি নির্মাণ করেন। তখন এর নাম ছিল সুররা মান রআ (যে দেখবে, সে-ই আনন্দিত হবে!)। মুতাসিম বিল্লাহ আব্বাসি খিলাফতের দারুল খিলাফাহ বাগদাদ থেকে সামাররায় স্থানান্তর করেন।

বর্ণিত আছে, তুর্কি দাসদের অসদাচরণে অতিষ্ঠ হয়ে একবার বাগদাদবাসী মুতাসিমের কাছে অভিযোগ জানিয়ে বলল, 'আপনি আমাদের এখান থেকে অন্য কোথাও স্থানান্তর করুন; অন্যথায় আমরা আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করব।' খলিফা তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কীভাবে আমার বিরুদ্ধে লড়াই করবে? আমার সেনাছাউনিতে আছে আশি হাজার বর্মধারী সৈন্য!' জনগণ উত্তর দিলো, 'আমরা রাতের তির ও ভোরের তির (অর্থাৎ আল্লাহর দরবারে দোয়া ও রোনাজারি) নিয়ে আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করব।' উত্তর শুনে মুতাসিম বললেন, 'এর প্রতিরোধ করার সামর্থ্য আমাদের নেই।'

এ ঘটনার পরই তিনি নতুন নগরী সামাররা প্রতিষ্ঠা করে সেখানে চলে যান।

মুতাসিমের আমলে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ.-এর ঈমানি পরীক্ষা

প্রয়াত খলিফা মামুনের অসিয়ত মোতাবেক খলিফা মুতাসিম জনগণকে 'কুরআন সৃষ্ট'-মতবাদ মেনে নিতে চাপ প্রয়োগ করেন। বিশেষ করে বিখ্যাত ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ.-এর ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়। ইমাম-পুত্র আবদুল্লাহ বিন আহমাদ আপন পিতার সূত্রে এর বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করেছেন। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো।

> ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. বলেন, আমাকে যখন কয়েদখানা থেকে বের করে মুতাসিমের কাছে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হলো, তখন শিকল-বেড়ির পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দেওয়া হলো। শিকলের ভারে আমি হাঁটতে পারছিলাম না। তাই আমি শিকলগুলোকে পাজামার সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে হাতে ধরে চলতে লাগলাম। এরপর প্রহরীরা আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি বাহন নিয়ে এলে আমি তাতে আরোহণ করলাম। শিকলের ভারে ভারসাম্য রাখতে না পেরে আমি প্রায় পড়েই যাচ্ছিলাম। আমাকে সাহায্য করার মতো কেউ সেখানে ছিল না। আল্লাহই আমাকে রক্ষা করলেন।
>
> এরপর আমরা মুতাসিমের প্রাসাদে উপস্থিত হলাম। সেখানে পৌঁছার পর আমাকে একটি অন্ধকার প্রকোষ্ঠে আটকে রাখা হলো। আমার কাছে আলো জ্বালানোর মতো কিছু ছিল না।

আমি অজু করার মনস্থ করলাম। পানির জন্য হাত বাড়াতেই আমি পানির একটি পাত্র পেয়ে গেলাম। এরপর তা দিয়ে অজু করে নামাজ আদায়ের জন্য দণ্ডায়মান হলাম। আমার কিবলা জানা ছিল না। ভোরের আলো উদ্ভাসিত হওয়ার পর বুঝতে পারলাম যে, আমি সঠিক দিকে ফিরেই নামাজ আদায় করেছি। আল্লাহর জন্যই যাবতীয় প্রশংসা।

সকালে আমাকে মুতাসিমের দরবারে তলব করা হলো। দরবারে উপস্থিত হয়ে উজির ইবনে আবু দাউদকে খলিফার পাশেই উপবিষ্ট দেখতে পেলাম। আমাকে দেখে খলিফা সভাসদদের বললেন, 'তোমরা কি মনে করেছিলে যে, তিনি তরুণ? তিনি তো বয়োবৃদ্ধ।' আমি খলিফার কাছে পৌঁছে তাকে সালাম করলাম। তিনি আমাকে বললেন, 'আরও কাছে আসুন।' এভাবে কয়েকবার বলে তিনি আমাকে তার একেবারে কাছে নিয়ে গেলেন। এরপর আমাকে বসার নির্দেশ দেওয়া হলে আমি বসলাম। ভারী শিকলগুলো আমার শরীরেই ছিল। কিছুক্ষণ নীরবেই কেটে গেল। এরপর আমি বললাম, 'আমিরুল মুমিনিন! আপনার চাচাতো ভাই[১০৩] আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে কীসের প্রতি আহ্বান করেছিলেন?' খলিফা উত্তর দিলেন, 'আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই—এ কথার সাক্ষ্যের দিকে।' আমি বললাম, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই।' এরপর উজির ইবনে আবু দাউদ কিছু কথা বলল, আমি তা কিছুই বুঝিনি। কারণ, আমি তার বক্তব্যের বিষয় সম্বন্ধে অবগত ছিলাম না।

কিছুক্ষণ পর মুতাসিম আমাকে বললেন, 'আপনি যদি আমার পূর্ববর্তী খলিফা কর্তৃক বন্দি না হতেন, তাহলে আমি আপনার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতাম না।' এরপর তিনি দরবারে উপস্থিত জনৈক সভাসদকে বললেন, 'আবদুর রহমান! আমি কি তোমাকে এই দুর্যোগ দমনের নির্দেশ দিইনি?' আমি বললাম,

---

১০৩. আব্বাসি রাজপরিবারের ঊর্ধ্বতন পুরুষ আব্বাস রা. নবীজির চাচা ছিলেন। সেদিকে সম্বন্ধ করে ইমাম আহমাদ রহ. খলিফাকে নবীজির চাচাতো ভাই সম্বোধন করেছেন।

'আল্লাহু আকবার! (আপনি একে দুর্যোগ বলছেন?!) এ তো মুসলমানদের নিষ্কৃতির পথ।' এরপর খলিফা তাকে বললেন, 'আবদুর রহমান! তার সঙ্গে কথা বলো। তার সামনে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করো।' আবদুর রহমান আমাকে প্রশ্ন করল, 'আপনি কুরআন সম্পর্কে কী বিশ্বাস পোষণ করেন?' আমি উত্তর না দিয়ে নিশ্চুপ রইলাম। মুতাসিম আমাকে বললেন, 'উত্তর দিন।' আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম, 'আপনি ইলম সম্পর্কে কী বিশ্বাস পোষণ করেন?' তিনি কোনো উত্তর দিলেন না। এবার আমি বললাম, 'কুরআন আল্লাহর ইলমের অন্তর্ভুক্ত আর যে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর ইলম মাখলুক ও সৃষ্ট, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকেই অস্বীকার করে।' আমার কথা শুনে খলিফা চুপ করে রইলেন। উপস্থিত সভাসদরা খলিফাকে বলতে লাগল, 'আমিরুল মুমিনিন! এই লোক তো আপনাকে ও আমাদেরকে কাফির সাব্যস্ত করেছে।' খলিফা তাদের কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করলেন না। এরপর আবদুর রহমান তার নতুন যুক্তি উপস্থাপন করে বলল, 'আল্লাহ ছিলেন; কিন্তু কুরআন ছিল না।' আমি বললাম, 'আল্লাহ ছিলেন; কিন্তু ইলম ছিল না?' আমার উত্তর শুনে তিনি আবারও চুপসে গেলেন।

এরপর তারা পরস্পর বিক্ষিপ্ত কথাবার্তা বলতে লাগল। আমি বললাম, 'আমিরুল মুমিনিন! আমাকে কুরআন-হাদিস হতে খালকুল কুরআনের স্বপক্ষে কোনো দলিল দিন। তাহলে আমি তা মেনে নেব।' আমার কথা শুনে উজির ইবনে আবু দাউদ বলে উঠল, 'আপনি তো কুরআন-সুন্নাহ ছাড়া অন্য কোনো কথাই মানতে চাচ্ছেন না!' আমি বললাম, 'ইসলাম কি কুরআন-সুন্নাহ ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হতে পারে?!' এরপর দীর্ঘ তর্কবিতর্ক চলল। একপর্যায়ে ইবনে আবু দাউদ বলল, 'আমিরুল মুমিনিন! আল্লাহর শপথ, এই লোক নিজে তো ভ্রান্ত, এখন অন্যদেরকেও বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করছে এবং এক বিদআতের সূচনা করেছে। আপনার দরবারে অনেক বিচারক ও ফকিহ-আলিম উপস্থিত আছেন। তাদেরকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করুন।' খলিফা

তাদেরকে বললেন, 'এ বিষয়ে তোমাদের কী অভিমত?' উপস্থিত সকলে ইবনে আবু দাউদের পক্ষেই কথা বলল।

এভাবে পরপর তিন দিন আমাকে খলিফার দরবারে উপস্থিত করা হলো এবং প্রতিদিন তারা আমার সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হলো। প্রতিটি বিতর্কে আমার উপস্থাপিত দলিল-প্রমাণে তারা নির্বাক ও পরাভূত হলো।

সবাই চুপ হয়ে গেলে ইবনে আবু দাউদ কথা বলতে শুরু করল। ইলম ও ইলমুল কালামে লোকটি ছিল উপস্থিত লোকদের মধ্যে সবচেয়ে অজ্ঞ। বিতর্কে বিভিন্ন মাসআলা নিয়ে আলোচনা হলো। কিন্তু তাদের কাছে কুরআন-সুন্নাহ থেকে উল্লেখ করার মতো কোনো দলিল ছিল না। তাই তারা কুরআন-সুন্নাহর উদ্ধৃতিসমূহ অস্বীকার করতে লাগল এবং এ জাতীয় দলিলসমূহকে প্রত্যাখ্যান করল। আমি তাদের মুখে এমন সব বক্তব্যও শুনতে পেলাম, ভাবতেও পারিনি যে, কেউ এ ধরনের কথা বলতে পারে। ইবনে গাউস আমাকে দেহ-সাব্যস্তকরণসহ নানা অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা শোনাল। আমি তাকে বললাম, 'আপনি কী বলতে চাচ্ছেন, আমি বুঝতে পারছি না। আমি কেবল এতটুকু জানি যে, আল্লাহ তাআলা একক ও অমুখাপেক্ষী; তার কোনো সদৃশ নেই।' এরপর সে-ও চুপ হয়ে গেল।

আমি তাদেরকে পরকালে আল্লাহর দিদার সংক্রান্ত হাদিসটি শোনালাম। তারা হাদিসটির সনদকে দুর্বল সাব্যস্ত করার এবং কতক মুহাদ্দিসের উক্তির মাধ্যমে রেওয়ায়েতটিকে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করল। কিন্তু অসম্ভব! এত দূরবর্তী স্থান থেকে তারা এর নাগাল কীভাবে পাবে?! বিতর্ক চলাকালে খলিফা বারবার আমার প্রতি কোমল আচরণ দেখাতে লাগলেন এবং আমাকে বললেন, 'আহমাদ! আপনি আমার এই আহ্বানে সাড়া দিন (অর্থাৎ কুরআন সৃষ্ট-মতবাদ মেনে নিন), আমি আপনাকে আমার বিশিষ্টজনদের অন্তর্ভুক্ত করে নেব, আর প্রতিদিন আপনি খলিফার দরবার-গালিচার স্পর্শে ধন্য হবেন।' আমি খলিফাকে উত্তর দিলাম, 'আমিরুল মুমিনিন! তারা আমাকে কুরআনের কোনো আয়াত বা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

কোনো হাদিস দ্বারা দলিল দিক, আমি তাদের আহ্বানে সাড়া দেবো।' দলিল-প্রমাণে পরাভূত হয়ে এবার তারা খলিফাকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করল। বাগদাদের নায়েব ইসহাক বিন ইবরাহিম বলল, 'আমিরুল মুমিনিন! এটা খিলাফতের নীতি হতে পারে না যে, আপনি তাকে এভাবেই ছেড়ে দেবেন আর সে দু-দুজন খলিফাকে পরাভূত করে নিশ্চিন্তে চলে যাবে।' খলিফা মুতাসিম স্বভাবগতভাবে কোমল ছিলেন। কিন্তু এ কথা শুনে খলিফার গায়রত ও আত্মমর্যাদাবোধ জেগে উঠল এবং তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে উঠলেন। তিনি মনে করলেন, নিশ্চয়ই তার সভাসদগণ সত্যের ওপর আছেন। এবার তিনি আমাকে বললেন, 'আল্লাহ আপনাকে অভিসম্পাত করুন। আমি আশা করেছিলাম, আপনি আমার আহ্বানে সাড়া দেবেন; কিন্তু আপনি তা করলেন না।'

এরপর খলিফা সভাসদদের নির্দেশ দিলেন, 'যাও, তাকে বিবস্ত্র করে মাটিতে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাও।' খলিফার নির্দেশে আমাকে বিবস্ত্র করা হলো এবং মাটিতে হেঁচড়ানো হলো। এরপর নির্যাতনকারী ও প্রহারকারীদেরকে আহ্বান করা হলো। আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম। আমার পরিচ্ছদে প্রিয় নবীজির কয়েকটি কেশ মোবারক বাঁধা ছিল। তারা তা আমার কাছ থেকে নিয়ে গেল। আমি নিজেকে প্রহারকারীদের মাঝে আবিষ্কার করলাম। আমি খলিফাকে বললাম, 'আমিরুল মুমিনিন! আজ যেমন আমি আপনার সামনে দণ্ডায়মান, আপনাকেও তেমনই একদিন আল্লাহর দরবারে দাঁড়াতে হবে; সেদিনের কথা স্মরণ করুন।' আমার মনে হলো, এ কথা শুনে খলিফা একটু থমকে গেলেন।

কিন্তু উপস্থিত সভাসদরা খলিফাকে উত্তেজিত করতে লাগল। তারা তাকে ক্রমাগত বলতে লাগল, 'আমিরুল মুমিনিন! এই লোক পথভ্রষ্ট, বিভ্রান্তকারী ও কাফির।' তাদের কথায় উত্তেজিত হয়ে খলিফা আমাকে শাস্তিদানের নির্দেশ দিলেন। একটি চেয়ার এনে আমাকে তার ওপর দাঁড় করানো হলো। কেউ একজন আমাকে চেয়ারের কোনো একটি কাঠ ধরার নির্দেশ দিলো।

আমি তার নির্দেশের মর্মার্থ বুঝতে পারলাম না। আমার দু-হাত দু-দিকে ছড়িয়ে দেওয়া হলো। প্রহারকারীদের শাস্তি শুরু করার আদেশ করা হলো। তাদের হাতে চাবুক ছিল। প্রথমজন তার চাবুক দিয়ে আমাকে দুটি আঘাত করল। এরপর দ্বিতীয় প্রহারকারী এসেও দুটি আঘাত করল। এভাবে একের পর এক প্রহারকারী এসে আমাকে আঘাত করতে লাগল। মুতাসিম প্রহারকারীদেরকে বলছিলেন, 'আল্লাহ তোর হাত কেটে দিন; আরও জোরে মার।' প্রহারের মাঝে আমি কয়েকবার চেতনা হারিয়ে ফেললাম। মার থেমে গেলে আমার চেতনা ফিরে আসত। মুতাসিম পাশে দাঁড়িয়ে আমাকে তাদের মতাদর্শ গ্রহণ করার আহ্বান জানাতে লাগলেন। কিন্তু আমি তার আহ্বানে সাড়া দিলাম না। উপস্থিত সভাসদরা বলছিল, 'ধিক তোমাকে! স্বয়ং খলিফা তোমার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। তারপরও তুমি...?!'

আমি কিছুতেই তাদের মতাদর্শ গ্রহণে রাজি হলাম না। তারা পুনরায় আমাকে প্রহার করা শুরু করল। প্রহার শেষে আবারও আহ্বান, আবারও প্রত্যাখ্যান। এরপর শুরু হলো তৃতীয়বারের প্রহার। খলিফা আবারও আমাকে তার মতাদর্শ মেনে নিতে আহ্বান করলেন। কিন্তু প্রচণ্ড প্রহারের কারণে আমি তখন তার কথা কিছুই বুঝছিলাম না। এরপর তারা আবার আমাকে মারতে লাগল। এ পর্যায়ে আমার বোধ ও অনুভূতিশক্তি লোপ পেল। তখন আমি আর প্রহারের কোনো আঘাতই অনুভব করছিলাম না। আমার অবস্থা দেখে খলিফা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন।

এরপর খলিফার নির্দেশে আমাকে মুক্ত করে দেওয়া হলো। আমি শুধু এতটুকু অনুভব করতে পারলাম যে, আমি কোনো একটি কামরায় আছি এবং আমার পায়ের শৃঙ্খল খুলে দেওয়া হয়েছে। সেদিন ছিল ২২১ হিজরি সনের ২৫ রমজান (৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বর)। এরপর খলিফার পক্ষ থেকে আমাকে আপন পরিবারের কাছে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি প্রদান করা হলো।

সেদিন ইমাম আহমাদকে ত্রিশের অধিক মতান্তরে আশিটি দোররা মারা হয়েছিল। প্রতিটি চাবুকাঘাত ছিল অত্যন্ত বেদম ও তীব্র।

> খলিফার দরবার হতে যখন ইমামকে বাগদাদের নায়েব ইসহাক বিন ইবরাহিমের গৃহে আনা হয়, তখন তিনি রোজাদার ছিলেন। এ সময় রোজা ভাঙার জন্য তার সামনে ছাতু পরিবেশন করা হলে তিনি রোজা ভাঙতে অস্বীকৃতি জানান এবং এ অবস্থায়ই রোজা পূর্ণ করেন।[১০৪]

বর্ণিত আছে, ইমাম আহমাদকে যখন প্রহার করার জন্য দাঁড় করানো হয়, তখন তার পায়জামার ফিতা ছিঁড়ে গিয়েছিল। তিনি তখন সতর উন্মুক্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কায় আল্লাহর কাছে দোয়া করেন, 'হে সাহায্যপ্রার্থীদের সহায়তাকারী, হে জগৎসমূহের প্রভু, আমি যদি তোমার সন্তুষ্টির জন্য ন্যায় ও সত্যের পথে অটল থেকে থাকি, তাহলে আমার সতর উন্মুক্ত করো না।' এরপর তার পায়জামা পূর্বের ন্যায় ঠিক হয়ে যায়।

ইমাম আহমাদ যখন আপন গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন অস্ত্রোপচারকারী চিকিৎসক এসে তার দেহ হতে নিষ্প্রাণ গোশত কেটে ফেলে এবং তার চিকিৎসা শুরু করে। ইমাম আহমদ রহ.-এর প্রতি কৃত আচরণের কারণে খলিফা মুতাসিম অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়েছিলেন। তাই খলিফার নির্দেশে নায়েব ইসহাক প্রতিদিন তার চিকিৎসার খোঁজখবর নিতেন। কিছুদিন পর ইমাম সাহেব সুস্থ হলে খলিফা মুতাসিম অত্যন্ত আনন্দিত হন। মুসলিম জনসাধারণও তাদের প্রাণপ্রিয় ইমামের সুস্থতায় আনন্দিত হয়। আল্লাহ তাআলা তাকে সুস্থতা দান করার পর তিনি তাকে কষ্টপ্রদানকারী বিদআতি ব্যতীত সবাইকে ক্ষমা করে দেন।

ইমাম আহমাদ রহ. বলতেন, 'তোমার কারণে তোমার মুসলমান ভাই আজাবের শিকার হলে তোমার কী লাভ হবে?!'

খলিফা মুতাসিম ২২৭ হিজরি সনের ১৭ রবিউল আউয়াল (৮৪২ খ্রিষ্টাব্দের ৪ জানুয়ারি) আটচল্লিশ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর পূর্বেই তিনি নিজ পুত্র হারুনকে পরবর্তী খলিফা হিসেবে নির্ধারিত করে যান।

---

[১০৪]. ইবনে কাছির দিমাশকি, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ১০/৩৩৯-৩৪১।

ওয়াসিক বিল্লাহ আবু জাফর হারুন বিন মুতাসিম বিন হারুনুর রশিদ বিন মাহদি

[রবিউল আউয়াল ২২৭ হিজরি—জিলহজ ২৩২ হিজরি]
[জানুয়ারি ৮৪২ খ্রিষ্টাব্দ—আগস্ট ৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দ]

ওয়াসিক বিল্লাহর জন্ম ১৯৬ হিজরি সনে বাগদাদে। খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণকালে তার বয়স ছিল একত্রিশ বছর। পূর্ববর্তী খলিফা মুতাসিম যেসব তুর্কিদের বিভিন্ন পদে নিয়োগ দিয়েছিলেন, তার শাসনামলে সেসব তুর্কি সেনাপতির প্রভাব-প্রতিপত্তি আরও সুদৃঢ় হয়। তুর্কিরা এবার রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত হতে থাকে। এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে আশনাছ-এর কথা। ২২৮ হিজরি সনের রমজান মাসে (৮৪৩ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে) খলিফা ওয়াসিক তাকে রাজমুকুট ও রত্নখচিত কোমরবন্দ পরিধান করিয়ে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেন।

২৩০ হিজরি সনে তুর্কি সেনাপতিগণ প্রথমবারের মতো আরব উপদ্বীপে বড় একটি সামরিক অভিযান পরিচালনা করে। মদিনার আশেপাশে তখন বনু সুলায়ম বিদ্রোহ করে অরাজকতা সৃষ্টি করেছিল। তাদের বিদ্রোহ দমনে পরিচালিত অভিযানে নেতৃত্ব দেন তুর্কি সেনাপতি বুগা আল-কাবির আবু মুসা তুর্কি।

২৩২ হিজরি সনে ইয়ামামাতে আরেকটি ফিতনা সংঘটিত হয়। বনু নামির সেখানে অরাজকতা সৃষ্টি করে। বুগা আল-কাবির এই ফিতনাও দমন করতে সক্ষম হন।

খলিফা ওয়াসিকের গর্হিত ও অমার্জনীয় এক অপরাধ

পূর্বতন দুই খলিফার মতো ওয়াসিকের মন-মস্তিষ্কেও মুতাজিলা চিন্তাধারা প্রভাব বিস্তার করেছিল। বরং ওয়াসিক যেন এ ক্ষেত্রে এককাঠি অগ্রসর ছিলেন। তিনি রাতদিন খালকুল কুরআনের আকিদা প্রচার করতেন। একে

কেন্দ্র করেই তার শাসনামলে অত্যন্ত গর্হিত এক ঘটনা সংঘটিত হয়। হত্যা করা হয় বিশিষ্ট আলিম আহমাদ বিন নছর বিন মালিক রহ.-কে। আহমাদ বিন নছর ছিলেন জ্ঞানী, ধার্মিক, সৎকর্মপরায়ণ ও কল্যাণকর্মে তৎপর এক মহান আলিম। তিনি ছিলেন সমকালীন আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর সেসব সুমহান আলিমের একজন, যারা সমাজে সৎ কাজের আদেশ করতেন, অসৎ কাজে বাধা প্রদান করতেন। তিনি খালকুল কুরআনের মাসআলায় খলিফার বিরোধী ছিলেন। ২০১ হিজরি সনে তদানীন্তন খলিফা মামুন যখন বাগদাদের পরিবর্তে মার্ভে অবস্থান করছিলেন, তখন বাগদাদে সৃষ্ট ফিতনা নিরসনে জনগণ যার হাতে বায়আত গ্রহণ করেছিল, সেই নছর বিন মালিক ছিলেন আহমাদ বিন নছরের পিতা।

খলিফা ওয়াসিক আহমাদ বিন নছরকে রাজদরবারে তলব করেন এবং তার সঙ্গে খালকুল কুরআন বিষয়ে বিতর্ক করেন। খলিফা তাকে আপন মতাদর্শে আশ্বস্ত করতে ব্যর্থ হলে নিজ হাতে তাকে হত্যা করেন। এরপর খলিফার নির্দেশে এই মহান আলিমের কর্তিত মস্তক ২৩১ হিজরি সনের ২৮ শাবান হতে ২৩৭ হিজরি সনের ৩ শাওয়াল (৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ এপ্রিল হতে ৮৫২ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ মার্চ) পর্যন্ত বাগদাদে ঝুলিয়ে রাখা হয়।

আহমাদ বিন নছর রহ. আপন আকিদা ও নীতির প্রশ্নে আমৃত্যু অটল ছিলেন। ঐতিহাসিক ইবনে কাছির রহ. লিখেছেন—

> ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ. একদিন তার আলোচনা করতে গিয়ে মন্তব্য করেন, 'আল্লাহ তাআলা তার প্রতি রহম করুন। আল্লাহর জন্য আপন জান কুরবানিতে তিনি কত উদার ছিলেন! দ্বীনের খাতিরে তিনি নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন।' জাফর বিন মুহাম্মাদ আস-সাইগ রহ. বলেন, আমার চোখ যদি সেই দৃশ্য দর্শন না করে থাকে, তাহলে যেন অন্ধ হয়ে যায়! আমার কান যদি সেই শব্দ শ্রবণ না করে থাকে, তাহলে যেন বধির হয়ে যায়! যখন আহমাদ বিন নছরের শিরশ্ছেদ করা হচ্ছিল, তখন তার কর্তিত মস্তক থেকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর ধ্বনি ভেসে আসছিল। তার মস্তক যখন শূলে ঝুলন্ত ছিল, তখন জনৈক ব্যক্তি সেখান থেকে নিম্নোক্ত আয়াতের তেলাওয়াত শুনতে পান—

﴿الٓمٓ ۚ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓا أَن يَقُولُوٓا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾

> আলিফ-লাম-মীম। মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি'—এ কথা বললেই পরীক্ষা না করে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে? [সুরা আনকাবুত : ১-২][১০৫]

ওয়াসিকের পরবর্তী খলিফা মুতাওয়াককিল ছিলেন আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর প্রতি অনুরাগী। তিনি খলিফা হওয়ার পর ২৩৭ হিজরি সনে (৮৫২ খ্রিষ্টাব্দে) আহমাদ বিন নছরের কর্তিত মস্তক শূল থেকে নামিয়ে ফেলার এবং দেহ ও মস্তক একত্র করে তার পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। তার এই সিদ্ধান্তে মুসলিম জনসাধারণ অত্যন্ত আনন্দিত হয় এবং তার জানাজায় বিপুল সংখ্যক মানুষ উপস্থিত হয়। জনগণ সেদিন তার জানাজার খাটিয়া এবং তার লাশ স্পর্শ করার জন্য প্রতিযোগিতা করছিল।

খলিফা ওয়াসিক ২৩২ হিজরি সনের ২৪ জিলহজ (৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ১১ আগস্ট) ইন্তেকাল করেন। এ সময় তার বয়স ছিল ছত্রিশ বছর। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তার পরবর্তী খলিফা হিসেবে কাউকে নির্ধারিত করে যেতে পারেননি। তাই তার মৃত্যুর পর সমকালীন আব্বাসি রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ সমবেত হয় এবং সকলে মিলে প্রয়াত খলিফার ভাই জাফর মুতাওয়াককিল আলাল্লাহ-কে পরবর্তী খলিফা নির্বাচিত করে। খলিফা নির্বাচনে যারা বিশেষ ভূমিকা পালন করে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কাজি আবু দাউদ, উজির মুহাম্মাদ বিন আবদুল মালিক, তুর্কি সেনাপতি ইতাখ প্রমুখ।

---

১০৫. প্রাগুক্ত, ১০/৩১১।

মুতাওয়াককিল আলাল্লাহ আবুল ফজল জাফর বিন মুতাসিম বিল্লাহ বিন হারুনুর রশিদ বিন মাহদি

[জিলহজ ২৩২ হিজরি—শাওয়াল ২৪৭ হিজরি]

[আগস্ট ৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দ—ডিসেম্বর ৮৬১ খ্রিষ্টাব্দ]

খলিফা মুতাওয়াককিলের জন্ম ২০৫ হিজরি সনে। সাতাশ বছর বয়সে তিনি খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হন। আব্বাসি রাজপরিবারের অন্যান্য সদস্যের তুলনায় মুতাওয়াককিল এ দিক থেকে ব্যতিক্রমী ছিলেন যে, তিনি হজরত আলি রাযি. ও তার বংশধরগণের (আলাবি) প্রতি প্রচণ্ড বিদ্বেষী ছিলেন। এ ধরনের মতাদর্শকে আকিদার পরিভাষায় 'নছব' বলা হয়, যা আলিপ্রীতি-নির্ভর শিয়া মতবাদের সম্পূর্ণ উল্টো। খলিফা মুতাওয়াককিল ২৩৬ হিজরি সনে হজরত হুসাইন বিন আলি রাযি.-এর সমাধি ও আশেপাশের সকল ঘরবাড়ি ধ্বংস করার নির্দেশ দেন। খলিফার নির্দেশে ঘোষণা করে দেওয়া হয়—তিন দিন পর যাদেরকে সেখানে পাওয়া যাবে, তাদেরকে পাতাল কয়েদখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ফলে সেখানে একজন ব্যক্তিও অবশিষ্ট ছিল না। এরপর খলিফার নির্দেশে জায়গাটিকে চাষাবাদের স্থানে পরিণত করা হয়।

খলিফা মুতাওয়াককিল ইসলামি সাম্রাজ্যের সকল নগরীতে ইলমুল কালাম সম্পর্কীয় আলোচনা নিষিদ্ধ করে এবং খালকুল কুরআনের মতাদর্শ নিষিদ্ধ করে বার্তা প্রেরণ করেন। তিনি ঘোষণা করেন, যে ব্যক্তি এ বিষয়ে আলোচনা করবে, তার ঠিকানা হবে পাতালের জিন্দানখানা। তিনি সকলকে কেবল কুরআন-সুন্নাহর প্রতি মনোনিবেশ করতে নির্দেশ দেন। খলিফা মুতাওয়াককিল আহমাদ বিন হাম্বল রহ.-কে অত্যন্ত সম্মান করতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে তার পরামর্শ নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের পরামর্শেই খলিফা মুতাওয়াককিল ইবনে আবু দাউদের পরিবর্তে ইয়াহইয়া বিন আকছামকে 'কাজিউল কুজাত' পদে

নিয়োগ দান করেন। ইয়াহইয়া বিন আকছাম ছিলেন সমকালীন আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর বিশিষ্ট আলিমগণের অন্যতম।

ঐতিহাসিক ইবনে কাছির রহ. লিখেছেন—

> খলিফা মুতাওয়াককিল তার প্রজাদের কাছে প্রিয় ছিলেন। তিনি আহলুস সুন্নাহর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ... বিদআতের সয়লাবের পর তিনি সুন্নাহকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। আল্লাহ তার প্রতি দয়ার আচরণ করুন।[১০৬]

—দ্রষ্টব্য—

একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা
বিলম্বে হলেও জালিমের পতন সুনিশ্চিত

খলিফা মুতাওয়াককিলের অন্যতম আস্থাভাজন ব্যক্তি আবদুল আজিজ বিন ইয়াহইয়া আল-কাত্তানি একদিন খলিফার দরবারে উপস্থিত হলেন। তিনি খলিফাকে বললেন, 'আমিরুল মুমিনিন! আমি (পূর্বতন খলিফা) ওয়াসিকের চেয়ে বিস্ময়কর কাউকে জীবনে দেখিনি। তিনি আহমাদ বিন নছর আল-খুযায়িকে হত্যা করেন; অথচ দাফন পর্যন্ত তার জবানে কুরআনের তেলাওয়াত জারি ছিল!' ভাই ওয়াসিক সম্পর্কে আবদুল আজিজের মন্তব্য শুনে মুতাওয়াককিল শঙ্কিত ও মর্মাহত হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর উজির মুহাম্মাদ বিন আবদুল মালিক বিন যাইয়াত দরবারে উপস্থিত হলে খলিফা তাকে বললেন, 'আহমাদ বিন নছরের হত্যার (বৈধতার) বিষয়ে আমার অন্তরে দ্বিধা আছে।' উজির উত্তর দিলেন, 'আমিরুল মুমিনিন! খলিফা ওয়াসিক যদি তাকে কাফির অবস্থায় (অর্থাৎ কুফরি কর্মের শাস্তি হিসেবে) হত্যা না করে থাকেন, তাহলে আল্লাহ যেন আমাকে আগুনে দগ্ধ করেন।' এরপর দরবারে উপস্থিত হলেন হারছামা। খলিফা তাকেও মনের দ্বিধার কথা ব্যক্ত করলে তিনি উত্তর দিলেন, 'খলিফা ওয়াসিক তাকে কাফির অবস্থায় হত্যা না করে থাকলে আল্লাহ যেন আমার

---

১০৬. প্রাগুক্ত, ১০/৩৫৭।

দেহকে খণ্ডবিখণ্ড করে দেন।' এরপর দরবারে উপস্থিত হলেন কাজি আহমাদ বিন আবু দাউদ। খলিফা তাকেও মনের খটকার কথা জানালে তিনি উত্তর দিলেন, 'ওয়াসিক যদি তাকে কাফির অবস্থায় হত্যা না করে থাকেন, তাহলে আল্লাহ যেন আমাকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে দেন।'

মুতাওয়াককিল বলেন, 'ইবনে যাইয়াতকে তো আমি নিজেই আগুনে দগ্ধ করেছি।[১০৭] আর হারছামা পালিয়ে গিয়েছিল। পথে বনু খুযাআর বসতি অতিক্রম করার সময় গ্রামের এক ব্যক্তি তাকে চিনে ফেলে এবং চিৎকার করে বলে, হে বনু খুযাআ! এই ব্যক্তিই তোমাদের জ্ঞাতিভাই আহমাদ বিন নছরকে হত্যা করেছিল। তখন তারা তাকে খণ্ডবিখণ্ড করে ফেলে। আর ইবনে আবু দাউদকে আল্লাহ তাআলা তার দেহাভ্যন্তরেই বন্দি করে দেন অর্থাৎ পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে দেন। মৃত্যুর চার বছর পূর্বে সে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে যায়।'

মুতাওয়াককিলের শাসনামলেই ইয়ামেনের সানআ নগরীতে ইয়া'ফারিয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা ইয়া'ফার বিন আবদুর রহিম। ২৪৭ হিজরি সন হতে ৩৮৭ হিজরি সন (৮৬১-৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত দীর্ঘ ১৪০ বছর এই রাষ্ট্র বিদ্যমান ছিল।

দিনে দিনে আব্বাসি সাম্রাজ্যে তুর্কি মামলুকদের প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছিল। খলিফা মুতাওয়াককিল এ সময় সুস্পষ্ট অনুভব করেন যে, তুর্কিরা রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছে এবং প্রশাসনিক ও সামরিক কর্মকাণ্ডে স্বেচ্ছাচারিতা প্রদর্শন করছে। এ কারণে তিনি তুর্কিদের ক্ষমতা হ্রাসকরণে উদ্যোগী হন। উদ্যোগ বাস্তবায়ন শুরু হয় ইতাখকে দিয়ে। এক কৌশলের মাধ্যমে তিনি তাকে হত্যা করেন।

মুতাওয়াককিল তুর্কিদের বিরুদ্ধে আরবদের শক্তিকে কাজে লাগানোর লক্ষ্যে আব্বাসি সাম্রাজ্যের রাজধানী সামাররা হতে দামেশকে স্থানান্তরের

---

১০৭. মুতাওয়াককিল তাদের এই দুঃসাহস প্রত্যক্ষ করে নিজেই তাদেরকে শাস্তিপ্রদানের মনস্থ করেছিলেন। [মূল গ্রন্থের টীকা]

চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কিছুদিন দামেশকে অবস্থানের পরই অসুস্থবোধ করায় তিনি বাধ্য হয়ে সামাররায় ফিরে আসেন। এ সময় এ কথা ছড়িয়ে পড়ে যে, খলিফা ওয়াসিফ, বুগা ও অন্যান্য তুর্কি সেনাপতিকে হত্যা করার মনস্থ করেছেন। কিন্তু খলিফা নিজের মনোবাসনা বাস্তবায়ন করতে পারেননি। তুর্কিরা তার পূর্বেই প্রতারণা করে তাকে সরিয়ে দেয়।

মুতাওয়াককিল তার পরবর্তী প্রথম খলিফা হিসেবে পুত্র আবু আবদুল্লাহর (মুতায বিল্লাহ) নাম ঘোষণা করেছিলেন। এ কারণে তার আরেক পুত্র আল-মুনতাসির বিল্লাহ ভাই আবু আবদুল্লাহ ও পিতার প্রতি ক্রুদ্ধ হন। তুর্কিরা যেহেতু খলিফা মুতাওয়াককিলের তুর্কি-বিরাগ সম্পর্কে জেনে ফেলেছিল, তাই স্বাভাবিকভাবেই তারা ছিল মুনতাসিরের পক্ষে। তুর্কিদের সহায়তায় মুনতাসির অসুস্থ মুতাওয়াককিলের গৃহে প্রবেশ করে তাকে হত্যা করেন। মুতাওয়াককিলের হত্যাঘটনার মধ্য দিয়েই আব্বাসি সাম্রাজ্যের প্রতাপ ও সমৃদ্ধির যুগের সমাপ্তি ঘটে এবং নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা হয়, যাকে আমরা অভিহিত করতে পারি তুর্কিদের প্রত্যক্ষ প্রভাব-নিয়ন্ত্রিত আব্বাসি খলিফাদের শাসনামল হিসেবে।

* * *

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তুর্কিদের প্রত্যক্ষ প্রভাব-নিয়ন্ত্রিত আব্বাসি খলিফাগণের বিবরণ

[শাওয়াল ২৪৭ হিজরি—সফর ৩৩৩ হিজরি]

[ডিসেম্বর ৮৬১ খ্রিষ্টাব্দ—অক্টোবর ৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দ]

আল-মুনতাসির আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন মুতাওয়াককিল বিন মুতাসিম বিন হারুনুর রশিদ

[শাওয়াল ২৪৭ হিজরি—রবিউস সানি ২৪৮ হিজরি]

[ডিসেম্বর ৮৬১ খ্রিষ্টাব্দ—জুন ৮৬২ খ্রিষ্টাব্দ]

খলিফা মুনতাসিরের জন্ম ২২২ হিজরি সনে। দায়িত্ব গ্রহণকালে তার বয়স ছিল পঁচিশ বছর। তিনি যখন খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হন, ততদিনে আব্বাসি সাম্রাজ্যে তুর্কিদের প্রভাব-প্রতিপত্তি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন তাদের ক্ষমতার হাত খলিফাদের ব্যক্তিজীবন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। ইতিমধ্যে তারা এক খলিফাকে হত্যা করে আরেকজনকে খলিফা পদে অধিষ্ঠিত করেছে। এর মাধ্যমে তারা সরাসরি রাষ্ট্রের মূল দেহ-কাঠামোতেই নখর বসাতে সক্ষম হয়েছে। তুর্কিরা প্রয়াত খলিফা মুতাওয়াককিলের অপর দুই পুত্র মুতায ও মুতামিদকে ভাবী খলিফা হিসেবে মোটেও পছন্দ করত না। তাই তারা এ বিষয়ে মুনতাসিরকে চাপপ্রয়োগ করতে থাকে। অবশেষে মুনতাসিরের চাপে তার দুই ভাই ওলিয়ে আহদ হতে নিজেদের দাবি-প্রত্যাহারপত্র লিখে দেন। এ ঘটনার মাধ্যমে তুর্কি সৈন্যদের চাপে নিষ্পেষিত খলিফার অক্ষমতা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়। মুনতাসির পরবর্তী সময়ে নিজের পিতৃহত্যার অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হন। রাতদিন নিদ্রায় ও জাগ্রত অবস্থায়—সবসময় তিনি নিজেকে ভর্ৎসনা করতেন এবং নিজের কৃতকর্মের জন্য কান্নাকাটি করতেন। তিনি তার পিতার প্রত্যক্ষ হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু তার পূর্বেই তিনি ২৪৮ হিজরি সনের ২৫ রবিউস সানি (৮৬২ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ জুন) ছাব্বিশ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তার খিলাফতকাল ছয় মাসেরও কম স্থায়ী হয়েছিল।

মুসতাইন বিল্লাহ আবুল আব্বাস আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন মুতাসিম বিন হারুনুর রশিদ

[রবিউস সানি ২৪৮ হিজরি—মুহাররম ২৫২ হিজরি]
[জুন ৮৬২ খ্রিষ্টাব্দ—জানুয়ারি ৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দ]

খলিফা মুসতাইনের জন্ম ২২০ হিজরি সনে বাগদাদে। আটাশ বছর বয়সে তিনি খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হন। বুগা আস-সাগির, বুগা আল-কাবির ও আতামিশ প্রমুখ তুর্কি সেনাপতিদের নির্দেশনায় মুসতাইনকে খলিফা নির্বাচিত করা হয়। কারণ, পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে পারেন—এই আশঙ্কায় তুর্কিরা মুতাওয়াককিলের কোনো পুত্রকে খলিফা পদে অধিষ্ঠিত করতে রাজি ছিল না। তাই তারা তাদেরকে বাদ দিয়ে মুতাওয়াককিলের ভাই মুহাম্মাদের পুত্র আহমাদকে মুসতাইন বিল্লাহ উপাধি দিয়ে খলিফা নির্বাচিত করে। আব্বাসি সাম্রাজ্যের প্রথম দুই খলিফা সাফফাহ ও মানসুরের পর মুসতাইন বিল্লাহ আহমাদই প্রথম খলিফা, যার পিতা খলিফা ছিলেন না। তিনিই প্রথম আব্বাসি খলিফা, যিনি আপন চাচাতো ভাইয়ের পর খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

মুসতাইন বিল্লাহ দায়িত্ব গ্রহণের পর খলিফা পদের প্রভাব-প্রতিপত্তি আরও দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তুর্কি মামলুকরাই সাম্রাজ্য পরিচালনা করতে থাকে। খলিফার উজিরও তারাই নির্ধারণ করত। কোনো উজিরের প্রতি বিরাগভাজন হলে তারা তাকে বরখাস্ত করত এবং তার ধনসম্পদ বাজেয়াপ্ত করত।

এরপর তুর্কি সেনাপতি আতামিশ উজির পদ গ্রহণ করে এবং রাষ্ট্রীয় সকল কর্মকাণ্ডের একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে যায়। এ কারণে ওয়াছিফ, বুগা প্রমুখ তুর্কি সেনাপতিগণ তার প্রতি বিরাগভাজন হয়ে পড়ে। তাদের প্ররোচনায় সেনাবাহিনী আতামিশকে হত্যা করে এবং তার বাড়ি লুট করে।

আতামিশের মৃত্যুর পর খলিফা মুসতাইন বিল্লাহ আবু সালিহ আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদকে উজির নিযুক্ত করেন, বুগা আস-সাগিরকে প্রদান করেন ফিলিস্তিনের গভর্নরের দায়িত্ব আর ওয়াছিফকে প্রদান করেন আহওয়াজের গভর্নরের দায়িত্ব। ২৫১ হিজরি সনে বুগা আল-কাবির, ওয়াছিফসহ অন্য কয়েকজন তুর্কি সেনাপতি একজোট হয়ে তুর্কি সেনাপতি বাগিরকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। যেসব তুর্কি সেনাপতি সরাসরি মুতাওয়াককিল-হত্যায় অংশগ্রহণ করেছিল, বাগির ছিল তাদের অন্যতম। বাগির ততদিনে বিস্তৃত জায়গিরের মালিক হয়ে গিয়েছিল এবং তার অনুসারী ও কর্মীদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাকে হত্যা করার পর তার যাবতীয় সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়।

খলিফা মুসতাইনের শাসনামলেই যায়দিয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তিবরিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় হাসান বিন যায়দ বিন মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল বিন হাসান বিন যায়দ বিন হাসান বিন আলি বিদ্রোহ করেন এবং তিবরিস্তানে যায়দিয়া রাষ্ট্র (ব্যাপ্তিকাল : ২৫০-৩০০ হিজরি) নামে নতুন একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।

২৫১ হিজরি সনেই বাগদাদ ও সামাররার সেনাবাহিনীর মধ্যে বিরাট সংঘাতের ঘটনা ঘটে। সামাররাবাসী প্রয়াত খলিফা মুতাওয়াককিলের পুত্র মুতায-এর হাতে বায়আতের দাবি তোলে। মুতায তখন বন্দি ছিলেন। তাকে জেলখানা থেকে বের করে আনা হয়। বিপরীতে বাগদাদবাসী মুসতাইনের বায়আতে ঐক্যবদ্ধ থাকে। মুসতাইন তার নায়েব মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন তাহিরকে বাগদাদ নগরী সুরক্ষিত করার নির্দেশ দেন। বাগদাদের চারপাশে নিরাপত্তা-প্রাচীর নির্মাণ করা হয়, পরিখা খনন করা হয় এবং প্রাচীরের ওপর মিনজানিক ও অন্যান্য বিশালাকার বিভিন্ন যুদ্ধাস্ত্র স্থাপন করা হয়। ওদিকে মুতায ইবনে তাহিরের কাছে বার্তাবাহক পাঠিয়ে তাকে তার দলে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি তাকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, মুতাওয়াককিলের জীবদ্দশায় তিনি মুতাযের বায়আতের অঙ্গীকার করেছিলেন। কিন্তু ইবনে তাহির মুতাযের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে।

তুর্কিরা এবার মুতাযের শিবিরে যোগ দেয়। উভয় দলের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকে প্রচণ্ড যুদ্ধ ও ধ্বংসাত্মক ফিতনা। উভয় পক্ষেই প্রচুর মানুষ হতাহত হয়।

পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটলে ইবনে তাহির খলিফা মুসতাইনের বিপক্ষে চলে যায় এবং তাকে স্বেচ্ছায় অব্যাহতি গ্রহণে চাপ প্রয়োগ করে। নিরুপায় হয়ে খলিফা অব্যাহতি গ্রহণে সম্মত হন। এরপর ইবনে তাহির বাগদাদ হতে একদল আমিরকে মুসতাইনের পদত্যাগের সংবাদ নিয়ে সামাররায় মুতাযের কাছে প্রেরণ করে। তারা সামাররায় উপস্থিত হলে মুতায তাদেরকে অভিনন্দন জানান এবং মূল্যবান পুরস্কারে ভূষিত করেন।

আব্বাসি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে এই গৃহবিবাদের কারণে স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। রোমানরা এ সময় বিভিন্ন যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীকে পরাজিত করে এবং সীমান্ত অঞ্চলের দুই মহান মুসলিম সেনাপতি উমর বিন আবদুল্লাহ আল-আকতা ও আলি বিন ইয়াহইয়া আল-আরমানিকে হত্যা করে।

খলিফা মুসতাইন অব্যাহতি গ্রহণের কিছুদিন পরই তার ভাই ও নতুন খলিফা মুতায বিল্লাহর প্রেরিত ঘাতকের হাতে নিহত হন। এ সময় তার বয়স ছিল বত্রিশ বছর।

আল-মুতায বিল্লাহ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন মুতাওয়াককিল বিন মুতাসিম বিন হারুনুর রশিদ

[মুহাররম ২৫২ হিজরি—রজব ২৫৫ হিজরি]
[জানুয়ারি ৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দ—জুলাই ৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দ]

খলিফা মুতাযের জন্ম ২৩২ হিজরি সনে। বিশ বছর বয়সে তিনি খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হন। মুতাযের শাসনামলে আব্বাসি সাম্রাজ্যের পরিস্থিতি আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। সেনাবাহিনীর মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতও প্রকট রূপ ধারণ করে। ফলে মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় অপসারণের মধ্য দিয়ে মুতাযের খিলাফতকালের সমাপ্তি ঘটে।

খলিফার সঙ্গে চরম অমানবিক আচরণ

আব্বাসি খলিফা তখন নামেই খলিফা। তার নির্দেশের কোনো মূল্য নেই। সৈন্যরা একদিন সমবেত হয়ে তার কাছে নিজেদের বকেয়া বেতন-ভাতা দাবি করে। কিন্তু খলিফার কাছে তাদেরকে প্রদান করার মতো কিছুই ছিল না! তখন তুর্কি সেনাপতিগণ তাকে অপসারণের বিষয়ে একমত হয় এবং তাকে রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে আসার নির্দেশ পাঠায়। কিন্তু খলিফা এই বলে অপারগতা প্রকাশ করেন যে, তিনি অসুস্থ এবং ওষুধ সেবন করায় এখন তিনি দুর্বলতা বোধ করছেন। তখন কয়েকজন তুর্কি সৈন্য ভেতরে প্রবেশ করে তাকে টেনে হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে আসে। মাটির ঘর্ষণে তার পরিধেয় বস্ত্র ছিঁড়ে যায় এবং শরীর থেকে রক্ত ঝরতে থাকে। তুর্কি সৈন্যরা তাকে রাজদরবারের আঙিনায় প্রচণ্ড রোদের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রাখে। ক্লান্ত-শ্রান্ত ও বিধ্বস্তপ্রায় খলিফা একেকবার একেক পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার প্রাণান্ত চেষ্টা করছিলেন আর কিছু লোক তাকে চপেটাঘাত করছিল এবং বলছিল, 'খিলাফতের দায়িত্ব ছেড়ে দাও; সকলে তোমার বিরুদ্ধে একজোট।' খলিফা তখন কাঁদছিলেন। এরপর তুর্কিরা খলিফাকে একটি বদ্ধ প্রকোষ্ঠে বন্দি করে রাখে এবং বিভিন্ন ধরনের শাস্তি প্রদান করতে

থাকে। নিরুপায় হয়ে তিনি খিলাফতের দায়িত্ব হতে ইস্তফা প্রদান করেন এবং মুহতাদি বিল্লাহকে পরবর্তী খলিফা ঘোষণা করেন।

এরপর তুর্কিরা মুতাযকে কিছু দুষ্ট লোকের হাতে তুলে দেয়। তারা খলিফার ওপর বিভিন্নভাবে নির্যাতন চালায়। একটানা তিন দিন তাকে পানাহার হতে বঞ্চিত রাখা হয়। পিপাসায় কাতর হয়ে পানি চাইলেও তাকে সামান্য পানি প্রদান করা হয়নি। এরপর তারা তাকে চুনে পূর্ণ একটি গর্তে নিক্ষেপ করে। ফলে তিনি সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। তার লাশ বের করার পর দেখা যায়—শরীরে কোনো ক্ষতচিহ্ন নেই। এরপর তুর্কিরা কয়েকজন আমিরকে ডেকে সাক্ষী রাখে যে, সাবেক খলিফা কোনোপ্রকার আঘাত ব্যতিরেকে স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন!

খলিফা মুতায বিল্লাহ ২৫৫ হিজরি সনের রজব মাসে তেইশ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

মুতায বিল্লাহর খিলাফত আমলেই ২৫৪ হিজরি সনে (৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে) মিশরে তুলুনিয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ২৯২ হিজরি সন (৯০৫ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত ব্যাপ্ত এই রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আহমাদ বিন তুলুন। তিনি তুর্কি মামলুক ছিলেন। তুলুনিয়া রাষ্ট্র সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সামনে করা হবে।

আল-মুহতাদি বিল্লাহ আবু ইসহাক মুহাম্মাদ বিন ওয়াসিক বিন মুতাসিম বিন হারুনুর রশিদ

[রজব ২৫৫ হিজরি—রজব ২৫৬ হিজরি]

[জুলাই ৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দ—জুন ৮৭০ খ্রিষ্টাব্দ]

খলিফা মুহতাদি বিল্লাহর জন্ম ২১৯ হিজরি সনে। ২৫৫ হিজরি সনের রজব মাসে ছত্রিশ বছর বয়সে তিনি তার চাচাতো ভাই মুতায বিল্লাহর স্থলাভিষিক্ত হন।

মুহতাদি বিল্লাহ পূর্ববর্তী খলিফা মুতায কর্তৃক বাগদাদে নির্বাসিত ও বন্দি ছিলেন। তুর্কিরা তাকে মুতায বিল্লাহর স্থলাভিষিক্ত করার জন্য উপস্থিত করে। তিনি যখন সামাররায় আসছিলেন, পথিমধ্যে তুর্কি মামলুকরা তার সাক্ষাৎ পায় এবং তাকে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ জানায়। কিন্তু তিনি মুতাযের সাক্ষাৎলাভ এবং তার কথা শ্রবণ করার পূর্বে দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। মুতাযের সাক্ষাৎলাভের পর যখন তিনি তাকে উল্লিখিত অবস্থায় দেখতে পান, তখন তাকে জড়িয়ে ধরেন এবং তার এই দুরবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। মুহতাদি বিল্লাহ মুতায ও তুর্কিদের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টিরও চেষ্টা করেন। কিন্তু মুতায তাকে নিবৃত্ত করে বলেন, 'আমার এই সমঝোতার প্রয়োজন নেই আর তারা আমার প্রতি সন্তুষ্ট হবেও না।'

মুহতাদি বিল্লাহ ছিলেন বনু আব্বাসের অন্যতম নেককার, বুজুর্গ ও ন্যায়পরায়ণ খলিফা।[১০৮] তিনি জুলুম-অত্যাচার অপছন্দ করতেন। প্রজাদের মাঝে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে তিনি চার দরজাবিশিষ্ট একটি

---

১০৮. খতিব বাগদাদি রহ. লিখেছেন, খলিফা মুহতাদি বিল্লাহ খলিফা হওয়ার পর থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত প্রতিদিন রোজা রেখেছেন। দ্রষ্টব্য : আবু বকর খতিব বাগদাদি, *তারিখু বাগদাদ*, ৪/১১৮।

বিচারালয় নির্মাণ করেন এবং এর নামকরণ করেন 'ন্যায়বিচার ভবন'। তিনি সেখানে বসে জনসাধারণ ও বিশিষ্টজন সকলের অভিযোগ শুনতেন। তিনি সৎকাজের আদেশ করতেন, অসৎ কাজে বাধা প্রদান করতেন। তিনি মদপান ও গানবাদ্যও নিষিদ্ধ করেন। মুহতাদি বিল্লাহর ধার্মিকতা ও সংযমশীলতা দেখে সৈন্যগণ সান্ত্বনা লাভ করত। কিন্তু তুর্কিদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের কারণে আব্বাসি সাম্রাজ্যের অবস্থা ছিল পূর্বের ন্যায় অস্থিতিশীল।

রাষ্ট্রের স্বার্থে খলিফা মুহতাদি বিল্লাহ জনৈক সেনাপতির প্রতি প্রসন্ন ছিলেন। একে কেন্দ্র করে তুর্কিরা এবার তাকে অপসারণের মনস্থ করে। এ সংবাদ যখন জনসাধারণের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে, তখন তারা কিছু কাগজের টুকরা মসজিদে ও রাস্তাঘাটে ছড়িয়ে দেয়। কাগজগুলোতে লেখা ছিল—

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

> হে মুসলিম সম্প্রদায়, উমর ইবনুল খাত্তাবের সঙ্গে তুল্য তোমাদের ন্যায়পরায়ণ খলিফার কল্যাণের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করো। আল্লাহ যেন তাকে শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয়ী করেন এবং জালিমদের মোকাবিলায় তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। মামলুকরা তাকে স্বেচ্ছায় অব্যাহতি গ্রহণের জন্য চাপ প্রয়োগ করছে এবং কয়েকদিন যাবৎ বিভিন্ন শাস্তি দিচ্ছে। অমুক অমুক এর পেছনে কলকাঠি নাড়ছে। যারা নিয়ত ও কর্মে নিষ্ঠার পরিচয় দেবে ও দোয়া করবে, আল্লাহ তাদের প্রতি রহম করুন এবং নবীজির প্রতি শান্তি বর্ষিত করুন।

জনগণের এই কর্মতৎপরতার সংবাদ পেয়ে তুর্কিরা গণবিদ্রোহের আশঙ্কা করে। তারা এবার খলিফার কাছে বার্তা পাঠায় যে, আমরা আপনার জন্য নিজেদের জান-প্রাণ বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত আছি। পাশাপাশি তারা খলিফাকে নিজেদের আর্থিক দুরবস্থা ও ভাতাপ্রাপ্তিতে বিলম্বের বিষয়ে অবহিত করে এবং বড় বড় তুর্কি সেনাপতিরা যে বিভিন্ন জায়গির কুক্ষিগত রেখে সাধারণ সৈন্যদের বঞ্চিত করছে, সে বিষয়ে অভিযোগ জানায়। মুহতাদি তাদেরকে সদাচরণের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো— খলিফার কাছে তখন তুর্কি সৈন্যদের প্রয়োজন পূরণের মতো যথেষ্ট সম্পদ ছিল না। তুর্কি সৈন্যরা বারবার নিজেদের দাবি জানাতে থাকে এবং

তাদের প্রয়োজন পূরণের দাবিতে খলিফার দরবার-দ্বারে অবস্থান গ্রহণ করতে থাকে।

এটি ছিল সেনাপতিদের প্রতি সেনাসদস্যদের অবিন্যস্ত ও বিশৃঙ্খল এক বিদ্রোহ। যদি কোনো শক্তিশালী খলিফা এ সময় বিদ্যমান থাকতেন এবং এই বিদ্রোহের সদ্ব্যবহার করতেন, তাহলে নিশ্চিত করেই আব্বাসি রাজপরিবার তুর্কিদের প্রভাব থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারত। কিন্তু মুহতাদি বিল্লাহ তা করেননি। তিনি মনে-প্রাণে সৈন্যদের পক্ষে থাকলেও বাহ্যিক আচরণে ছিলেন সেনাপতিদের পক্ষে। সম্ভবত তিনি কৌশলে তুর্কি সেনাপতিদের প্রভাব থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু তুর্কিরা তার মনোবাসনা উপলব্ধি করে ফেলে। একে কেন্দ্র করে আবারও আব্বাসি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে যুদ্ধের ঘটনা ঘটে। যুদ্ধের এক পক্ষে ছিল তুর্কিদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধকামী সাধারণ জনগণ ও তুর্কি ব্যতীত অন্যান্য মামলুকগণ, অপর পক্ষে ছিল তুর্কি সৈন্যগণ। খলিফা মুহতাদি বিল্লাহ নিজে গলায় কুরআন ঝুলিয়ে বের হয়ে আসেন এবং তাকে সহায়তা করার জন্য সকলকে আহ্বান জানান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তুর্কিরাই জয়লাভ করে।

২৫৬ হিজরি সনের ১৪ রজব (৮৭০ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ জুন) তুর্কিরা মুহতাদিকে বন্দি করে এবং তাকে তার গৃহে আটকে রাখে। তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগে অস্বীকৃতি জানালে তুর্কিরা তাকে জোরপূর্বক খিলাফতের দায়িত্ব হতে অপসারণ করে। ২৫৬ হিজরি সনের ১৮ রজব (৮৭০ খ্রিষ্টাব্দের ২১ জুন) মুহতাদি বিল্লাহ ইন্তেকাল করেন। এ সময় তার বয়স ছিল সাঁইত্রিশ বছর।

১৫ নং আব্বাসি খলিফা

আল-মুতামিদ আলাল্লাহ আবুল আব্বাস আহমাদ বিন মুতাওয়াককিল বিন মুতাসিম বিন হারুনুর রশিদ

[রজব ২৫৬ হিজরি—রজব ২৭৯ হিজরি]

[জুন ৮৭০ খ্রিষ্টাব্দ—অক্টোবর ৮৯২ খ্রিষ্টাব্দ]

মুহতাদির পতনের পর খিলাফত-দায়িত্ব আবারও মুতাওয়াককিল পরিবারে ফিরে আসে। এবার খলিফা নির্বাচিত হন মুহতাদির চাচাতো ভাই এবং মুহতাদির পূর্ববর্তী খলিফা মুতায বিল্লাহর আপন ভাই মুতামিদ। মুতামিদের জন্ম ২২৯ হিজরি সনে। দায়িত্ব গ্রহণের সময় তার বয়স ছিল সাতাশ বছর।

নেতৃস্থানীয় তুর্কি সেনাপতিগণ এ সময় নিজেদের মধ্যে চরম সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছিল। তাই তারা খলিফার কাছে দাবি জানায়—তিনি যেন তুর্কি সেনাপতিদের পরিবর্তে তার কোনো ভাইকে সেনাপতির দায়িত্ব প্রদান করেন। খলিফা মুতামিদ তার ভাই আবু আহমাদ তালহা (মুওয়াফফাক বিল্লাহ) বিন মুতাওয়াককিলকে সেনাবাহিনী ও গর্ভনরদের পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করেন।

আব্বাসি রাষ্ট্রের প্রকৃত ক্ষমতা এবার চলে যায় খলিফার পরিবর্তে আবু আহমাদের হাতে। সেনাপতি ও তুর্কি সৈন্যরা তার নির্দেশেই পরিচালিত হতো। এর ফলে সার্বিক পরিস্থিতি মোটের ওপর ভালো হলেও স্বয়ং খলিফা মুতামিদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি কার্যত নিঃশেষ হয়ে যায়। এমনকি একবার তার মাত্র তিনশ দিনার প্রয়োজন হলেও তিনি তা চেয়ে পাননি। ইতিপূর্বে অষ্টম আব্বাসি খলিফা মুতাসিম আব্বাসি খিলাফতের রাজধানী সামাররায় স্থানান্তরের পর খলিফা মুতামিদই পুনরায় বাগদাদকে দারুল খিলাফাহ ও রাজধানী নির্ধারণ করেন।

খলিফার ভাই আবু আহমাদ ছিলেন প্রখর মেধা ও প্রশাসনিক দক্ষতাসম্পন্ন একজন ব্যক্তি। তিনি কাজিদের সঙ্গে নিয়ে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় তৎপর

ছিলেন। অধিকন্তু তিনি সাহিত্য, ফিকহ ও রাজনীতি সম্পর্কে প্রজ্ঞাপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তার বিভিন্ন কীর্তি ও কল্যাণকর্মে মুগ্ধ হয়ে খলিফা তাকে 'মুওয়াফফাক বিল্লাহ' উপাধি প্রদান করেন। পরবর্তী সময়ে মুওয়াফফাক বিল্লাহ যখন দীর্ঘ যুদ্ধ শেষে আলাবি দাবিদার জনৈক বিদ্রোহীর বাহিনীকে পরাজিত করেন, তখন জনগণ তাকে 'আন-নাসির লি দ্বীনিল্লাহ' উপাধি দান করে।

আলাবি দাবিদার জনৈক হাবশির বিদ্রোহ

২৫৫ হিজরি সনের রমজান মাসে (৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে) আলিবংশের দাবিদার বংশপরিচয়হীন এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে। সে নিজেকে আলি বিন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন আলি বিন ঈসা বিন যায়দ বিন আলি বিন হুসাইন বিন আলি বিন আবু তালিব বলে পরিচয় দেয় এবং সবাইকে তার হাতে বায়আত গ্রহণের আহ্বান জানায়।

প্রথম তার ফিতনার আত্মপ্রকাশ ঘটে বাহরাইনে। এরপর সে বাদিয়ায় চলে যায়। তারপর ২৫৪ হিজরিতে পৌঁছে যায় বসরায়। এরপর এই আলাবি দাবিদার তার অনুসারীদের নিয়ে বাগদাদে পৌঁছায়। সেখানে সে এক বছর অবস্থান করে মানুষকে গোপনে তার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। পরে সে আবারও বসরায় চলে যায় এবং বসরার নিকটবর্তী কসরে কুরশি নামক প্রাসাদে তার সঙ্গীদের নিয়ে অবস্থান করে। বসরায় দ্বিতীয়বার আগমন করার পর সে সেখানে সার ও অন্যান্য পণ্য বহনে নিয়োজিত ক্রীতদাসদের সাহায্য প্রার্থনা করে। ক্রীতদাসরা সংখ্যায় ছিল অনেক। স্বাভাবিকভাবেই তারা শ্রমমুক্ত স্বাধীন জীবনের স্বপ্ন দেখত। আলাবি দাবিদার বিদ্রোহী লোকটি তাদেরকে স্বাধীন জীবনের প্রতিশ্রুতি দানের পাশাপাশি বর্তমান মালিকদের তাদের দাসে পরিণত করার প্রতিশ্রুতি দেয়। স্বাধীন জীবনের স্বপ্নই যাদের কাছে অনেক বড় কিছু, তাদের যখন আরও স্বপ্ন দেখানো হয় যে, কয়েকদিন পর তাদের বর্তমান মালিকরা তাদেরই ক্রীতদাসে পরিণত হবে, তখন পরিস্থিতি কোন দিকে গড়াবে, তা বলাই বাহুল্য।

আলি বিন মুহাম্মাদ দাবিদার হাবশি বিদ্রোহী এরপর রায়হান বিন সালিহ নামক জনৈক ক্রীতদাসকে অন্যদের প্ররোচিত করার দায়িত্ব দেয়। সে তাকে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, ভবিষ্যতে সে-ই হবে আলাবি বাহিনীর প্রধান

সেনাপতি। রায়হানের প্রচেষ্টায় বহু সংখ্যক হাবশি ক্রীতদাস বিদ্রোহী দলে যোগ দেয়। আলি তাদেরকে বক্তৃতার মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করে, তাদেরকে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি প্রদান করে এবং অঙ্গীকার করে যে, সে তাদের সঙ্গে কখনো প্রতারণা করবে না। ফলে অন্যান্য হাবশি ক্রীতদাসরাও দলে দলে তার পক্ষে সমবেত হতে থাকে।

নতুন এই ফিতনা দমন করার জন্য খলিফা মুতামিদ একের পর এক কয়েকটি বাহিনী প্রেরণ করেন। কিন্তু প্রতিটি বাহিনী বিদ্রোহীদের কাছে পরাজিত হয়। একের পর এক বিজয়ে আলি উন্মাদ হয়ে ওঠে এবং তার অনুসারীদের নিয়ে লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে ব্যাপক অরাজকতা চালাতে থাকে। দিনে দিনে সে আব্বাসি সাম্রাজ্যের জন্য মূর্তিমান আতঙ্ক হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি বিবেচনায় আবু আহমাদ আল-মুওয়াফফাক তাকে দমনের জন্য বিশাল সৈন্যসমাবেশ ঘটান এবং নিজেই বাহিনীর সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রধান সহকারী হিসেবে তিনি সঙ্গে নেন তার পুত্র আবুল আব্বাসকে। বিদ্রোহী আলিকে দমন করার জন্য জনগণ দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে বাহিনীতে যোগদান করে।

একটানা কয়েক বছর আলির বিরুদ্ধে আবু আহমাদের লড়াই অব্যাহত থাকে। আলিকে দমন করতে আবু আহমাদ আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করেন। এমনকি তিনি এক যুদ্ধে তিরবিদ্ধও হন এবং কয়েকদিন অসুস্থ থাকেন। সেনাপতি আহত হয়ে পড়ায় সৈন্যরাও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু আবু আহমাদ সকলকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। একপর্যায়ে তিনি সুস্থ হন এবং আল্লাহ তাআলা তাকে বিজয় দান করেন। দুষ্ট বিদ্রোহীর কর্তিত মস্তক তার সামনে আনা হলে তিনি আল্লাহর শোকর আদায় করতে সিজদাবনত হয়ে পড়েন। ইসলামি বিশ্বের প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মুসলমানগণ এই বিজয়ে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। ২৭০ হিজরি সনের সফর মাসে (৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে) এই ফিতনার পতন ঘটে। অর্থাৎ একটানা চৌদ্দ বছর সে আব্বাসি রাজপরিবারকে নির্ঘুম রেখেছিল।

মুতামিদের আমলে ২৬১ হিজরি সনে (৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে) ট্রান্সঅক্সিয়ানা অঞ্চলে সামানিয়া রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটে। ৩৮৯ হিজরি সন (৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত একটানা প্রায় একশ সত্তর বছর সামানিয়া রাষ্ট্র টিকে ছিল। একদিকে গজনবি (সুবুক্তগিন) পরিবার, অপরদিকে খাকানি তুর্কিদের

হাতে সামানিয়া রাষ্ট্রের পতন ঘটে। সামানিয়া রাষ্ট্র সম্পর্কেও সামনে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

মুতামিদের শাসনামলে বাহরাইন, ইরাক ও শাম—এই তিন অঞ্চলে কারামাতিয়া সম্প্রদায়ের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এ ছাড়াও সে সময় ইয়ামেন ও আফ্রিকা অঞ্চলে উবায়দি সাম্রাজ্যের আহ্বায়কগণ তাদের চিন্তাধারা প্রসারে ব্যস্ত ছিল। অর্থাৎ একই সঙ্গে ইসলামি বিশ্বের প্রতিটি অংশে ইসমাইলি মতাদর্শীরা এমন প্রবল শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করার প্রেক্ষাপট তৈরি করছিল, যার অনিষ্টতা রোধ করার মতো শক্তি তৎকালীন আব্বাসি খিলাফতের ছিল না। আর কিছুদিন পর বাস্তবেও তা-ই ঘটেছিল।

২৭৯ হিজরি সনের ৯ রজব (৮৯২ খ্রিষ্টাব্দের ৫ অক্টোবর) আব্বাসি খলিফা মুতামিদ পঞ্চাশ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

আল-মুতাযিদ বিল্লাহ আবুল আব্বাস আহমাদ বিন মুওয়াফফাক বিল্লাহ বিন মুতাওয়াককিল বিন মুতাসিম

[রজব ২৭৯ হিজরি—রবিউস সানি ২৮৯ হিজরি]

[অক্টোবর ৮৯২ খ্রিষ্টাব্দ—এপ্রিল ৯০২ খ্রিষ্টাব্দ]

দ্বাদশ আব্বাসি খলিফা মুসতাইন বিল্লাহর ন্যায় মুতাযিদ বিল্লাহও আব্বাসি খলিফাগণের মধ্যে এদিক থেকে স্বতন্ত্র ছিলেন যে, তার পিতা পূর্বে খলিফা ছিলেন না। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তার পিতা মুওয়াফফাক বিল্লাহ আবু আহমাদ তালহা ছিলেন পঞ্চদশ আব্বাসি খলিফা মুতামিদের শাসনামলে সেনাবাহিনী ও গভর্নরদের পরিচালক; বরং বলা ভালো—খলিফা না হয়েও রাষ্ট্রের মূল নিয়ন্ত্রক!

মুতাযিদ বিল্লাহ ২৪২ হিজরি সনে জন্মগ্রহণ করেন। দায়িত্ব গ্রহণের সময় তার বয়স ছিল সাঁইত্রিশ বছর। মুতাযিদ ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ আব্বাসি খলিফা। বিচক্ষণ, উদার ও দুঃসাহসী এই খলিফা যুদ্ধাভিযানে নিজেই নেতৃত্ব দিতেন। তিনি অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। জনসাধারণ তাকে শ্রদ্ধা করত। তার শাসনামল ছিল নিরাপত্তা ও শান্তিতে পূর্ণ। তিনি জনগণের ওপর আরোপিত কর মওকুফ করেন এবং ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেন।

মূলত মুতাওয়াককিলের হত্যাকাণ্ডের পর থেকেই আব্বাসি সাম্রাজ্য বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির শিকার ছিল। অবশেষে খলিফা মুতাযিদ বিল্লাহ ভগ্নপ্রায় ও পতনোন্মুখ আব্বাসি খিলাফতের গৌরব নতুন করে উজ্জীবিত করেন। এ কারণে তাকে দ্বিতীয় সাফফাহ (অর্থাৎ আব্বাসি সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা) নামকরণ করা হয়।

মুতাযিদ বিল্লাহ লিপিকার ও বই বিক্রেতাদের আব্বাসি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে দর্শন ও তৎসংশ্লিষ্ট শাস্ত্রের গ্রন্থ বিক্রি করতে নিষেধ করে দেন, গল্পকার ও গণকদের রাস্তায় বসা নিষিদ্ধ করেন। তিনি অপ্রয়োজনীয় খাতে অর্থব্যয়ে

বিরত থাকতেন। এ কারণে ঐতিহাসিকদের কেউ কেউ তাকে 'কৃপণ' আখ্যায়িত করেছেন।

মুতাযিদ বিল্লাহর শাসনামলে রোমান সীমান্ত অঞ্চলে মুসলিম বাহিনীর অভিযানের ধারা বৃদ্ধি পায়। এসব অভিযান কখনো পরিচালিত হতো শাম সীমান্তের বিশেষ করে তারসুস অঞ্চল দিয়ে, যার অধিকাংশ এলাকা ছিল তুলুনিদের দখলে; আবার কখনো পরিচালিত হতো জাযিরার সীমান্ত অঞ্চল দিয়ে। এ ছাড়াও একই সময় ট্রান্সঅক্সিয়ানা-পরবর্তী তুর্কি অঞ্চলেও ইসলামি অভিযান পরিচালিত হচ্ছিল। ইসমাইল বিন আহমাদ বিন আসাদ সামানির নেতৃত্বে ২৮০ হিজরি সনে সামানিরা তুর্কি অঞ্চলে অভিযান পরিচালনা করে এবং তুর্কি শাসক ও তার স্ত্রীকে বন্দি করে। ২৮৩ হিজরি সনে রোমান ও মুসলমানদের মধ্যে বন্দি-বিনিময়ের ঘটনা ঘটে। এ সময় মুক্তি পাওয়া মুসলিম বন্দির সংখ্যা ছিল দু-হাজার পাঁচশ চারজন।

মুতাযিদ বিল্লাহ ২৮৯ হিজরি সনের ২২ রবিউস সানি (৯০২ খ্রিষ্টাব্দের ৫ এপ্রিল) সোমবার সাতচল্লিশ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পূর্বেই তিনি পরবর্তী খলিফা হিসেবে নিজ পুত্র মুকতাফিকে মনোনীত করে যান।

মুকতাফি বিল্লাহ আবু মুহাম্মাদ আলি বিন মুতাযিদ বিন মুওয়াফফাক বিল্লাহ বিন মুতাওয়াককিল

[রবিউস সানি ২৮৯ হিজরি—জিলকদ ২৯৫ হিজরি]

[এপ্রিল ৯০২ খ্রিষ্টাব্দ—আগস্ট ৯০৮ খ্রিষ্টাব্দ]

খলিফা মুকতাফি বিল্লাহর জন্ম ২৬৪ হিজরি সনে। পঁচিশ বছর বয়সে তিনি খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হন। মুকতাফি বিল্লাহর শাসনামলে রাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে সংঘাত ও দ্বন্দ্বের ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ায় নতুন করে আব্বাসি সাম্রাজ্যের পরিস্থিতির অবনতি ঘটে।

২৯১ হিজরি সনের মুহাররম মাসে (৯০৩ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে) মুকতাফি বিল্লাহ কারামাতিয়া সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং শামের আশেপাশের অঞ্চল কারামাতিয়া প্রভাবমুক্ত করতে সক্ষম হন। অবশ্য এর মাধ্যমে কারামাতিয়া মতাদর্শের চূড়ান্ত বিলোপ ঘটেনি।

কারামাতিয়া সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রচারক যাকরাওয়াইহ, তার সন্তানসন্ততি ও কারামাতিয়া সম্প্রদায়ের অধিকাংশ প্রচারক নিহত হওয়ার পর ইরাকে তাদের প্রভাব দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু কারামাতিয়াদের সবচেয়ে ধূর্ত ও সফল প্রচারক জান্নাবি তখনও জীবিত ছিল এবং বাহরাইনে নির্বাসিত ছিল। মুকতাফি বিল্লাহর খিলাফত আমলে তার প্রচারণা ও কর্মপ্রচেষ্টা তেমন দৃশ্যমান রূপ ধারণ করেনি। তবে পরবর্তী খলিফা মুকতাদিরের আমলে জান্নাবি আব্বাসি খিলাফতের মূর্তিমান আতঙ্ক হিসেবে আবির্ভূত হয়।

মুকতাফি বিল্লাহর শাসনামলেই ২৯২ হিজরি সনে (৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে) আব্বাসিদের হাতে মিশরে তুলুনিয়া রাষ্ট্রের পতন ঘটে। প্রায় কাছাকাছি সময়ে অর্থাৎ ২৯৬ হিজরি সনে (৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে) উবায়দি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা উবায়দুল্লাহ আল-মাহদির হাতে পতন ঘটে খলিফা হারুনুর

রশিদের শাসনামলে আফ্রিকায় প্রতিষ্ঠিত আগলাবিয়া রাষ্ট্রের। এর বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসবে, ইনশাআল্লাহ।

খলিফা মুকতাফি বিল্লাহ ২৯৫ হিজরি সনে একত্রিশ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

১৮ নং আব্বাসি খলিফা

আল-মুকতাদির বিল্লাহ আবুল ফজল জাফর বিন মুতাযিদ বিন মুওয়াফফাক বিল্লাহ বিন মুতাওয়াককিল

[জিলকদ ২৯৫ হিজরি—শাওয়াল ৩২০ হিজরি]

[আগস্ট ৯০৮ খ্রিষ্টাব্দ—নভেম্বর ৯৩২ খ্রিষ্টাব্দ]

খলিফা মুকতাদিরের জন্ম ২৮২ হিজরি সনে। বড় ভাই মুকতাফি বিল্লাহর ঘোষণা অনুসারে ভাইয়ের মৃত্যুর পর মাত্র তেরো বছর বয়সে তিনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বয়সের অপরিপক্বতার কারণে তার শাসনামল জনগণের জন্য কল্যাণকর বিবেচিত হয়নি। প্রবীণ সেনাপতিদের পক্ষ থেকে তাকে অপসারণ করে আবদুল্লাহ বিন মুতাযকে ক্ষমতায় বসানোর প্রচেষ্টা চালানো হয়; কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

নারী-শাসন

প্রকৃত কথা হলো, মুকতাদিরের শাসনামলে খিলাফতের প্রভাব-প্রতিপত্তি পুরোপুরিই শেষ হয়ে গিয়েছিল। বয়সে অপরিপক্ব খলিফার রাজনীতি ও যুদ্ধনীতি সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিল না। খলিফার মা ও জনৈকা গৃহ-পরিচারিকাই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করত। কেউ উজির পদ বা অন্য কোনো দায়িত্ব পেতে চাইলে তাদের দুজনকে ঘুষ দিয়েই তা বাগিয়ে নিতে পারত। মুকতাদির নিজে ব্যস্ত থাকতেন খেল-তামাশা, অর্থহীন বিনোদন ও অপব্যয়ে। রাষ্ট্রীয় বিষয়ে তার কোনো নিয়ন্ত্রণই ছিল না। মুকতাদিরের আমলে একে একে বারোবার উজির পদে পরিবর্তন হয়। কেউ কেউ বিভিন্ন মেয়াদে দু-তিনবারও দায়িত্ব পালন করে। উজির-পদ প্রাপ্তির একমাত্র যোগ্যতা ছিল চাহিদামতো ঘুষ প্রদান। খলিফার নারী আত্মীয়, সেবক ও ভৃত্যরা উজির নির্ধারণের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করত। কোনো যোগ্য ও সৎ ব্যক্তি উজির নির্বাচিত হলেও বেশিদিন দায়িত্বে থাকতে পারত না। কারণ, দায়িত্বের স্থায়িত্ব নির্ভর করত খলিফার মা, পরিচারিকা ও গৃহসেবকদের সন্তুষ্টির ওপর। আর তাদের সন্তুষ্টি অর্জনের পথ ছিল

একটাই—চাহিদামতো নিয়মিত প্রচুর অর্থ প্রদান। যখনই অর্থপ্রদানে গড়িমসি করা হতো, তখনই উজিরকে বরখাস্ত করে ঘুষপ্রদানে সক্ষম অন্য কাউকে দায়িত্ব প্রদান করা হতো। এরপর কালবিলম্ব না করে অপসারিত উজিরকে বন্দি করা হতো এবং তার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হতো।

৩০১ হিজরি সনে (৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে) কারামাতিয়া নেতা আবু সাইদ জান্নাবি নিহত হয় এবং তার পুত্র সাইদ তার স্থলাভিষিক্ত হয়। কিন্তু পরে সাইদের ভাই আবু তাহির সুলায়মান জান্নাবি তাকে পরাভূত করে কারামাতিয়া সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। আবু তাহিরের আমলে কারামাতিয়াদের অনাচার বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। তারা বিভিন্ন অঞ্চল অধিকার করে খিলাফতের রাজধানী বাগদাদের দিকে অগ্রসর হতে থাকে এবং কুফায় পৌঁছে যায়। পথে তারা খলিফা কর্তৃক প্রেরিত বিভিন্ন বাহিনীকে একের পর এক পরাজিত করতে থাকে।

কারামাতিয়া বাহিনীর বাগদাদপানে আগমনের সংবাদ পেয়ে পুরো বাগদাদজুড়ে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। সাধারণ জনগণ ও বিশিষ্টজন সকলে কারামাতিয়াদের ভয়ে বাগদাদ ছেড়ে হুলওয়ান ও হামাদানে পালিয়ে যাওয়ার মনস্থ করে। অথচ কারামাতিয়া বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল বড়জোড় দু-হাজার সাতশ এর কাছাকাছি। খলিফা মুকতাদির তাদের সৈন্যসংখ্যার কথা শুনে মন্তব্য করেন, 'আল্লাহ অভিশপ্ত করুন আশি হাজারের অধিক মানুষকে, যারা মাত্র দু-হাজার সাতশ সৈন্যের ভয়ে অক্ষমতা স্বীকার করে নিয়েছে।'

৩১২ হিজরি সনে (৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে) কারামাতিয়া নেতা আবু তাহির তার সঙ্গীদের নিয়ে বাইতুল্লাহ হতে প্রত্যাবর্তনরত হাজিদের কাফেলার ওপর হামলা চালায়। হাজিগণ নিজেদের জানমালের নিরাপত্তা রক্ষার্থে তাদেরকে বাধা দিলে কারামাতিয়া বাহিনী প্রচুর সংখ্যক হাজিকে হত্যা করে এবং নারী ও শিশুদের বন্দি করে। সংবাদ পেয়ে খলিফা কারামাতিয়াদের দমন করার জন্য মুনিস আল-খাদিমের নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। খলিফা এই বাহিনীর জন্য এক লক্ষ দিনার ব্যয় করেন। খলিফার বাহিনী প্রেরণের সংবাদ পেয়ে আবু তাহির ভীত হয়ে পড়ে এবং বন্দি হাজিদের ছেড়ে দেয়। ফলে পরিস্থিতি আপাতত শান্ত হয়।

মুকতাদিরের আমলেই আন্দালুসের প্রশাসক আবদুর রহমান আন-নাসির নিজেকে 'আমিরুল মুমিনিন' ও ইসলামি বিশ্বের খলিফা ঘোষণা করেন।

২৯৭ হিজরি সনে আফ্রিকায় উবায়দি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। উবায়দি রাষ্ট্র কিছুদিনের মধ্যেই মরক্কোর ইদরিসিয়া রাষ্ট্র ও আফ্রিকা অঞ্চলের আগলাবিয়া রাষ্ট্রের পতন ঘটাতে সক্ষম হয়। উবায়দি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা উবায়দুল্লাহ আল-মাহদি কায়রোয়ানের নিকটে মাহদিয়া নামে একটি শহর পত্তন করে নগরীটিকে উবায়দি রাষ্ট্রের রাজধানী নির্ধারণ করেন। উবায়দি রাষ্ট্র সম্পর্কে সামনে স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

মুকতাদিরের শাসনামলেই ২৯৩ হিজরি সনে (৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে) মসুলে হামদান পরিবারের নেতৃত্বে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে তা বেশি দিন স্থায়িত্ব লাভ করতে পারেনি। হামদানিয়া রাষ্ট্রের ব্যাপ্তি ছিল ৩৯২ হিজরি সন (১০০২ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত।

খলিফা মুকতাদিরের মর্মান্তিক পরিণতি

অত্যন্ত দুঃখজনক ও নির্মম পন্থায় খলিফা মুকতাদিরের শাসনামলের সমাপ্তি ঘটে। সাধারণ সৈন্যরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, সেনাপতিরা বিরাগভাজন হয়ে যায়। তার শাসনামলের অত্যন্ত প্রভাবশালী সেনাপতি ছিল 'আল-মুযাফফার' উপাধিধারী মুনিস আল-খাদিম। সে ছিল সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক। রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন বিষয়ে মুনিসের সঙ্গে খলিফার দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় এবং এর জের ধরে মুনিসের অনুগত বাহিনী খলিফাকে হত্যা করে। খলিফাকে হত্যা করার পর মুনিসের সৈন্যরা তার মস্তক দেহ হতে বিচ্ছিন্ন করে এবং একটি কাঠের মাথায় কর্তিত মস্তকটি ঝুলিয়ে তাকবির ধ্বনি দিতে দিতে তাকে অভিসম্পাত করতে থাকে। তারা তার সঙ্গে থাকা সবকিছু এমনকি পরিধেয় পায়জামাও খুলে নিয়ে নেয় এবং বিবস্ত্র অবস্থায় তার মৃতদেহ ফেলে রাখে। অবশেষে জনৈক পথিক হাশিশ ঘাস দিয়ে লাশটি ঢেকে দেয় এবং সেখানেই একটি গর্ত করে তাকে দাফন করে। ৩২০ হিজরি সনে মৃত্যুবরণকারী খলিফা মুকতাদিরের বয়স ছিল আটত্রিশ বছর।

১৯ নং আব্বাসি খলিফা

আল-কাহির বিল্লাহ আবু মানসুর মুহাম্মাদ বিন মুতাযিদ বিন মুওয়াফফাক বিল্লাহ বিন মুতাওয়াককিল

[শাওয়াল ৩২০ হিজরি—জুমাদাল উলা ৩২২ হিজরি]

[নভেম্বর ৯৩২ খ্রিষ্টাব্দ—এপ্রিল ৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দ]

খলিফা কাহির বিল্লাহর জন্ম ২৮৬ হিজরি সনে। ভাই মুকতাদিরের পর ৩২০ হিজরি সনে চৌত্রিশ বছর বয়সে তিনি খলিফা নির্বাচিত হন। সেনাপ্রধান মুনিসের পছন্দে কাহির বিল্লাহকে খলিফা নির্বাচিত করা হয়। খলিফা হয়েই কাহির বিল্লাহ তার পূর্বতন খলিফা মুকতাদিরের অসুস্থ মাকে দরবারে তলব করেন এবং তার গচ্ছিত সম্পদ ও রত্নভান্ডার সম্পর্কে তথ্য পেতে তাকে নির্যাতন করেন। তিনি খলিফা-মাতার সকল সম্পদ কেড়ে নেন।

কাহির বিল্লাহ অসচ্চরিত্র ছিলেন। খলিফা হওয়ার পরই তিনি মুনিসের সঙ্গে প্রতারণা করার দুরভিসন্ধি করেন। মুনিসসহ যারা তাকে ক্ষমতালাভে সহায়তা করেছিল, তিনি তাদের সবাইকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দেন। গ্রেফতারপর্ব শেষ হলে খলিফার নির্দেশে তাদেরকে হত্যা করা হয়। যারা এই হত্যাযজ্ঞ থেকে বেঁচে যায়, কিছুদিন পর তারা কাহিরের হাত থেকে নিষ্কৃতির পরিকল্পনা গ্রহণ করে। উজির ইবনে মাকাল্লার পরিকল্পনা অনুসারে বিরুদ্ধবাদীরা কাহিরকে বন্দি করে তার দু-চোখ উপড়ে ফেলে এবং তাকে খলিফার পদ হতে অপসারণ করে। এটি ৩২২ হিজরি সনের ঘটনা। খলিফা কাহির বিল্লাহ এর আরও সতেরো বছর পর ৩৩৯ হিজরি সনে তিপ্পান্ন বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

রাযি বিল্লাহ আবুল আব্বাস আহমাদ বিন মুকতাদির বিন মুতাযিদ বিন মুওয়াফফাক বিল্লাহ

[জুমাদাল উলা ৩২২ হিজরি—রবিউল আউয়াল ৩২৯ হিজরি]
[এপ্রিল ৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দ—ডিসেম্বর ৯৪০ খ্রিষ্টাব্দ]

খলিফা রাযি বিল্লাহর জন্ম ২৯৭ হিজরি সনে বাগদাদে। দায়িত্বগ্রহণের সময় তার বয়স ছিল পঁচিশ বছর। কাহির বিল্লাহকে অপসারণ করার পর আব্বাসি রাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ মিলে কাহির বিল্লাহর ভ্রাতুষ্পুত্র রাযি বিল্লাহকে খলিফা মনোনীত করে।

পূর্বের নিয়ম মেনেই তার শাসনামলের প্রথমদিকে রাষ্ট্রের মূল ক্ষমতা তাদের হাতেই থাকে, যারা তার চাচাকে অপসারণ করে তাকে খলিফা হতে সহায়তা করেছিল। উজির ইবনে মাকাল্লা ও হাজিব মুহাম্মাদ বিন ইয়াকুতই ক্ষমতার মূল চাবিকাঠি নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। কিন্তু কিছুদিন না যেতেই দ্রুত পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। খলিফা ইবনে ইয়াকুতের ওপর রুষ্ট হলে তাকে বন্দি করা হয় এবং বন্দি অবস্থায়ই সে মৃত্যুবরণ করে। কিছুদিন পর খলিফা ইবনে মাকাল্লাকেও বন্দি করেন।

এরপর পরিস্থিতি বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলে খলিফা রাযি বিল্লাহ বাধ্য হয়ে ওয়াসিত ও বসরার গভর্নর মুহাম্মাদ বিন রায়িককে বার্তা পাঠিয়ে তাকে বাগদাদের গভর্নর পদ গ্রহণের অনুরোধ করেন। খলিফা তাকে 'আমিরুল উমারা' উপাধি প্রদান করে সরকারি সকল দপ্তরের নিয়ন্ত্রণ তার হাতে তুলে দেন। এ সময় থেকেই দপ্তর-কেন্দ্রিক উজিরের প্রথা বাতিল হয়ে যায়। প্রধান উজিরের পদ নামমাত্র থেকে যায় আর প্রকৃত ক্ষমতা চলে যায় আমিরুল উমারা ইবনে রায়িকের হাতে।

এরপর থেকে ইবনে রায়িক ও তার সচিবই রাষ্ট্রের যাবতীয় বিষয় নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। বাইতুল মাল ও রাষ্ট্রীয় কোষাগার বিলুপ্ত হয়ে যায়। রাষ্ট্রের সকল আয় আমিরুল উমারার কোষাগারে জমা হতে থাকে। আমিরুল

উমারা ইবনে রায়িক নিজের ইচ্ছামতো রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যয় করতেন। যতটুকু ইচ্ছা করতেন, ততটুকুই তিনি খলিফাকে প্রদান করতেন। পরবর্তী সময়ে যারাই আমিরুল উমারা পদ গ্রহণ করেছিল, সকলে ইবনে রায়িকের পদাঙ্কই অনুসরণ করে।

অবশ্য ইবনে রায়িক বেশিদিন এ পদ ধরে রাখতে পারেননি। কিছুদিন পরই শুরু হয় আমিরুল উমারা পদ লাভের প্রচেষ্টা ও সংঘাত। সকলের যেন একটাই চাওয়া—বাগদাদের আমিরুল উমারা পদ। ওদিকে শত্রুরা দিন দিন একটু একটু করে কেড়ে নিচ্ছে খিলাফতভূমি; ধীরে ধীরে সংকীর্ণ হয়ে আসছে খিলাফতের ক্ষেত্র ও পরিধি। আব্বাসি খিলাফত হারিয়ে ফেলছে তার অবশিষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তিটুকুও।

রাযি বিল্লাহর শাসনামলেই মিশরে মুহাম্মাদ বিন তুগজ ইখশিদির নেতৃত্বে ইখশিদিয়া রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটে। মুহাম্মাদ বিন তুগজ ছিলেন তুলুন বংশের মামলুক বা মুক্ত ক্রীতদাস। ৩২৪ হিজরি হতে ৩৫৮ হিজরি (৯৩৫-৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত মিশর ইখশিদিয়া রাষ্ট্রের অধীনে ছিল। পরবর্তীকালে উবায়দিরা এই ইখশিদি রাজপরিবারের কাছ থেকেই মিশরের কর্তৃত্ব দখল করে।

খলিফা রাযি বিল্লাহর আমলেই আব্বাসি খিলাফতের বেশকিছু বিষয়ের সমাপ্তি ঘটে। রাযিই শেষ খলিফা, যার জন্য কবিতা রচনা করা হয়। তিনিই শেষ খলিফা, যিনি এককভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন। তিনিই শেষ খলিফা, যিনি নিজে জুমার খুতবা প্রদান করতেন। তিনিই শেষ খলিফা, যিনি সহচরদের নিয়ে দরবারে বসতেন এবং মজলিসে আলিমদের আহ্বান করতেন। পূর্ববর্তী খলিফাদের রীতি অনুযায়ী তারও পদমর্যাদা, দান-অনুদান, সেবক-হাজিব ইত্যাদি ছিল। তার শাসনামলেই বাগদাদে 'আমিরুল উমারা' পদের সূচনা হয় এবং রাষ্ট্রের যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আমিরুল উমারা পদধারী ব্যক্তির হাতে চলে যায়। খলিফা ছিলেন আমিরুল উমারার হাতের পুতুল, তার নির্দেশেই তিনি আদেশ জারি করতেন। খলিফা পদের নামমাত্র যে কর্তৃত্বটুকু ছিল, রাযি বিল্লাহর আমলে তা-ও শেষ হয়ে যায়।

খলিফা রাযি বিল্লাহ ৩২৯ হিজরি সনে বত্রিশ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

আল-মুত্তাকি লিল্লাহ আবু ইসহাক ইবরাহিম বিন মুকতাদির বিন মুতাযিদ বিন মুওয়াফফাক

[রবিউল আউয়াল ৩২৯ হিজরি—সফর ৩৩৩ হিজরি]
[ডিসেম্বর ৯৪০ খ্রিষ্টাব্দ—অক্টোবর ৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দ]

খলিফা মুত্তাকি লিল্লাহর জন্ম ২৯৫ হিজরি সনে বাগদাদে। তিনি চৌত্রিশ বছর বয়সে খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হন। রাযি বিল্লাহর ইন্তেকালের পর সেনাপতি ও উজিরগণ মিলে তার ভাই মুত্তাকি লিল্লাহ ইবরাহিমকে খলিফা নির্ধারণ করে।

ভাইয়ের মতো তারও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে কোনো ভূমিকা ছিল না। তার আমলেও আমিরুল উমারা পদ প্রাপ্তি নিয়ে প্রচণ্ড সংঘাত চলতে থাকে। কিন্তু কেউই দীর্ঘদিন এ পদ ধরে রাখতে পারেনি। যাদের মধ্যে আমিরুল উমারা পদ নিয়ে সংঘাত চলছিল, তারা হলো—ইবনে রায়িক, বাজকাম, আল-বারিদি, নাসিরুদ্দৌলা ইবনে হামদান, তুরুন প্রমুখ। খলিফা ছিলেন এই দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও হানাহানির নীরব দর্শক। তুরুন আমিরুল উমারা থাকা অবস্থায় ৩৩৩ হিজরি সনে খলিফা মুত্তাকি লিল্লাহকে অপসারণ করে, তার চোখ উপড়ে ফেলে এবং এ অবস্থাতেই তাকে বাগদাদে নিয়ে আসে।[১০৯] তুরুন খলিফাকে তার চাচাতো ভাই মুসতাকফির হাতে বায়আত গ্রহণ করতে বাধ্য করে এবং এরপর তাকে এক দ্বীপে নির্বাসিত করে। বন্দি অবস্থায় পঁচিশ বছর কাটানোর পর ৩৫৭ হিজরি সনে বাষট্টি বছর বয়সে মুত্তাকি লিল্লাহ ইন্তেকাল করেন।

---

১০৯. এর বছরখানেক পূর্বে খলিফা মুত্তাকি লিল্লাহ আমিরুল উমারা তুরুনের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে বাগদাদ ছেড়ে মসুলে চলে গিয়েছিলেন। ৩৩৩ হিজরি সনে তিনি বাগদাদে ফিরে আসার মনস্থ করলে পথিমধ্যে তুরুন খলিফাকে বন্দি করে চোখ উপড়ে ফেলে এবং তাকে আমৃত্যু বন্দি করে রাখে।

মুত্তাকির শাসনামলে রোমানরা মুসলিম ভূখণ্ডে হামলা চালিয়ে নুসায়বিন (Nusaybin) পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল এবং অসংখ্য মুসলমানকে হত্যা করেছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শিয়া বুওয়াইহি পরিবার-নিয়ন্ত্রিত আব্বাসি খলিফাগণের বিবরণ

[জুমাদাল উলা ৩৩৪ হিজরি—রমজান ৪৪৭ হিজরি]
[ডিসেম্বর ৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দ—ডিসেম্বর ১০৫৫ খ্রিষ্টাব্দ]

বুওয়াইহি পরিবারের হাতে আব্বাসি সাম্রাজ্যের লাগাম

এই স্তরের সূচনা হয় ৩৩৪ হিজরি সনে আর এর ব্যাপ্তি থাকে ৪৪৭ হিজরি সন পর্যন্ত।[১১০] এ সময়কালে মোট পাঁচজন আব্বাসি খলিফা দায়িত্ব পালন করেন। সামনে তাদের শাসনামলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো।

১১০. যদিও আরও বহু পূর্ব থেকেই আব্বাসি খিলাফতের পরিধি কেবল বাগদাদ ও আশেপাশের এলাকাতেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল, কিন্তু এই সময়কালে এসে খলিফাদের কোনো কর্তৃত্বই বাকি থাকেনি। খিলাফতের অধীনস্থ অতি সীমিত অঞ্চলও আমিরুল উমারা পদবিধারী বুওয়াইহি সুলতানগণই শাসন করত। তারা খলিফার জন্য নামমাত্র ভাতা নির্ধারণ করে দিত। কখনো কখনো তা প্রদান না করা হলে খলিফাকে নিজ আসবাবপত্র বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতে হতো। খলিফার কাজ শুধু এই ছিল যে, বাইরের কোনো দূত আগমন করলে দরবারে তার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতেন এবং সুলতানের নির্দেশনা অনুযায়ী কথাবার্তা বলতেন। আর আব্বাসি খিলাফতকে স্বীকৃতি দানকারী মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রে মুসলিম জাহানের খলিফা হিসেবে জুমার খুতবায় আব্বাসি খলিফার নাম উচ্চারিত হতো।

মুসতাকফি বিল্লাহ আবুল কাসিম আবদুল্লাহ বিন মুকতাফি বিন মুতাযিদ বিন মুওয়াফফাক

[সফর ৩৩৩ হিজরি—জুমাদাল উখরা ৩৩৪ হিজরি]

[অক্টোবর ৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দ—জানুয়ারি ৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দ]

খলিফা মুসতাকফি বিল্লাহর জন্ম ২৯২ হিজরি সনে বাগদাদে। তার পিতা মুকতাফি বিল্লাহ ছিলেন সপ্তদশ আব্বাসি খলিফা। তার পূর্ববর্তী খলিফা মুত্তাকি লিল্লাহ ছিলেন তার চাচাতো ভাই। দায়িত্ব গ্রহণকালে তার বয়স ছিল একচল্লিশ বছর। আমিরুল উমারা তুরুন খলিফা মুত্তাকি লিল্লাহকে পদচ্যুত ও বন্দি করার পর মুসতাকফি বিল্লাহকে খলিফা পদে অধিষ্ঠিত করে। তুরুন মুত্তাকি লিল্লাহকে মুসতাকফির হাতে বায়আত গ্রহণেও বাধ্য করে।

এর পরবর্তী সময়ের ইতিহাস মূলত দায়লামি বুওয়াইহি রাজপরিবারের ইতিহাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ইরাক ও বাগদাদে তখন প্রকৃত কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা বুওয়াইহি পরিবারেরই ছিল।

দায়লামি বুওয়াইহি পরিবার : যেভাবে খিলাফতের রাজধানী বাগদাদে

দায়লাম (Daylam) কাস্পিয়ান সাগর-তীরের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত একটি অঞ্চল। প্রাচীনকালে অঞ্চলটি পারস্যের একটি প্রদেশ ছিল। কিন্তু দায়লামের অধিবাসীগণ বংশগত দিক থেকে পারসিক ছিল না, বরং তারা দায়লামি বা জিলানি নামক স্বতন্ত্র বংশপরিচয়ের অধিকারী ছিল।

দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি.-এর আমলে দায়লাম বিজিত হয় এবং ইসলামি শাসনের অধিভুক্ত হয়। অবশ্য তখনও দায়লামবাসী নিজেদের পৌত্তলিক ধর্মপরিচয়ে অটল ছিল। দায়লামের কাছেই ছিল তিবরিস্তান অঞ্চল। তিবরিস্তানের অধিকাংশ নাগরিক ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ধর্মপরিচয়ে ভিন্নতা সৃষ্টি হলেও এরপরও দায়লামি ও

তিবরিস্তানবাসীর মধ্যে আবহমানকাল থেকে চলে আসা শান্তি ও হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক অটুট ছিল।

আব্বাসি খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও পরিস্থিতি একই থাকে। দায়লামিরা ইসলামি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার চিন্তা করত না, মুসলমানরাও তাদের অঞ্চলে হস্তক্ষেপ করার পরিকল্পনা করত না।

অবশেষে ২৫০ হিজরি সনে দ্বাদশ আব্বাসি খলিফা মুসতাইন বিল্লাহ উক্ত অঞ্চল শাসন করার জন্য তার আস্থাভাজন প্রশাসক (পরবর্তীকালে যিনি মুসতাইন বিল্লাহকে পদচ্যুত করে আস্থার প্রতিদান দিয়েছিলেন!) মুহাম্মাদ বিন তাহিরকে প্রেরণ করেন। কিন্তু তিবরিস্তানবাসী তাকে বাধা প্রদান করে এবং তাকে শাসক হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। তারা (যায়দিয়া রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা) হাসান বিন যায়দকে নিজেদের শাসক হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। পাশাপাশি তারা মুসতাইনের প্রেরিত গভর্নরের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য দায়লামবাসীর সহায়তা প্রার্থনা করলে দায়লামবাসী তাদেরকে সহায়তা করে।

হাসান বিন যায়দ প্রথমে তিবরিস্তানের নগরীসমূহ, এরপর রায়, জুরজান প্রমুখ অঞ্চল শাসন করেন। ২৭১ হিজরি সনে তার মৃত্যু হলে তার ভাই মুহাম্মাদ বিন যায়দ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অবশ্য তার শাসনামল ছিল গোলযোগ ও অস্থিরতায় পূর্ণ। ২৮৭ হিজরি সনে তিনি ইন্তেকাল করেন। হাসান ও তার ভাই মুহাম্মাদের কর্মপ্রচেষ্টা দায়লামবাসীর মাঝে ইসলাম প্রচারে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

৩০১ হিজরি সনে দায়লামে প্রবেশ করেন আতরুশ উপাধিধারী হাসান বিন আলি। তিনি সেখানে তেরো বছর অবস্থান করে ইসলাম প্রচার করেন। তার দাওয়াতে প্রচুর মানুষ মুসলমান হয় এবং তার পক্ষে সমবেত হয়। তিনি সেখানে বিভিন্ন মসজিদও নির্মাণ করেন। তবে তাদের ইসলাম ছিল শিয়া-মতাদর্শদোষে দুষ্ট। কিছুদিন পর হাসান বিন আলি আতরুশ দায়লামবাসীর সহায়তায় তিবরিস্তানেও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন এবং সামানিদের কাছ থেকে জুরজানের কর্তৃত্বও কেড়ে নেন। আতরুশ ৩০৪ হিজরি সনে (৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে) ইন্তেকাল করেন।

এরপর সময়ের বিবর্তনে পরিস্থিতিরও পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ৩২৩ হিজরি সনে এসে এ অঞ্চলে দুটি পরিবার বৃহৎ শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত

হয়। ১. পারস্য ও রায় অঞ্চলে আলি বিন বুওয়াইহির পরিবার। ২. খোরাসান ও মাওয়ারাউন নাহার (ট্রান্সঅক্সিয়ানা) অঞ্চলে সামানি পরিবার।

বুওয়াইহি পরিবারের প্রধান পুরুষ বুওয়াইহি-এর আলি, হাসান ও আহমাদ নামক তিন পুত্র ছিল। বাগদাদে যেহেতু তখন আব্বাসি খিলাফতের প্রতাপ-প্রতিপত্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল, তাই আলি বিন বুওয়াইহির মনে তার ছোট ভাই আহমাদকে প্রেরণ করে আহওয়াজ ও ইরাকেও নিজেদের কর্তৃত্ব বিস্তারের চিন্তা উদিত হয়।

খলিফা মুত্তাকি লিল্লাহর শাসনামলে যখন ইরাকের আমিরুল উমারা পদে বাজকাম রাইকি অধিষ্ঠিত ছিল, তখন আহমাদ বিন বুওয়াইহি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আহওয়াজে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। পরাজিত বাজকাম পালিয়ে ওয়াসিত অঞ্চলে চলে যায়।

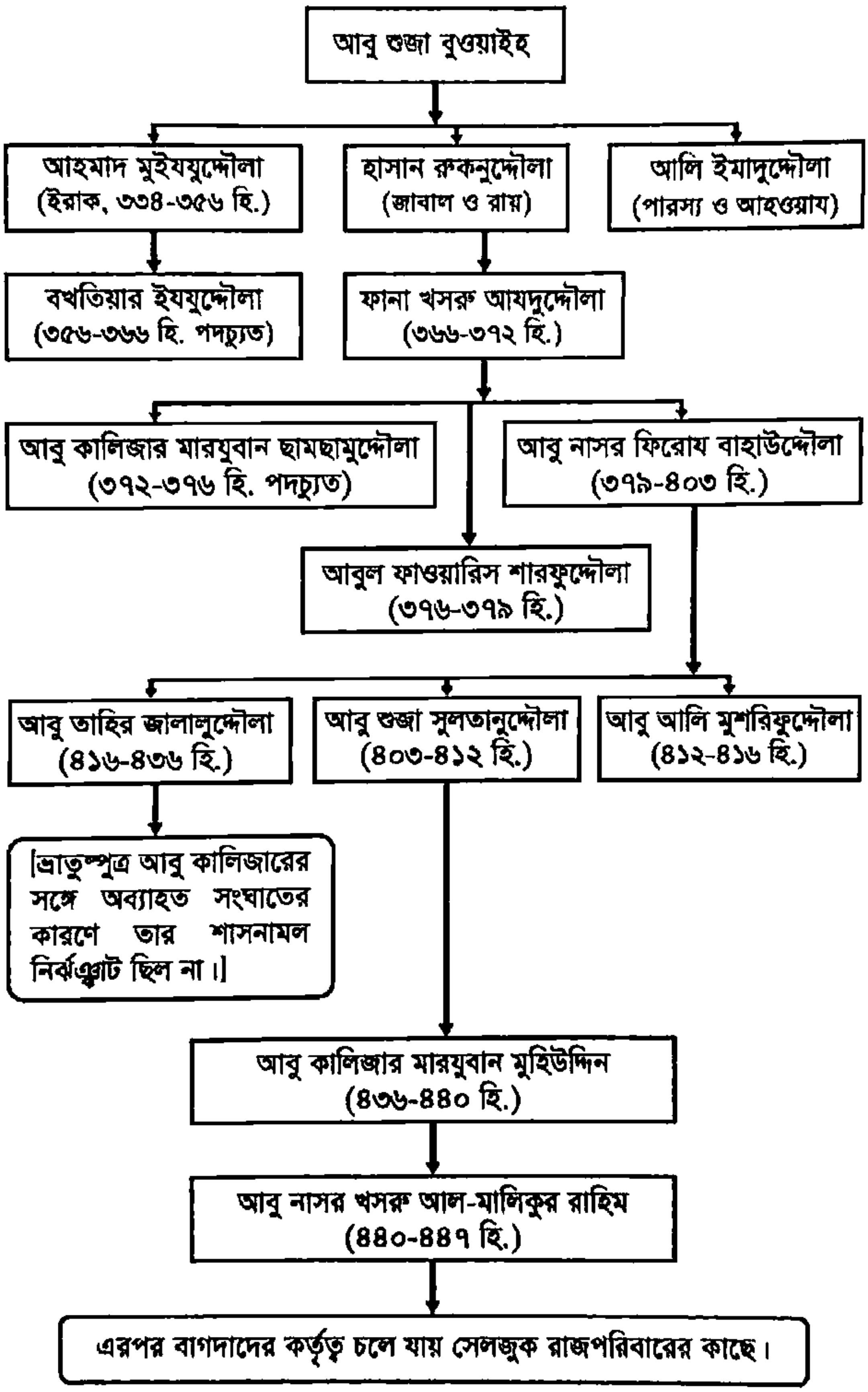
এরপর বাগদাদের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ আহমাদ বিন বুওয়াইহির কাছে বার্তা পাঠিয়ে তাকে বাগদাদে এসে ইরাকের কর্তৃত্ব গ্রহণের অনুরোধ জানালে তিনি ৩৩৪ হিজরি সনের ১১ জুমাদাল উলা (৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ ডিসেম্বর) বাগদাদে পৌঁছান। তৎকালীন আব্বাসি খলিফা মুসতাকফি বিল্লাহ তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। আহমাদ তার হাতে খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করেন এবং উভয়ে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হন। চুক্তি হয় মুসতাকফি হবেন খলিফা আর আহমাদ হবেন ইরাকের 'সুলতান'। খলিফা সেদিনই বুওয়াইহি পরিবারের সদস্যদেরকে বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত করেন। পারস্যের অধিপতি আলি বিন বুওয়াইহিকে প্রদান করা হয় 'ইমাদুদ্দৌলা' উপাধি, রায় ও জাবালের অধিপতি হাসান বিন বুওয়াইহিকে প্রদান করা হয় 'রুকনুদ্দৌলা' উপাধি আর ইরাকের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আহমাদ বিন বুওয়াইহিকে প্রদান করা হয় 'মুইযযুদ্দৌলা' উপাধি। খলিফা তাদের উপাধি ও উপনাম সরকারি মুদ্রায় খোদাই করারও নির্দেশ দেন।

এখান থেকেই শুরু হয় আব্বাসি খিলাফতের নতুন এক অধ্যায়। খলিফা পদকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক পদ হতে এক ধাক্কায় পরিণত করা হয় নিছক ধর্মীয় সম্মানজনক পদে। খলিফার না আছে কোনো নির্বাহী ক্ষমতা, না আছে উজির-অনুচর। খলিফার সঙ্গে কেবল একজন সচিব

থাকতেন, যার কাজ ছিল খলিফার জায়গির এলাকার দেখাশোনা করা এবং সেখানকার উৎপাদিত ফল-ফসলের খোঁজখবর রাখা।

নির্বাহী ক্ষমতা চলে যায় সুলতান মুইযযুদ্দৌলার হাতে। তিনিই নিজের পছন্দমতো অধীনস্থ উজির নিয়োগদান করতেন। যেহেতু মুইযযুদ্দৌলা এমন এক সম্প্রদায়ের সদস্য ছিলেন, যাদের মাঝে শিয়া যায়দিয়া মতাদর্শের বিস্তার ঘটেছিল, তাই তিনি বনু আব্বাসের কাছ থেকে খলিফা নামটিও কেড়ে নেওয়ার মনস্থ করেন এবং কোনো আলাবি ব্যক্তিকে এ পদ প্রদানের ইচ্ছা করেন। কারণ, শিয়াদের আকিদা ও বিশ্বাস হলো—বনু আব্বাস খিলাফতের প্রকৃত হকদার আলি-পরিবারের কাছ থেকে জোরপূর্বক খিলাফত কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু মুইযযুদ্দৌলার জনৈক অনুচর তাকে এরূপ না করার পরামর্শ দিয়ে বলে, 'আজ আপনি এমন একজন খলিফার সঙ্গে আছেন, যার সম্পর্কে আপনি ও আপনার সঙ্গীগণ মনে করছে যে, তিনি খিলাফতের উপযুক্ত নন। কিন্তু আপনি যখন তাকে হত্যা করে কোনো আলাবি ব্যক্তিকে এ পদে বসাবেন, তখন তো আপনার সঙ্গীগণ তার খিলাফত বৈধ মনে করবে। তখন যদি নতুন খলিফা তাদের আপনাকে হত্যা করারও নির্দেশ প্রদান করে, তারা নির্দ্বিধায় তা পালন করবে।' নিষ্ঠাবান অনুচরের পরামর্শে মুইযযুদ্দৌলা আপন ইচ্ছা পরিহার করেন।

বাগদাদে কর্তৃত্বকারী বুওয়াইহি পরিবারের বংশলতিকা
[৩৩৪-৪৪৭ হিজরি—৯৪৫-১০৫৫ খ্রিষ্টাব্দ]



তৎকালীন ইসলামি বিশ্বের পরিস্থিতি

ইতিহাসের এই স্তরে হিজরি চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে এসে আমরা যদি ইসলামি বিশ্বের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তাহলে দেখতে পাব—

- আন্দালুসে আমিরুল মুমিনিন আবদুর রহমান আন-নাসির শাসন করছিলেন।
- আফ্রিকায় ছিল উবায়দিদের শাসন।
- মরক্কোয় ছিল ইদরিসি শাসন। দ্বিতীয় ইদরিসি শাসক ইসমাইল আল-মানসুর তখন সেখানকার শাসনকর্তা ছিলেন এবং তিনিও 'আমিরুল মুমিনিন' উপাধি ধারণ করেছিলেন।
- মিশর ও শামে ছিল ইখশিদিদের শাসন। অবশ্য তারা জুমার খুতবায় খলিফা হিসেবে আব্বাসি খলিফার নামই পাঠ করত।
- আলেপ্পো[১১১] ও সীমান্ত অঞ্চলগুলোতে ছিল সাইফুদ্দৌলা আলি বিন আবদুল্লাহ বিন হামদান শায়বানির শাসন। এ অঞ্চলেও মুসলিম সাম্রাজ্যের খলিফা হিসেবে আব্বাসি খলিফার নামই জুমার খুতবায় উচ্চারিত হতো।
- ফুরাত অববাহিকার জাযিরা অঞ্চল বা মেসোপটেমিয়া উচ্চভূমিতে (Upper Mesopotamia) ছিল নাসিরুদ্দৌলা হাসান বিন আলি বিন আবদুল্লাহ বিন হামদানের কর্তৃত্ব। তিনিও খুতবায় আব্বাসি খলিফার নাম পাঠ করতেন।
- ইরাকে ছিল দায়লামিদের ক্ষমতা। মুইযযুদ্দৌলা আহমাদ বিন বুওয়াইহি ছিলেন তৎকালীন ইরাকের সুলতান। বাগদাদের মিম্বরসমূহে এ সময় আব্বাসি খলিফার নাম নেওয়া হলেও পরবর্তী সময়ে বুওয়াইহি সুলতান মুইযযুদ্দৌলার নাম নেওয়া হতে থাকে।

---

১১১. **আলেপ্পো :** অতি প্রাচীন একটি নগরী। নগরীটির আরবি নাম حَلَب (হালাব), ইংরেজি নাম Aleppo (আলেপ্পো)। আধুনিক সিরিয়ার অন্তর্গত আলেপ্পো নগরী দেশটির রাজধানী দামেশক হতে প্রায় ৩১০ কিলোমিটার দূরে দেশের উত্তর-পশ্চিম অংশে অবস্থিত।

- আম্মান, ইয়ামেন, বাহরাইন ও বসরার বাদিয়া অঞ্চলে ছিল কারামাতিয়াদের শাসন। এসব এলাকায় উবায়দি শাসক মাহদির নামে খুতবা পাঠ করা হতো।
- পারস্য ও আহওয়াজে ছিল ইমাদুদ্দৌলা উপাধিধারী আলি বিন বুওয়াইহির শাসন। তিনি আব্বাসি খলিফার নামেই খুতবা পাঠ করতেন। তাকে আমিরুল উমারা উপাধিও প্রদান করা হয়েছিল। কারণ, তিনিই ছিলেন বুওয়াইহি পরিবারের জ্যেষ্ঠতম সদস্য।
- জাবাল ও রায় অঞ্চলে ছিল রুকনুদ্দৌলা উপাধিধারী হাসান বিন বুওয়াইহির কর্তৃত্ব। তিনিও আব্বাসি খলিফার নামে খুতবা পাঠ করতেন। জুরজান ও তিবরিস্তানের কর্তৃত্ব নিয়ে এ সময় রুকনুদ্দৌলার সঙ্গে সামানি পরিবারের সংঘাত চলছিল।
- খোরাসান ও মাওয়ারাউন নাহারে ছিল সামানি পরিবারের ক্ষমতা। সামানি শাসকের রাজধানী ছিল বুখারা নগরী। সামানিরাও আব্বাসি খলিফার নামে খুতবা পাঠ করত।

একসময় এই সবগুলো বৃহৎ নগরী ও অঞ্চল ছিল এক খিলাফতের অধীনস্থ এবং সুবিশাল ইসলামি খিলাফতের অঙ্গ। কালের পরিক্রমায় ইতিহাসের এই পর্যায়ে এসে আজ সেই সুবিশাল ইসলামি সাম্রাজ্য বিস্ময়করভাবে বহুধা বিভক্ত এবং বিভিন্ন রাজপরিবারের করতলগত!

এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, এ সময় নির্ভেজাল আরব বংশীয়দের হাতে কোনো এলাকার শাসনক্ষমতা ছিল না। এ ক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল বনু হামদানের নাসিরুদ্দৌলা ও তার ভাই সাইফুদ্দৌলা। তৎকালীন শাসকদের মধ্যে কেবল এ দুজনই ছিলেন আরবি রক্তের ধারক। তবে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, তারা যে অঞ্চলের শাসক ছিলেন, সেসব এলাকায় প্রকৃত ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ছিল তুর্কি সেনাপতিদের হাতে। তাদের দুজনের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ছিল না। বরং তারা বুওয়াইহি পরিবারের নির্দেশনা মেনে চলতেন এবং খুতবায় আব্বাসি খলিফার নামের পর মুইযযুদ্দৌলার নামও পাঠ করতেন।

আবারও ইতিহাসের ধারাবর্ণনায় ফিরে আসি। মুইযযুদ্দৌলাকে সর্বময় ক্ষমতা প্রদান করার পর মুসতাকফি বিল্লাহ অল্প কদিনই খলিফা পদে থাকতে পেরেছিলেন। চল্লিশ দিন না যেতেই মুইযযুদ্দৌলা তাকে

অনধিকার চর্চার অভিযোগে অভিযুক্ত করে খলিফা পদ হতে অপসারণ করেন। এটি ৩৩৪ হিজরি সনের জুমাদাল উখরা মাসের ঘটনা। অর্থাৎ তার খিলাফতকাল মাত্র এক বছর চার মাস স্থায়ী হয়েছিল। অপসারণের পর তার চোখ উপড়ে ফেলা হয়[১১২] এবং তাকে গৃহবন্দি করা হয়। এর চার বছর পর ৩৩৮ হিজরি সনে ছেচল্লিশ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন।

---

১১২. মুসতাকফি হলেন তৃতীয় আব্বাসি খলিফা, যার চোখ উপড়ে ফেলা হয়। তার পূর্বে কাহির বিল্লাহ ও মুত্তাকি লিল্লাহর চোখও উপড়ে ফেলা হয়েছিল।

২৩ নং আব্বাসি খলিফা

মুতি লিল্লাহ আবুল কাসিম ফজল বিন মুকতাদির বিন মুতাযিদ বিন মুওয়াফফাক

[জুমাদাল উখরা ৩৩৪ হিজরি—জিলকদ ৩৬৩ হিজরি]

[জানুয়ারি ৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দ—আগস্ট ৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দ]

মুতি লিল্লাহর জন্ম ৩০১ হিজরি সনে বাগদাদে। খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার সময় তার বয়স ছিল তেত্রিশ বছর। মুসতাকফিকে অপসারণের পর তার চাচাতো ভাই মুতি লিল্লাহকে খলিফা পদে বসানো হয়।

মুতি লিল্লাহ খলিফা হওয়ার পর সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে দাঙ্গা ও গোলযোগের শিকার হন। তাদেরকে শান্ত ও তুষ্ট করার জন্য নিরুপায় হয়ে তিনি তাদেরকে রাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকার জায়গির প্রদান করেন। ফলে সারাদেশে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়, লুটপাট বেড়ে যায়। এক বছর অতিবাহিত না হতেই রাজধানী বাগদাদেও এর প্রভাব পড়ে। দুর্মূল্য এক সময় দুর্ভিক্ষে রূপ নেয়। ক্ষুধার তাড়নায় মানুষ মৃত প্রাণী ও কুকুর খেতে বাধ্য হয়। খাবার হিসেবে মানুষ খেতে থাকে কাঁটাযুক্ত কারব (carob)। কারবের বিচি ঝলসে খাওয়ার কারণে বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি এবং আঁতড়ি ও পেটে স্ফীতি (টিউমার) দেখা দেয়। বহু মানুষ ক্ষুধার তাড়নায় ও রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। এত অধিক মানুষের দাফন-কাফনে অক্ষমতা দেখা দেওয়ায় কুকুর মানুষের লাশ ভক্ষণ করতে থাকে। অনেক মানুষ বাগদাদ ছেড়ে বসরার পথে রওনা হয়। তাদের অধিকাংশই পথিমধ্যে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। বাড়িঘর ও জমিজমা রুটির বিনিময়ে বিক্রি হতে থাকে।

প্রকৃতপক্ষে জায়গির পদ্ধতির সূচনা ছিল ইরাকের ধ্বংসের প্রথম ধাপ। এর ফলে যারা জমিচাষ ও ক্ষেতের পরিচর্যা করত, সেই কৃষকশ্রেণি কর্মস্পৃহা ও উদ্দীপনা হারিয়ে ফেলে।

একইসময় দায়লামি ও তুর্কি সৈন্যদের মধ্যে শুরু হয় সাম্প্রদায়িক সংঘাত। দায়লামিরা মুইযযুদ্দৌলাকে অপসারণ করার চেষ্টা চালালে তুর্কিরা তার পক্ষ নিয়ে এই প্রচেষ্টা বানচাল করে দেয়। ফলে মুইযযুদ্দৌলা এবার দায়লামিদের বাদ দিয়ে তুর্কিদের প্রতি প্রসন্ন হন। তিনি তুর্কিদেরকে অবাধ ক্ষমতা প্রদান করেন। ক্ষমতা পেয়ে তুর্কিরা দেশজুড়ে লুটপাট ও অরাজকতা সৃষ্টি করে।

ইরাকে শিয়া কর্তৃত্ব বিস্তার : উবায়দিদের পথে বুওয়াইহি পরিবার

বুওয়াইহি পরিবারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হওয়ার আগ পর্যন্ত বাগদাদবাসী আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর মতাদর্শে জীবনযাপন করত। তারা সকল সাহাবিকে শ্রদ্ধা করত, শায়খায়নকে[১১৩] অন্যান্য সাহাবির তুলনায় শ্রেষ্ঠ মনে করত, সাহাবি মুয়াবিয়া রাযি. ও পূর্বসূরি বিদগ্ধ মনীষীগণের সমালোচনা করার ন্যায় আত্মবিধ্বংসী কাজ থেকে বিরত থাকত। কিন্তু বুওয়াইহি শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বাগদাদে শিয়া মতাদর্শ বিস্তার লাভ করতে থাকে। কারণ, বুওয়াইহি পরিবার ছিল শিয়া মতাদর্শে বিশ্বাসী। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় শিয়া মতবাদ ইরাকে সুদৃঢ় অবস্থান লাভ করতে সক্ষম হয়। ৩৫১ হিজরি সনে (৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে) মুইযযুদ্দৌলা বাগদাদের মসজিদের সামনে নিম্নোক্ত বাক্যগুলো (নাউযুবিল্লাহ) উৎকীর্ণ করার নির্দেশ দেন—

> আল্লাহ তাআলা মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ানকে অভিসম্পাত করুন। যারা ফাতিমা রাযি.-কে ফাদাক হতে বঞ্চিত করেছে[১১৪], তাদেরকেও অভিসম্পাত করুন। যারা হুসাইনকে তার নানার পাশে সমাধিস্থ হতে বাধা প্রদান করেছে, আল্লাহ তাদেরকে অভিসম্পাত করুন।

ফলকটি স্থাপন করার পর রাতের বেলা অজ্ঞাত কেউ তা ঘষে তুলে ফেলে। কিন্তু মুইযযুদ্দৌলা পরে একই লেখা পুনঃস্থাপন করেন।

---

১১৩. 'শায়খায়ন' মানে প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর রাযি. ও দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর রাযি.।

১১৪. খায়বার ও ফাদাক-ভূমিতে হজরত ফাতিমা রাযি.-এর মিরাস দাবি-সংক্রান্ত আলোচনা প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দিক রাযি.-এর খিলাফতকালের আলোচনায় গত হয়েছে।

৩৫২ হিজরি সনের ১০ মুহাররম (৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি) মুইযযুদ্দৌলা ফরমান জারি করেন যে, এখন থেকে ১০ মুহাররম সবধরনের কাজকর্ম বন্ধ রেখে সবাইকে বিলাপ করতে হবে, কৃত্রিম গম্বুজ তৈরি করতে হবে, নারীদের মুখে কালি মেখে পরিধেয় বস্ত্র বিদীর্ণ করে 'হায় হুসাইন! হায় হুসাইন!' মাতম করে সড়ক প্রদক্ষিণ করতে হবে। মুইযযুদ্দৌলার নির্দেশনা মোতাবেক শিয়া মতাদর্শীরা মহা সমারোহে এসব নির্দেশনা পালন করা শুরু করে। বাগদাদের সুন্নি জনগণ যদিও এসব অন্যায় কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করছিল; কিন্তু একদিকে শিয়াদের জয়জয়কার, অপরদিকে প্রশাসনের সরাসরি সমর্থন শিয়াদের পক্ষে থাকায় তাদের বাধা প্রদানের কোনো শক্তি ছিল না।

একই বছরের ১৮ জিলহজ[১১৫] (৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দের ৭ জানুয়ারি) মুইযযুদ্দৌলা সবাইকে আগুন প্রজ্বলিত করে এবং ঘরবাড়ি সুসজ্জিত করে উৎসব করার নির্দেশ দেন এবং ১৮ জিলহজকে 'ঈদুল গাদির' নামকরণ করেন। এরপর থেকে শিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা ১৮ জিলহজ ঈদ পালন করে থাকে। তারা এর স্বপক্ষে নিম্নোক্ত হাদিস দলিল হিসেবে পেশ করে এবং দাবি করে যে, এর মাধ্যমে নবীজির ইন্তেকালের পর হজরত আলি রাযি.-এর প্রথম খলিফা হওয়ার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

«مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ، اَللّٰهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ»

আমি যার বন্ধু হব, আলিও তার বন্ধু। হে আল্লাহ, যারা আলির প্রতি হৃদ্যতা পোষণ করে, আপনি তাদের প্রতি হৃদ্যতা পোষণ

---

১১৫. শিয়াদের আকিদা হলো—নবীজির মৃত্যুর পর হজরত আলি রাযি.-ই ছিলেন নবীজির খলিফা হওয়ার প্রকৃত হকদার এবং নবীজি আপন জীবদ্দশায় বিভিন্নভাবে এ বিষয়টি ঘোষণা করে গেছেন। তাদের ভাষ্যমতে সবশেষে দশম হিজরি সনের ১৮ জিলহজ নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী 'গাদির খুম' নামক স্থানে এক ভাষণ প্রদান করেন এবং লক্ষ সাহাবির উপস্থিতিতে হজরত আলি রাযি.-এর খলিফা হওয়ার ঘোষণা প্রদান করেন। এ কারণে তারা ১৮ জিলহজ ঈদ উদ্‌যাপন করে এবং একে 'ঈদুল গাদির' বলে অভিহিত করে। এ তথ্যটিও এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, তৃতীয় খলিফা হজরত উসমান রাযি.-এর শাহাদাতের তারিখও ১৮ জিলহজ।

> করুন আর যারা তার প্রতি শত্রুতা পোষণ করে, আপনিও তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করুন।[১১৬]

জাযিরার আরব শাসক নাসিরুদ্দৌলার সঙ্গে বুওয়াইহি সুলতান মুইযযুদ্দৌলার বেশ কয়েকবার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। দীর্ঘস্থায়ী ও রক্তক্ষয়ী এ যুদ্ধের কারণে উভয় পক্ষই অন্য সবকিছু বাদ দিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় ব্যস্ত ছিল। পারস্পরিক এই সংঘাতের ফলে স্বাভাবিকভাবেই মুসলমানদের সামরিক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সমকালীন বাইজান্টাইন শক্তি ইসলামি ভূখণ্ডে আক্রমণ করার দুঃসাহস দেখায়। যথাস্থানে এর বিস্তারিত বিবরণ আসবে।

মুইযযুদ্দৌলা ৩৫৬ হিজরি সনের ১৩ রবিউল আউয়াল (৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ ফেব্রুয়ারি) ইন্তেকাল করেন। তার স্থলাভিষিক্ত হন তার পুত্র ইযযুদ্দৌলা বখতিয়ার বিন আহমাদ বিন বুওয়াইহি। ৩৬৭ হিজরি সনে আপন চাচাতো ভাই আযদুদ্দৌলা কর্তৃক অপসারিত হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি আমিরুল উমারার দায়িত্ব পালন করেন। ইযযুদ্দৌলা তার পুরো শাসনামল অনর্থক কর্মকাণ্ড, খেল-তামাশা ও নারীসম্ভোগে নষ্ট করেন।

---

১১৬. *'সুনানে তিরমিজি'* ও *'সুনানে ইবনে মাজাহ'*-সহ বিভিন্ন হাদিসগ্রন্থে উক্ত বর্ণনাটির প্রথম অংশ বিদ্যমান থাকলেও গবেষক মুহাদ্দিসগণ উক্ত বর্ণনাটিকে অগ্রহণযোগ্য আখ্যায়িত করেছেন।

হাফেজ ইবনে হাজার মক্কি রহ. লিখেছেন, উক্ত হাদিসের শুদ্ধতার বিষয়ে এমন একদল হাদিস বিশারদ আপত্তি করেছেন, হাদিস শাস্ত্রে যাদেরকে 'সমাধানস্থল' বিবেচনা করে হয়। যেমন : ইমাম আবু দাউদ, আবু হাতিম রাযি প্রমুখ। [*আস-সাওয়াইকুল মুহাররাকাহ*, ১/১০৭]।

আল্লামা যায়লায়ি রহ. লিখেছেন, এমন অনেক হাদিস আছে, যা বর্ণনাকারী ও সনদের আধিক্য সত্ত্বেও মানের দিক থেকে যয়িফ। যেমন : مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ [*তাখরিজুল হিদায়া*, ১/১৮৯]।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া রহ. লিখেছেন, উক্ত হাদিসটি 'সহিহ' শিরোনামের হাদিস গ্রন্থগুলোতে নেই। অবশ্য উলামায়ে কেরামের অনেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। হাদিসটির বিশুদ্ধতা নিয়ে মতবিরোধ আছে। বুখারি, ইবরাহিম আল-হারবি-সহ একদল মুহাদ্দিস হাদিসটির বিষয়ে আপত্তি করেছেন। আর হাদিসটির শেষ অংশ অর্থাৎ اَللّٰهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ -তো সন্দেহাতীতভাবেই জাল ও বানোয়াট। [*মিনহাজুস সুন্নাহ*, ৭/৩১৯]।

মোটকথা, এ জাতীয় সংশয়পূর্ণ রেওয়ায়েত যদিও বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থের মানাকিব (ব্যক্তির গুণ ও বৈশিষ্ট্য) অধ্যায়ে পাওয়া যায়; কিন্তু তা দিয়ে কোনো মৌলিক আকিদাগত বিষয় কিছুতেই প্রমাণিত হয় না।

অনুচর ও সহকারীদের সঙ্গে তিনি ভালো ব্যবহার করতেন না। তাই তারা তাকে ভয় করত এবং তাকে এড়িয়ে চলত। এ সময় রোমানরা মুসলমানদের পারস্পরিক হানাহানির সুযোগ নিয়ে ইসলামি রাষ্ট্রের সবগুলো প্রধান সীমান্ত নগরী পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়। রোমানদের উপর্যুপরি আগ্রাসনে জাযিরা ও শামের মুসলিম অধিবাসীদের অন্তরে রোমানভীতি ছড়িয়ে পড়ে। দুই শাসক গোষ্ঠী বুওয়াইহি ও হামদান রাজপরিবার তখন নিজেদের প্রকৃত শত্রুর কথা ভুলে গিয়ে পারস্পরিক হানাহানিতে ব্যস্ত ছিল।

ইরাককেন্দ্রিক আব্বাসি সাম্রাজ্যের তৎকালীন পরিস্থিতি অনুধাবন করতে নিম্নোক্ত ঘটনাটি সহায়ক হতে পারে।

৩৬১ হিজরি সনে রোমান সম্রাট ১ম জন (John I Tzimiskes) এডেসা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে হামলা চালান এবং সামনে অগ্রসর হয়ে জাযিরার নুসায়বিন পর্যন্ত পৌঁছে যান। রোমান বাহিনী এ সময় বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়, মুসলমানদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। তখন নুসায়বিনের একটি প্রতিনিধিদল সাহায্যপ্রাপ্তির আশায় বাগদাদে উপস্থিত হয়। তারা বাগদাদের জনসমাগমপূর্ণ বিভিন্ন স্থানে গিয়ে নিজেদের দুরবস্থা ও রোমানদের নির্যাতন-লুণ্ঠনের কথা তুলে ধরে সাহায্যপ্রার্থনা করে এবং দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সাধারণ জনগণ ও সেনাবাহিনীসহ সকল বাগদাদবাসীকে রোমানদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানায়। নুসায়বিনবাসীর দুর্দশার কথা শুনে বাগদাদবাসী অস্থির ও উত্তেজিত হয়ে পড়ে। উত্তেজিত জনতা খলিফার বাসগৃহ ঘেরাও করে হামলা চালাতে উদ্যত হলে নুসায়বিনের প্রতিনিধিদল তাদেরকে নিবৃত্ত করে। বাগদাদের মূল অধিকর্তা আমিরুল উমারা ইযযুদ্দৌলা বখতিয়ার তখন কুফার উপকণ্ঠে সৌখিন শিকারে ব্যস্ত! তার কাছে সাহায্যপ্রার্থনার জন্য বাগদাদের সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের একটি প্রতিনিধিদল কুফার উদ্দেশে রওনা হয়। জাতীয় প্রয়োজন ভুলে সৌখিন শিকারে ব্যস্ত থাকা, ইসলামি ভূখণ্ডে রোমানদের আগ্রাসন প্রতিরোধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করা এবং বুতাইহা অঞ্চলের মুসলিম শাসক ইমরান বিন শাহিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়ানো ইত্যাদি কারণে বাগদাদবাসী তখন বখতিয়ারের প্রতি প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ ছিল।

প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করার পর ইযযুদ্দৌলা তাদেরকে শীঘ্রই রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধপ্রস্তুতি গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি তার সচিব সুবুক্তগিনকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার এবং জনসাধারণকে যুদ্ধাভিযানে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার নির্দেশ দেন। সুবুক্তগিনের আহ্বানে অসংখ্য মানুষ অভিযানে যোগ দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়।

ইযযুদ্দৌলা মসুলের অধিপতি আবু তাগলিব বিন হামদানের কাছে বার্তা পাঠিয়ে জানান যে, তিনি রোমানদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করতে যাচ্ছেন। কাজেই মসুল-অধিপতি যেন মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধপ্রস্তুতিতে সহায়তা করেন এবং প্রয়োজনীয় রসদপত্র ও খাবারদাবার সরবরাহ করেন। আবু তাগলিব সানন্দে সহায়তা করতে রাজি হন। এরপর ইযযুদ্দৌলা খলিফা মুতি লিল্লাহর কাছে বার্তা পাঠিয়ে তাকে যুদ্ধাভিযানের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহের নির্দেশ দেন। উত্তরে খলিফা বলেন, 'আমি যদি প্রচুর সম্পদের মালিক হতাম বা রাষ্ট্রীয় সম্পদ আমার নিয়ন্ত্রণে থাকত, তাহলে যুদ্ধে অংশগ্রহণ ও যুদ্ধব্যয়ে শরিক হওয়ার মতো জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে সহায়তা করা আমার ওপর অপরিহার্য হতো। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমার ওপর এ ধরনের কোনো দায়িত্ব বর্তায় না। এ দায়িত্ব তো তার ওপরই বর্তাবে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও সম্পদ যার হাতে আছে। আমার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি তো খুতবায় নাম উচ্চারণেই সীমাবদ্ধ। সুতরাং আমার পক্ষে কিছুই দেওয়া সম্ভব নয়। যদি আমাকে পদত্যাগে বাধ্য করো, আমি তাও করতে রাজি আছি।'

এরপর খলিফা ও সুলতানের মধ্যে একাধিকবার পত্রবিনিময় হয়। শেষ পর্যন্ত ইযযুদ্দিন বখতিয়ার হুমকির পথ অবলম্বন করলে খলিফা নিজের পোশাক-পরিচ্ছদ, রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ ইত্যাদি বিক্রি করে চার লক্ষ দিরহাম সংগ্রহ করে বখতিয়ারকে প্রদান করেন। ইরাক, খোরাসানসহ অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের মাঝে এ কথা ছড়িয়ে পড়ে যে, খলিফার যাবতীয় সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। খলিফাপ্রদত্ত অর্থ হাতে পাওয়ার পর বখতিয়ার যুদ্ধের কথা বেমালুম ভুলে যান এবং পুরো অর্থ নিজের স্বার্থে ব্যয় করেন!

খলিফা মুতি লিল্লাহর খিলাফতকালেই ৩৫৮ হিজরি সনে (৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে) সেনাপতি জাওহার সিকিল্লির নেতৃত্বে উবায়দিরা মিশর দখল করে নেয়। একই বছর তারা বাইতুল মুকাদ্দাস ও দামেশকসহ শামের বিরাট অংশও

উবায়দি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হয়। জাওহার সিকিল্লি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে মিশরে উবায়দিদের অনুকূল ক্ষেত্র প্রস্তুত করার পর ৩৬২ হিজরি সনে (৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে) উবায়দি খলিফা মুইয লি দ্বীনিল্লাহ মাগরিব থেকে মিশরে আগমন করেন এবং কায়রোকে উবায়দি সাম্রাজ্যের রাজধানী নির্বাচিত করেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সামনে স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে করা হবে।

দীর্ঘ উনত্রিশ বছর দায়িত্ব পালন করার পর ৩৬৩ হিজরি সনের ১৫ জিলকদ (৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দের ৭ আগস্ট) খলিফা মুতি লিল্লাহ অসুস্থতাজনিত কারণে স্বেচ্ছায় অব্যাহতি গ্রহণ করেন এবং তার পুত্র আবদুল কারিমকে খলিফা নির্বাচিত করেন। এর কিছুদিন পরই তিনি ইন্তেকাল করেন। মুতি লিল্লাহ তার খিলাফত আমলে উল্লেখযোগ্য কোনো কীর্তি-অবদান রেখে যেতে পারেননি।

২৪ নং আব্বাসি খলিফা

তায়ে লিল্লাহ আবু বকর আবদুল কারিম বিন মুতি বিন মুকতাদির বিন মুতাযিদ

[জিলকদ ৩৬৩ হিজরি—শাবান ৩৮১ হিজরি]
[আগস্ট ৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দ—অক্টোবর ৯৯১ খ্রিষ্টাব্দ]

খলিফা তায়ে লিল্লাহ ৩২০ হিজরি সনে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩৬৩ হিজরি সনে বিয়াল্লিশ বছর বয়সে তার পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। তার খিলাফত আমলে বাগদাদে শিয়া-সুন্নি সংঘাত বিরাট আকার ধারণ করে এবং ব্যাপক অস্থিরতা, গোলযোগ ও রক্তপাতের ঘটনা ঘটে। এ সময় বাগদাদের পশ্চিম প্রান্তে শিয়াঅধ্যুষিত কারখ এলাকায় আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। সুলতান ইযযুদ্দিন বখতিয়ার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হন।

খলিফা তায়ে লিল্লাহর আমলেই আমিরুল উমারা ইযযুদ্দৌলা ও তার চাচাতো ভাই আযদুদ্দৌলা বিন হাসানের মধ্যে বাগদাদের কর্তৃত্ব নিয়ে সংঘাত সৃষ্টি হয়। ৩৬৬ হিজরি সনে আযদুদ্দৌলার বিজয়ের মধ্য দিয়ে এ সংঘাতের সমাপ্তি ঘটে। আযদুদ্দৌলা প্রথমে ইযযুদ্দৌলাকে পরাজিত করে বাগদাদের নিয়ন্ত্রণ লাভ করেন। এরপর তিনি মসুলেও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে হামদানিয়া রাষ্ট্রের পতন ঘটান। তারপর তিনি একে একে ইরাক, জাযিরা, আহওয়াজ, পারস্য, জিবাল, রায় ও জুরজানেও নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন।

আযদুদ্দৌলাকে বনু বুওয়াইহির সবচেয়ে চৌকস ও প্রজ্ঞাবান সুলতান বিবেচনা করা হয়। তিনি রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও সুশাসন, ব্যক্তিপ্রভাব ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, উদারতা ও বদান্যতা ইত্যাদি গুণের অধিকারী ছিলেন। আযদুদ্দৌলা সুপারিশের পরিবর্তে যোগ্যতার মাপকাঠিতে নিয়োগ-বিয়োগ করতেন। তিনি ৩৭২ হিজরি সনের শাওয়াল মাসে (৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে) ইন্তেকাল করেন।

আযদুদ্দৌলার মৃত্যুর পর আমিরুল উমারার পদ গ্রহণ করেন তার পুত্র আবু কালিজার মারযুবান। তিনি 'ছামছামুদ্দৌলা' উপাধি গ্রহণ করেন। গুণ ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তিনি ছিলেন তার পিতার সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর অধিবাসী! তার আমলে ইরাকপরিস্থিতি আবারও অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে। ছামছামুদ্দৌলার দুর্বল শাসনব্যবস্থার কারণে আব্বাসি রাষ্ট্রের পরিধি পুনরায় সংকুচিত হতে থাকে এবং স্বাভাবিকভাবেই ছামছামুদ্দৌলার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিও দুর্বল হয়ে পড়ে। ৩৭৬ হিজরি সনে তার ভাই আবুল ফাওয়ারিস শারফুদ্দৌলা তাকে পরাজিত করে বাগদাদের আমিরুল উমারা পদ লাভ করেন। এ ঘটনার কয়েকদিনের মধ্যেই ছামছামুদ্দৌলা ইন্তেকাল করেন। তিন বছর পর ৩৭৯ হিজরি সনে শারফুদ্দৌলাও ইন্তেকাল করেন।

এরপর দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাদের আরেক ভাই আবু নাসর বাহাউদ্দৌলা। ৩৮১ হিজরি সনে (৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে) বাহাউদ্দৌলা খলিফা তায়ে লিল্লাহর সম্পদ কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে তাকে বন্দি ও বরখাস্ত করেন। বেশ কয়েক বছর পর ৩৯৩ হিজরি সনে (১০০৩ খ্রিষ্টাব্দে) খলিফা তায়ে লিল্লাহ তিয়াত্তর বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

তায়ে লিল্লাহর খিলাফত আমলেই ৩৬৬ হিজরি সনে (৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে) সুবুক্তগিনের হাতে বর্তমান আফগানিস্তানের গজনি (Ghazni) অঞ্চলে গজনবি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। গজনবি রাষ্ট্র ৫৮২ হিজরি সন (১১৮৬ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত টিকে ছিল। গজনবি রাষ্ট্র সম্পর্কে সামনে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

আল-কাদির বিল্লাহ্ আবুল আব্বাস আহমাদ বিন ইসহাক বিন মুকতাদির বিন মুতাযিদ

[শাবান ৩৮১ হিজরি—জিলহজ ৪২২ হিজরি]

[অক্টোবর ৯৯১ খ্রিষ্টাব্দ—নভেম্বর ১০৩১ খ্রিষ্টাব্দ]

দ্বাদশ আব্বাসি খলিফা মুসতাইন ও ষোড়শ আব্বাসি খলিফা মুতাযিদের ন্যায় খলিফা কাদির বিল্লাহও আব্বাসি খলিফাগণের মাঝে এদিক থেকে স্বতন্ত্র ছিলেন যে, তার পিতা পূর্বে খলিফা ছিলেন না। তার পিতা ইসহাক ছিলেন অষ্টাদশ খলিফা মুকতাদির বিল্লাহর পুত্র। কাদির বিল্লাহ ৩৩৬ হিজরি সনে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩৮১ হিজরি সনে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে তার চাচাতো ভাই তায়ে লিল্লাহর স্থলাভিষিক্ত হন।

তায়ে লিল্লাহকে অপসারণ করার পর বুওয়াইহি সুলতান বাহাউদ্দৌলার নির্দেশনায় কাদির বিল্লাহকে খলিফা নির্বাচন করা হয়। পূর্ববর্তী খলিফা তায়ে লিল্লাহর আমলে তিনি পলাতক ছিলেন। খলিফা নির্বাচনের পর তাকে বাগদাদে নিয়ে আসা হয় এবং বাহাউদ্দৌলার পক্ষ থেকে উষ্ণ সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। বুওয়াইহি পরিবারের কর্তৃত্বকালীন অন্যান্য খলিফার ন্যায় কাদির বিল্লাহরও কোনো নির্বাহী ক্ষমতা ছিল না। তবে তুলনামূলক দুর্বল সুলতানগণ[১১৭] কিছুটা হলেও খলিফাকে ক্ষমতা ও কথা বলার সুযোগ দান করতেন। খলিফা কাদির বিল্লাহও এ ধরনের কিছু সুবিধা লাভ করেন। তিনি সহনশীল ও মহানুভব ছিলেন, কল্যাণ ও কল্যাণকামীদের পছন্দ করতেন, নিজে কল্যাণের নির্দেশ দিতেন এবং

---

[১১৭]. ৪০৩ হিজরি সনে আমিরুল উমারা বাহাউদ্দৌলা ইন্তেকাল করলে ইরাকের সুলতান পদ লাভ করেন তার পুত্র আবু শুজা সুলতানুদ্দৌলা। এরপর ৪১২ হিজরি সনে সুলতান হন বাহাউদ্দৌলার আরেক পুত্র আবু আলি মুশরিফুদ্দৌলা। ৪১৬ হিজরি সনে মুশরিফুদ্দৌলার ইন্তেকালের পর সুলতান হন বাহাউদ্দৌলার আরেক পুত্র আবু তাহির জালালুদ্দৌলা। জালালুদ্দৌলার আমলেই ৪২২ হিজরি সনে খলিফা কাদির বিল্লাহ ইন্তেকাল করেন।

অকল্যাণ হতে বাধা প্রদান করতেন। তিনি বিশুদ্ধ আকিদার অধিকারী ছিলেন। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর মাজহাবের সমর্থনে এবং বিদআতের খণ্ডনে তিনি একটি গ্রন্থও রচনা করেন। খলিফা কাদির বিল্লাহ ছিয়াশি বছর বয়সে ৪২২ হিজরি সনে (১০৩১ খ্রিষ্টাব্দে) ইন্তেকাল করেন।

২৬ নং আব্বাসি খলিফা

আল-কায়িম বি আমরিল্লাহ আবু জাফর আবদুল্লাহ বিন কাদির বিন ইসহাক বিন মুকতাদির

[জিলহজ ৪২২ হিজরি—শাবান ৪৬৭ হিজরি]
[নভেম্বর ১০৩১ খ্রিষ্টাব্দ—এপ্রিল ১০৭৫ খ্রিষ্টাব্দ]

কাদির বিল্লাহর ইন্তেকালের পর খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তার পুত্র কায়িম বি আমরিল্লাহ। কায়িম বি আমরিল্লাহ ৩৯১ হিজরি সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৪২২ হিজরি সনে একত্রিশ বছর বয়সে খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হন।

তার খিলাফত আমলের প্রথমদিকে বাগদাদে খিলাফত ও সালতানাত উভয় পদই দুর্বল ও কর্তৃত্বহীন ছিল। তখন রাষ্ট্রজুড়ে গোলযোগ-দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে, সাধারণ সৈনিকদের অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়। দায়লামি (সুলতান ও আমিরুল উমারার বংশ) ও তুর্কিদের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হয়। বিস্ময়কর তথ্য হলো—আব্বাসি সাম্রাজ্যের এই চরম দুর্বলতম অবস্থার মধ্যেও শেষ বুওয়াইহি সুলতান আবু নাসর খসরু[১১৮] খলিফার কাছে আল-মালিকুর

---

[১১৮]. খলিফা কায়িম বি আমরিল্লাহর দায়িত্ব গ্রহণের সময় বাগদাদের বুওয়াইহি সুলতান ছিলেন আবু তাহির জালালুদ্দৌলা। ৪৩৬ হিজরি সনে জালালুদ্দৌলার ইন্তেকাল হলে সুলতান হন তার ভ্রাতুষ্পুত্র (আবু শুজা সুলতানুদ্দৌলার পুত্র) আবু কালিজার মারযুবান মুহিউদ্দিন। ৪৪০ হিজরি সনে মুহিউদ্দিনও ইন্তেকাল করলে তার পুত্র ও শেষ বুওয়াইহি সুলতান আল-মালিকুর রাহিম আবু নাসর খসরু দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

রাহিম উপাধি দাবি করেন। খলিফা তাকে এ উপাধি প্রদানে অস্বীকৃতি জানালে তিনি বারবার পীড়াপীড়ি করতে থাকেন এবং একপর্যায়ে তা আদায় করে ছাড়েন!

৪৪৭ হিজরি সনে (১০৫৫ খ্রিষ্টাব্দে) সেলজুক সুলতান তুগরুল বেগ বাগদাদে প্রবেশ করার পূর্ব পর্যন্ত আবু নাসরই বাগদাদের সুলতান ছিলেন। এ সময় খলিফা কায়িম বি আমরিল্লাহ বুওয়াইহি সুলতান আবু নাসরকে তুগরুল বেগের আনুগত্য করার নির্দেশ দেন। এর মাধ্যমে বাগদাদে এক শতাব্দীর অধিক কাল ব্যাপ্ত বুওয়াইহি শাসনের যবনিকাপাত ঘটে। শিয়া মতাদর্শপুষ্ট বুওয়াইহি শাসক-পরিবার আব্বাসি সাম্রাজ্যে উল্লেখযোগ্য কোনো কল্যাণকর প্রভাব রেখে যেতে পারেনি। বাগদাদের অধিকাংশ নাগরিক আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও বাগদাদে শিয়া মতবাদের প্রচার-প্রসারের চেষ্টা চালিয়ে বুওয়াইহি সুলতানরা কেবল গোলযোগ, ভাঙন ও অনৈক্য বৃদ্ধি করেছিল।

বাগদাদের বুওয়াইহি সুলতানগণের তালিকা

০১	মুইযযুদ্দৌলা আহমাদ বিন বুওয়াইহ	:	৩৩৪-৩৫৬ হি. ৯৪৫-৯৬৭ খ্রি.
০২	ইযযুদ্দৌলা বখতিয়ার বিন আহমাদ (পদচ্যুত)	:	৩৫৬-৩৬৬ হি. ৯৬৭-৯৭৮ খ্রি.
০৩	আযদুদ্দৌলা ফানা খসরু বিন হাসান বিন বুওয়াইহ	:	৩৬৬-৩৭২ হি. ৯৭৮-৯৮৩ খ্রি.
০৪	ছামছামুদ্দৌলা আবু কালিজার মারযুবান বিন আযদুদ্দৌলা (পদচ্যুত)	:	৩৭২-৩৭৬ হি. ৯৮৩-৯৮৭ খ্রি.
০৫	শারফুদ্দৌলা আবুল ফাওয়ারিস শারযিল বিন আযদুদ্দৌলা	:	৩৭৬-৩৭৯ হি. ৯৮৭-৯৯০ খ্রি.
০৬	বাহাউদ্দৌলা আবু নাসর ফিরোয বিন আযদুদ্দৌলা	:	৩৭৯-৪০৩ হি. ৯৯০-১০১৩ খ্রি.
০৭	সুলতানুদ্দৌলা আবু শুজা বিন বাহাউদ্দৌলা	:	৪০৩-৪১২ হি. ১০১৩-১০২১ খ্রি.
০৮	মুশরিফুদ্দৌলা আবু আলি বিন বাহাউদ্দৌলা	:	৪১২-৪১৬ হি. ১০২১-১০২৫ খ্রি.
০৯	জালালুদ্দৌলা আবু তাহির বিন বাহাউদ্দৌলা	:	৪১৬-৪৩৬ হি. ১০২৫-১০৪৪ খ্রি.
১০	আবু কালিজার মারযুবান বিন সুলতানুদ্দৌলা	:	৪৩৬-৪৪০ হি. ১০৪৪-১০৪৮ খ্রি.
১১	আবু নাসর খসরু বিন আবু কালিজার মারযুবান	:	৪৪০-৪৪৭ হি. ১০৪৮-১০৫৫ খ্রি.

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তুর্কি সেলজুক পরিবার-নিয়ন্ত্রিত আব্বাসি খলিফাগণের বিবরণ

[রমজান ৪৪৭ হিজরি—জুমাদাল উখরা ৫৯০ হিজরি]

[ডিসেম্বর ১০৫৫ খ্রিষ্টাব্দ—জুন ১১৯৪ খ্রিষ্টাব্দ]

সেলজুক পরিবারের হাতে আব্বাসি সাম্রাজ্যের লাগাম

এই স্তরের সূচনা হয় ৪৪৭ হিজরি সনে আর এর ব্যাপ্তি ছিল ৫৯০ হিজরি সন পর্যন্ত প্রায় দেড় শতাব্দী। ২৬ নং আব্বাসি খলিফা কায়িম বি আমরিল্লাহর খিলাফতকালের মধ্যভাগে বাগদাদে সেলজুক পরিবারের সালতানাত ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, যা ৩৪ নং আব্বাসি খলিফা নাসির লি দ্বীনিল্লাহর খিলাফতকাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সেলজুকরা যদিও তুর্কি সেনাপতি ও শিয়া বুওয়াইহিদের ধারাবাহিকতায় আব্বাসি সাম্রাজ্যের কর্তৃত্বের অধিকারী হয়েছিল; কিন্তু খলিফাদের সঙ্গে সেলজুক সুলতানদের আচরণ তুর্কি সেনাপতি ও বুওয়াইহি সুলতানদের ন্যায় কঠোর ছিল না। তুর্কি সেনাপতিরা ছিল অশিক্ষিত ও সর্বদা পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত। যখনই কোনো তুর্কি সেনাপতি মনে করত যে, খলিফা তার প্রতিপক্ষের প্রতি অনুরাগী হয়ে পড়েছেন, তখনই সে কৌশলে খলিফাকে হত্যা করার বা হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করত। আর শিয়া বুওয়াইহি সুলতানগণ তো কেবল খলিফা নয়; বরং সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নি সম্প্রদায়ের প্রতিই বিদ্বেষ পোষণ করত এবং দমন-পীড়ন নীতির মাধ্যমে খলিফা ও সাধারণ জনগণের ক্ষতিসাধনের চেষ্টা করত। কোনো কোনো বুওয়াইহি সুলতান খলিফার খিলাফত-মর্যাদা কেড়ে নিয়ে নিজে খলিফা হওয়ার চেষ্টাও করেছে। বিপরীতে সেলজুক সুলতানগণ খলিফাদের সঙ্গে তুলনামূলক সদাচরণ করতেন। বরং এভাবেও বলা যায় যে, সেলজুক সুলতানগণের উদার আচরণ কিছুটা হলেও আব্বাসি খলিফাদের হারানো কর্তৃত্ব ও প্রভাব ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করেছিল।

সেলজুক পরিবার : যেভাবে খিলাফতের রাজধানী বাগদাদে

তুর্কিস্তানে তুর্কি শাসকের অধীনে যেসব জনগোষ্ঠী বসবাস করত, তার একটি হলো তুর্কি উগুজ পরিবারজোট। সেলজুক পরিবার মূলত এই উগুজ পরিবারেরই একটি শাখা।

সেলজুক বংশের প্রধান ঊর্ধ্বতন পুরুষ হলেন সেলজুক বিন তুকাক। তিনি একশ সাত বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। আপন অভিজাত্য ও সহজাত নেতৃত্বগুণের মাধ্যমে তিনি তৎকালীন তুর্কি শাসকের নৈকট্য অর্জনে সক্ষম হন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সেলজুকের যোগ্যতা ও দক্ষতায় তুর্কি শাসক সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন এবং সেলজুকের অনিষ্ট সাধনের মনস্থ করেন। শাসকের পরিবর্তিত মনোভাব উপলব্ধি করতে পেরে সেলজুক বিন তুকাক তার পরিজন ও অনুসারীদের সঙ্গে নিয়ে তুর্কিস্তান ছেড়ে ইসলামি ভূখণ্ডে পাড়ি জমান এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর তিনি তুর্কিস্তানে হামলা চালাতে শুরু করেন। এ সময় সামানি রাজপরিবারও নিজেদের ভূখণ্ডে তুর্কিস্তানের হামলা রুখতে সেলজুকের সাহায্য গ্রহণ করে।

এভাবেই দিন অতিবাহিত হতে থাকে। একসময় সেলজুক পরিবারের হাল ধরেন সেলজুক বিন তুকাকের দুই পৌত্র তুগরুল বেগ মুহাম্মাদ ও চাঘরি বেগ দাউদ। তারা সেলজুক বংশের সদস্যদের নিয়ে বুখারার মরু অঞ্চলে চলে যান এবং সেখানেই বসবাস শুরু করেন। কিন্তু বুখারার প্রশাসক তাদের অবস্থানে শঙ্কা ও বিরূপভাব প্রকাশ করলে তারা সেখান থেকে তুর্কিস্তানের শাসক বুগরা খানের নিকট চলে আসেন। পরবর্তী সময়ে বুগরা খানের সঙ্গে সেলজুক পরিবারের সংঘাত সৃষ্টি হলে তুগরুল বেগ বুগরা খানের হাতে বন্দি হন। কিন্তু চাঘরি বেগ বুগরা খানের ওপর অতর্কিতে হামলা চালিয়ে ভাই তুগরুল বেগকে উদ্ধার করতে সক্ষম হন। এরপর তারা সেখান থেকে সামানিয়া রাষ্ট্রে চলে যান এবং সেখানেই বসবাসের সিদ্ধান্ত নেন। সামানি রাজপরিবার তখন নিজেদের অন্তিম সময় অতিবাহিত করছিল। সামানিয়া রাষ্ট্রে তখন আত্মপ্রকাশ করেছিল নতুন শক্তি গজনবি (সুবুক্তগিন) পরিবার। এবার গজনবি পরিবারের সঙ্গে সেলজুক পরিবারের সংঘাত শুরু হয়। সংঘাতের সমাপ্তি ঘটে সুলতান মাহমুদ গজনবির হাতে তুগরুল বেগের চাচা আরসালান বিন সেলজুকের বন্দি হওয়ার মধ্য দিয়ে। অবশ্য পরে সেলজুক ও গজনবি পরিবারের মধ্যে সমঝোতা হয় এবং সেলজুক পরিবারের নেতৃস্থানীয় সদস্যগণ বিভিন্ন অঞ্চল ও নগরীর শাসনক্ষমতা লাভ করেন।

৪২৯ হিজরি সনে পুনরায় গজনবি-সেলজুক সংঘাত শুরু হয়। এ সময় তুগরুল বেগ মার্ভের কর্তৃত্ব অর্জন করতে সক্ষম হন। তখন থেকে এ

অঞ্চলের অধিবাসীরা তাদের জুমার খুতবায় 'মালিকুল মুলুক' উপাধিযোগে তুগরুল বেগের নাম উচ্চারণ করতে থাকে।

৪৩২ হিজরি সনে তুগরুল বেগ নিশাপুর, জুরজান ও তিবরিস্তান অধিকার করেন। এরপর ৪৩৩ হিজরি সনে তিনি কিরমান ও দায়লাম অঞ্চলকেও নিজের শাসন এলাকার অন্তর্ভুক্ত করেন।

৪৩৪ হিজরি সনে তুগরুল বেগ খোয়ারিজমে[১১৯] কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এবার সেলজুকদের প্রতিপক্ষও বদলে যায়। সেলজুকদের নতুন প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায় বুওয়াইহি পরিবার। এরপর তুগরুল বেগ ইস্পাহানে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। কিছুদিন পর সেলজুক-বুওয়াইহি সমঝোতা সৃষ্টি হয় এবং সেলজুক পরিবারের প্রধান তুগরুল বেগ তৎকালীন বুওয়াইহি সুলতান মুহিউদ্দিন আবু কালিজারের কন্যাকে বিয়ে করেন। অপরদিকে আবু কালিজারের পুত্র আবু মানসুর বিয়ে করেন তুগরুলের ভাই চাঘরি বেগ দাউদের কন্যাকে। এটি ৪৩৯ হিজরি সনের কথা।

এরপর তুগরুল বেগ রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন এবং তাদেরকে বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত করেন। পরবর্তী সময়ে রোমানদের সঙ্গে সেলজুক পরিবারের শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে তুগরুল বেগ শর্তারোপ করেন যে, তিনি রোমানদের রাজধানী কনস্টান্টিনোপলে একটি মসজিদ নির্মাণ করবেন। শর্ত মোতাবেক সেখানে মসজিদ নির্মিত হয় এবং জুমার খুতবায় তুগরুল বেগের নাম উচ্চারিত হতে থাকে।

এ সময় পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সেলজুক পরিবার নিজেদের অধিকৃত সুবিস্তৃত সেলজুক রাষ্ট্রকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে পরিবারের প্রবীণ সদস্যদের মাঝে নেতৃত্ব বণ্টন করে দেয় এবং তুগরুল বেগকে সকলের প্রধান ও সুলতান নির্বাচন করে। তিনি রায় নগরীকে সেলজুক রাষ্ট্রের রাজধানী নির্বাচন করেন। নিঃসন্তান তুগরুল বেগের সহকারী নির্বাচিত করা হয় তার ভ্রাতুষ্পুত্র (চাঘরি বেগ দাউদের পুত্র) আলপ আরসালানকে। তুগরুল বেগের কর্মতৎপরতা ও খলিফার সঙ্গে পত্রবিনিময়ের ভিত্তিতে খলিফা কায়িম বি আমরিল্লাহ এবার খুতবায়

---

[১১৯]. আব্বাসি খিলাফতকালে খিলাফতের নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেসব স্বাধীন ইসলামি রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল, তার একটি খোয়ারিজম রাষ্ট্র। মধ্য ও পূর্ব এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে গড়ে ওঠা খোয়ারিজম রাষ্ট্র সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সামনে স্বতন্ত্রভাবে আসবে।

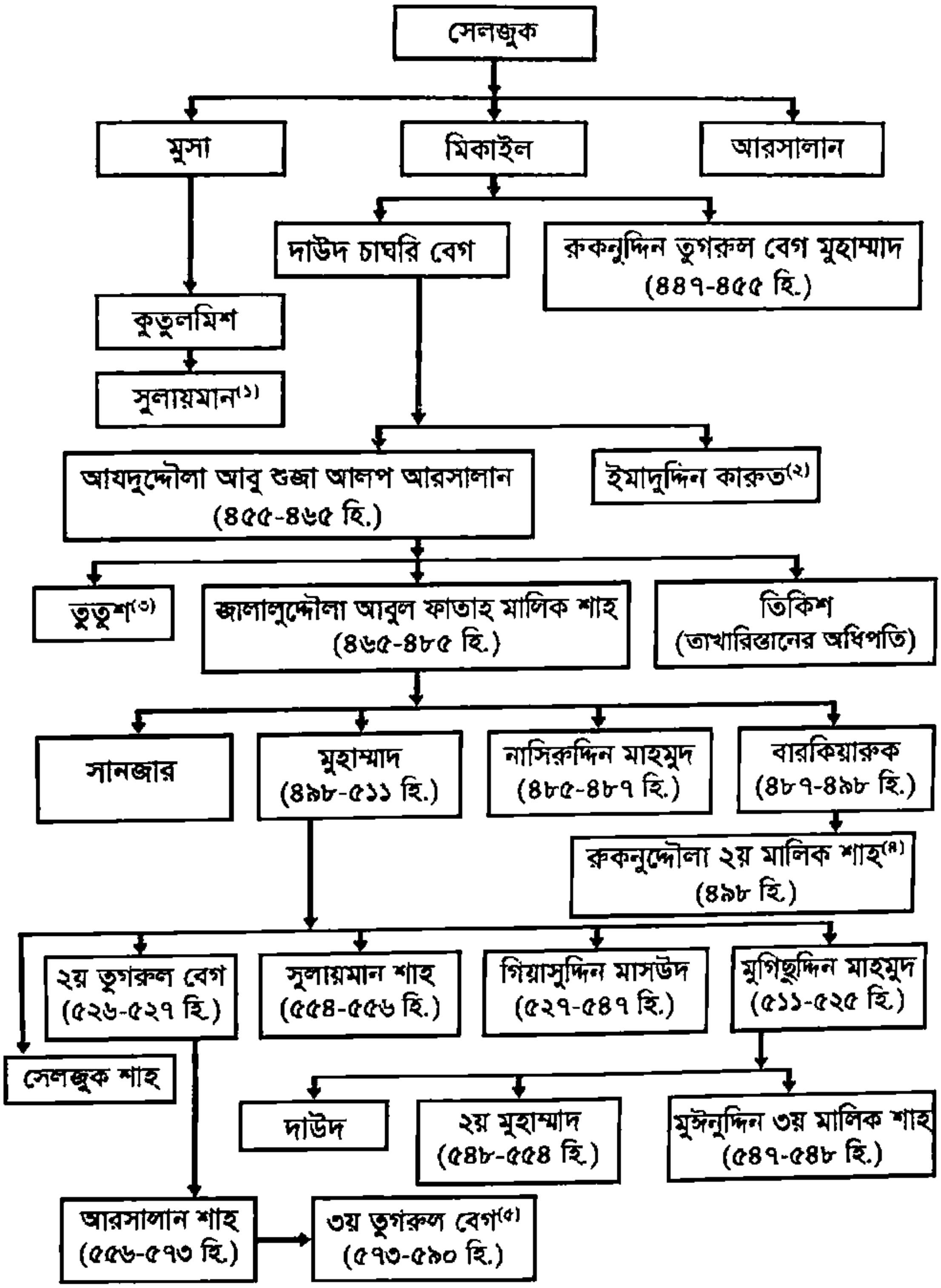
বুওয়াইহি সুলতানের নামের পূর্বে সেলজুক সুলতান তুগরুল বেগের নাম পাঠ করার এবং সরকারি মুদ্রায় তার নাম অঙ্কনের নির্দেশ দেন।

৪৪৭ হিজরি সনে (১০৫৫ খ্রিষ্টাব্দে) খলিফার অনুমতি নিয়ে তুগরুল বেগ বাগদাদে উপস্থিত হন। এ সময় খলিফা কায়িম বি আমরিল্লাহ বুওয়াইহি সুলতান আল-মালিকুর রাহিম আবু নাসরকে তুগরুল বেগের আনুগত্য করার নির্দেশ দেন। এর মাধ্যমে বাগদাদে বুওয়াইহি যুগের পরিসমাপ্তি ঘটে, সূচনা হয় সেলজুক যুগের।

৪৫৪ হিজরি সনে খলিফা কায়িম বি আমরিল্লাহ তুগরুল বেগের ভাই দাউদের কন্যা খাদিজাকে বিয়ে করেন। এরপর তুগরুল বেগ খলিফা-কন্যাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন এবং খলিফার অমত সত্ত্বেও বিয়ে করেন। বাগদাদ থেকে ফেরার পথে তুগরুল বেগ অসুস্থ হয়ে পড়েন। অবশেষে রায় নগরীতে পৌঁছার পর ৪৫৫ হিজরি সনের রমজান মাসে (১০৬৩ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে) তিনি ইন্তেকাল করেন।

সেলজুক পরিবার ধীরে ধীরে তৎকালীন ইসলামি প্রাচ্যের সিংহভাগ অঞ্চল নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়।

সেলজুক পরিবার ও সুলতানদের বংশলতিকা



১. তার মাধ্যমে রোমান সেলজুক রাষ্ট্রের সূচনা হয়। এ রাষ্ট্রের বিস্তৃতি ছিল ৪৭০ হি. হতে ৭০৮ হি. সন পর্যন্ত। তুর্কি উসমানি পরিবার ও মঙ্গোলদের হাতে রোমান সেলজুকদের পতন ঘটে।

২. তার মাধ্যমে কিরমানি সেলজুক রাষ্ট্রের সূচনা হয়। এর ব্যাপ্তি ছিল ৪৩২ হি. হতে ৫৮৩ হি. সন পর্যন্ত। গজনবি রাজপরিবারের হাতে এ রাষ্ট্রের পতন ঘটে।

৩. তার মাধ্যমে শামীয় সেলজুক রাষ্ট্রের সূচনা হয়। এর ব্যাপ্তি ছিল ৪৮৭-৫১১ হি. পর্যন্ত। শাম ও জাযিরার আতাবিক পদধারীদের হাতে এ রাষ্ট্রের পতন ঘটে।

৪. তার সময় সেলজুক রাষ্ট্র ইরাক ও কুর্দিস্তানে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। খোরাসান ও মাওয়ারাউন নাহার চলে যায় খোয়ারিজমের শাসকদের হাতে।

৫. তিনি খোয়ারিজমের শাহ সুলতান আলাউদ্দিন তিকিশের হাতে নিহত হলে বাগদাদে সেলজুক রাষ্ট্রের পতন ঘটে।

শিয়া-সুন্নি সংঘাত

খলিফা কায়িম বি আমরিল্লাহর আমলেই ৪৪৩ হিজরি সনের সফর মাসে বাগদাদে শিয়া-সুন্নি দাঙ্গা সংঘটিত হয় এবং উভয় পক্ষের প্রচুর মানুষ নিহত হয়। ঐতিহাসিকগণ এর প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, শিয়ারা এ সময় কয়েকটি বুরুজ (টাওয়ার) তৈরি করে তাতে স্বর্ণ দ্বারা নিম্নোক্ত বাক্যগুলো উৎকীর্ণ করেছিল—

> মুহাম্মাদ ও আলি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মানুষ। যারা তা মানল, তারা শোকর করল; আর যারা অস্বীকার করল, তারা কুফরি করল।

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আলি রাযি.-কে সমান্তরালে রাখার এই গর্হিত শিয়া-কাণ্ডে বাগদাদের সুন্নি মুসলমানগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। একে কেন্দ্র করে উভয় পক্ষের মধ্যে মারামারি শুরু হয় এবং রবিউল আউয়াল মাস পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। এ সময় বনু বুওয়াইহ-এর নেতৃবৃন্দের সমাধি পোড়ানো হয়, পোড়ানো হয় খলিফা মানসুর, খলিফা আমিন, তার মা জুবায়দাসহ অনেকের সমাধি। ফিতনা দিনে দিনে বিস্তৃত হয়ে সীমা ছাড়িয়ে যায়। শিয়া রাফিজিরাও বিভিন্ন রকম ফাসাদ সৃষ্টি করে। তারা বিভিন্ন প্রাচীন কবর খুড়ে কবরস্থ বুজুর্গদের লাশ জ্বালিয়ে দেয়। এমনকি তারা ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ.-এর সমাধিতেও আগুন লাগানোর চেষ্টা করে। রাফিজিদের নেতৃত্বে ছিল কুতাইয়ি নামক জনৈক বদমাশ। সে তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অনুসরণ করে প্রকাশ্যে বা গোপনে হত্যা করত। তার কারণে পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। প্রচণ্ড দুঃসাহসী, শক্তিশালী ও চতুর হওয়ায় কেউ তাকে বশে আনতে পারছিল না।

৪৪৮ হিজরি সন পর্যন্ত পরিস্থিতি এমনই ছিল। আর ৪৪৮ হিজরি সনেই শুরু হয় সেলজুক পরিবারের সালতানাত।

ঐতিহাসিক ইবনে কাছির রহ. বলেন—

> এ বছরই রাফিজিদের নির্দেশ প্রদান করা হয় যে, তারা যে আজানে অতিরিক্ত 'হাইয়া আলা খাইরিল আমল' উচ্চারণ করত, তা বাদ দিতে হবে। তাদের মুয়াজ্জিনদের ফজরের আজানে 'হাইয়া আলাল ফালাহ'-এর পর দু-বার 'আসসালাতু খাইরুম মিনান নাওম' বলার নির্দেশ দেওয়া হয়। রাফিজিদের বিভিন্ন

মসজিদের দ্বারে উৎকীর্ণ 'মুহাম্মাদ ও আলি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মানুষ' বাণী মুছে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়। কবিতাপাঠকগণ বসরা প্রবেশদ্বার দিয়ে রাফিজিদের কেন্দ্র কারখের প্রবেশদ্বারে প্রবেশ করে সাহাবায়ে কেরামের শানে রচিত বিভিন্ন কবিতা আবৃত্তি করতে থাকে। ইতিপূর্বে বনু বুওয়াইহির শাসনামলে তারা এরূপ করতে পারত না। কারণ, বুওয়াইহি শাসকপরিবার শিয়াদেরকে সহায়তা করত এবং শক্তি জোগাত। ইতিমধ্যে বুওয়াইহি পরিবারের শাসনব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়েছে এবং তাদের স্থলে সেলজুক তুর্কিদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেলজুকরা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআকে ভালোবাসত, তাদের প্রতি হৃদ্যতা পোষণ করত এবং তাদের মর্যাদা সমুন্নত করত। কালের দীর্ঘ পরিক্রমায় সদা সর্বদা আল্লাহই প্রশংসিত।[১২০]

৪৫০ হিজরি সনে সংঘটিত ভয়াবহ এক ফিতনা

এ সময় উবায়দিরা আরসালান আবুল হারিস বাসাসিরি তুর্কি-এর সহায়তায় বাগদাদ দখল করার এবং আব্বাসি খলিফাকে নির্বাসিত করার চেষ্টা চালায়।

বাসাসিরি ছিল বুওয়াইহি সুলতান বাহাউদ্দৌলার ক্রীতদাস। পূর্বে সে বাসা নগরীর জনৈক ব্যক্তির দাস ছিল বিধায় তাকে বাসাসিরি বলা হতো। বাসাসিরি 'আল-মালিকুল মুযাফফার' উপাধি গ্রহণ করে এবং আপন চাতুর্যগুণে খলিফা কায়িম বি আমরিল্লাহর একান্ত আস্থাভাজন ব্যক্তিতে পরিণত হয়। খলিফা তার পরামর্শ ব্যতীত কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন না। পুরো ইরাকের মিম্বরে মিম্বরে তার নামে খুতবা পাঠ করা হতো। কিন্তু কিছুদিন পরই বাসাসিরির আসল রূপ প্রকাশ পেয়ে যায়। সে খলিফা ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এ সময় সেলজুক সুলতান তুগরুল বেগ ও তার ভাই ইবরাহিমের মধ্যে সংঘাত চলছিল। বাসাসিরি তখন আরব আমির কুরাইশ বিন বাদরানকে সঙ্গে নিয়ে মসুল অভিমুখে রওনা হয় এবং মসুলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। সংবাদ পেয়ে তুগরুল বেগ দ্রুত মসুলে গমন করে নগরীটি পুনরুদ্ধার করেন। বাসাসিরি ও কুরাইশ পালিয়ে গেলে তুগরুল বেগ নুসায়বিন পর্যন্ত তাদের পশ্চাদ্ধাবন

---

১২০. ইবনে কাছির দিমাশকি, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ১২/৬৬।

করেন। এদিকে তুগরুল বেগের ভাই ইবরাহিম পালিয়ে হামাদানে চলে যায় এবং বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তুগরুল বেগ এবার ভাই ইবরাহিমের পিছু নেন। এ সময় অল্পকিছু সৈন্য তার অনুসরণ করলেও বাকিরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে।

বাগদাদ তখন বলতে গেলে সৈন্যশূন্য। বাসাসিরি একে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে বাগদাদ অভিমুখে রওনা হয়। বাসাসিরির আগমনসংবাদ শুনে বাগদাদে আতঙ্কের স্রোত বয়ে যায়। পুরো বাগদাদে তখন একটাই আওয়াজ—'যারা বাগদাদ ছাড়তে চায়, তারা যেন অতি শীঘ্র বাগদাদ ছাড়ে!' জনগণ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। নারী-পুরুষ ও শিশুদের মধ্যে কান্নার রোল পড়ে যায়। প্রতিপক্ষকে প্রতিরোধ করার মতো সৈন্য বাগদাদে না থাকায় অনেকে খলিফাকেও বাগদাদ ত্যাগের পরামর্শ দিলে স্বয়ং খলিফা কায়িম বি আমরিল্লাহও বাগদাদ ত্যাগের মনস্থ করেন। অবশ্য পরে তিনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে রাজপ্রাসাদে অবস্থান করাকেই প্রাধান্য দেন।

৪৫০ হিজরি সনের ৮ জিলকদ (১০৫৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ ডিসেম্বর) বাসাসিরি উবায়দিদের সাদা ঝান্ডা হাতে বাগদাদে প্রবেশ করে। মূল পতাকায় উবায়দি খলিফার নাম খচিত ছিল। কারখের অধিবাসী শিয়ারা বাসাসিরিকে স্বাগত জানায়। বাসাসিরি সন্ত্রাসী শ্রেণির লোকদের সমবেত করে এবং তাদেরকে খলিফার প্রাসাদ লুণ্ঠনের অনুমতি প্রদান করে। শিয়ারা সুন্নিদের ঘরবাড়ি লুটপাট করতে থাকে। বাগদাদে পুনরায় শিয়া রুসম-রেওয়াজ ও বিদআতের প্রচলন শুরু হয়।

খলিফা কায়িম বি আমরিল্লাহ এ সময় আব্বাসি রাজপরিবারের সীমিত সংখ্যক সদস্যসহ প্রাসাদে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। খলিফা আরব আমির কুরাইশ বিন বাদরানের কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করলে সে খলিফাকে নিরাপত্তা প্রদান করে। খলিফাকে নিরাপত্তা দেওয়ায় বাসাসিরি কুরাইশের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়। অবশ্য পরে উভয়ে একমত হয় যে, তারা খলিফাকে বাগদাদ থেকে বের করে আনা[১২১] অঞ্চলের আমির মুহারিশ

---

[১২১]. **আনা** : জাযিরা অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত রাক্কা ও হিতের মধ্যবর্তী প্রসিদ্ধ একটি নগরী। নগরীটির অবস্থান ফুরাত নদীর তীরঘেঁষে হাদিসাতুল ফুরাত এলাকার নিকটে। দেখুন: ইয়াকুত আল-হামাবি, *মুজামুল বুলদান*, ৪/৭২।

বিন মুজালির কাছে পাঠিয়ে দেবে। মুহারিশ ছিলেন কুরাইশ বিন বাদরানের পিতৃবংশীয় ভাই। খলিফা বারবার কুরাইশের কাছে অনুরোধ করেন যে, তাকে যেন বাগদাদ থেকে নির্বাসিত না করা হয়। কিন্তু সব প্রচেষ্টাই নিষ্ফল প্রমাণিত হয়। খলিফাকে হাওদায় বসিয়ে আনা অঞ্চলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পরবর্তী পূর্ণ এক বছর খলিফা মুহারিশের কাছেই ছিলেন। তার সঙ্গে তার পরিবারের কেউ ছিল না। এটি ৪৫০ হিজরি সনের জিলকদ (১০৫৯ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি) মাসের ঘটনা।

বাসাসিরি বাগদাদে জুমার খুতবায় উবায়দি খলিফার নাম পাঠের নির্দেশ জারি করে। বাগদাদের রাফিজিরা এ সময় অত্যন্ত আনন্দিত ছিল। বাসাসিরি বাগদাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ওপর কঠিন নির্যাতন চালায়।

৪৫১ হিজরি সনের শুরুতেও পরিস্থিতি এমনই ছিল। তবে সুলতান তুগরুল বেগ এরমধ্যে তার ভাই ইবরাহিমকে পরাভূত ও হত্যা করতে সক্ষম হন। এবার তিনি বাসাসিরির দফারফা করতে পূর্ণ প্রস্তুত। তিনি আরব আমির কুরাইশকে বার্তা পাঠিয়ে সতর্ক করেন এবং হুমকি প্রদান করেন। এরপর কুরাইশ ও তুগরুল বেগ বাসাসিরির বিরুদ্ধে একজোট হন। সুলতান তুগরুল বেগ এরপর বাগদাদ অভিমুখে রওনা হন। তুগরুল বেগের আগমন সংবাদ পেয়ে বাসাসিরি পালিয়ে যায়। তুগরুল বেগের বাগদাদে প্রবেশের দিনটি ছিল অত্যন্ত স্মরণীয় একটি দিন। তুগরুল বেগ খলিফাকে বাগদাদে নিয়ে আসার জন্য কয়েকটি রাজকীয় বাহন প্রেরণ করেন। খলিফা ফেরার পথে নাহরাওয়ানে পৌঁছলে সুলতান তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য বাগদাদ থেকে বের হয়ে আসেন এবং খলিফার তাঁবুতে প্রবেশ করে খলিফার সম্মুখভূমিতে সাতবার চুম্বন করেন।

এরপর সুলতান তুগরুল বেগ ওয়াসিতে পলায়নকারী বাসাসিরির পশ্চাদ্ধাবন করেন। সেখানে প্রচণ্ড যুদ্ধের পর বাসাসিরির অনুসারীরা পরাজিত হয়। কিছু সৈনিক বাসাসিরির পশ্চাদ্ধাবন করে তাকে হত্যা করে। এরপর তার কর্তিত মস্তক বাগদাদে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এভাবে এই বিরাট ফিতনার সমাপ্তি ঘটে।

মানজিকার্টের যুদ্ধ (The Battle of Manzikert)

[জিলকদ ৪৬৩ হিজরি]
[আগস্ট ১০৭১ খ্রিষ্টাব্দ]

কায়িম বি আমরিল্লাহর খিলাফত আমলেই ৪৫৫ হিজরি সনে তুগরুল বেগ ইন্তেকাল করেন। তার স্থলাভিষিক্ত হন সুলতান আযদুদ্দৌলা আবু শুজা আলপ আরসালান মুহাম্মাদ বিন দাউদ বিন মিকাইল বিন সেলজুক।

৪৬৩ হিজরি সনে (১০৭১ খ্রিষ্টাব্দে) বাইজান্টাইন সম্রাট চতুর্থ রোমানোস (Romanos IV Diogenes) ফরাসি, নরম্যান, জর্জিয়ান, আর্মেনীয়, বুলগেরিয়ান, তুর্কি পেচেন্‌গ ও ভাড়াটে কুমান সৈন্যদের সমন্বয়ে গঠিত বিশাল এক বাহিনী নিয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের চূড়ান্ত বিনাশের লক্ষ্যে রওনা হন। বাইজান্টাইন বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল দুই লক্ষের মতো। সম্রাট রোমানোস তার বাহিনীর বিজয়ের বিষয়ে এতটা সুনিশ্চিত ছিলেন যে, তিনি বিজয়ের পূর্বেই ইসলামি ভূখণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চল তার সেনাপতিদের জায়গির হিসেবে বণ্টন করে দেন এবং বাগদাদ যার ভাগে পড়েছে, সেই সেনাপতিকে বাগদাদে প্রবেশের পর আব্বাসি খলিফার সঙ্গে সদাচরণের নির্দেশ দেন! কিন্তু তাকদিরের হিসাব ছিল ভিন্ন। পবিত্র কুরআনের ভাষায়—

﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾

> আপনার জীবনের শপথ! প্রকৃতপক্ষে ওইসব লোক নিজেদের উন্মাদনায় বুঁদ হয়ে গিয়েছিল। [সুরা হিজর : ৭২]

সুলতান আলপ আরসালান মাত্র বিশ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে ৪৬৩ হিজরি সনের ২৬ জিলকদ (১০৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ আগস্ট) বুধবার (বর্তমান তুরস্কের অন্তর্গত) মানজিকার্টের নিকটবর্তী যাহওয়া নামক স্থানে তাদের মুখোমুখি হন। সুলতান বাইজান্টাইন বাহিনীর বিশালতা দেখে চিন্তিত হয়ে পড়েন। তখন মুসলিম বাহিনীর সদস্য ও বিশিষ্ট ফকিহ আবু নাসর মুহাম্মাদ বিন আবদুল মালিক বুখারি তাকে পরামর্শ দেন যে, শুক্রবার দিন দ্বিপ্রহরের পর যুদ্ধ শুরু করা হোক। কারণ, তখন ইসলামি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মসজিদগুলোতে খতিবগণ মুজাহিদ বাহিনীর জন্য দোয়া করতে থাকবে।

পরবর্তী শুক্রবার ২৮ জিলকদ (২৬ আগস্ট) জুমার নামাজ আদায় করার পর উভয় বাহিনী যুদ্ধ শুরু করে। প্রতিপক্ষের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় সুলতান আলপ আরসালান ঘোড়া হতে নেমে সিজদায় পড়ে যান এবং আপন মুখমণ্ডল মাটিতে ঘর্ষণ করে আল্লাহর দরবারে সাহায্য কামনা করে দোয়া করতে থাকেন।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম বাহিনীকে সাহায্য করেন। মুসলিম সৈন্যদের নিষ্ঠাপূর্ণ প্রচেষ্টায় বাইজান্টাইন বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। তাদের অসংখ্য সৈন্য নিহত হয়, বন্দিও হয় অনেক। সম্রাট রোমানোস নিজেও বন্দি হন। জনৈক রোমান ক্রীতদাস তাকে বন্দি করে। পরে অবশ্য বিশাল অঙ্কের মুক্তিপণ প্রদান এবং বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যে বন্দি সকল মুসলমানকে মুক্তিদানের বিনিময়ে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়।[১২২]

মানজিকার্টের যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে এশিয়া মাইনর অঞ্চলে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব ভেঙে পড়ে, সেলজুকদের সামনে অঞ্চলটি উন্মুক্ত হয়ে পড়ে এবং মুসলমানরা প্রথমবারের মতো এ অঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। উভয় পক্ষের জনবল ও অস্ত্রবলের অসম ব্যবধান, মুসলমানদের নিরঙ্কুশ বিজয় এবং বিজয়ের প্রভাব-ফলাফলের বিবেচনায় মানজিকার্টের যুদ্ধ ইতিহাসে 'দ্বিতীয় ইয়ারমুকের যুদ্ধ' নামে খ্যাত।

৪৬৩ হিজরি সনেই সেলজুকরা শিয়া উবায়দি সাম্রাজ্যের কাছ থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস ও রামলা নগরী পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়। পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে, উবায়দিরা ৩৫৮ হিজরি সনে (৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে) বাইতুল মুকাদ্দাস দখল করে নিয়েছিল।[১২৩]

আলপ আরসালানের পুরো শাসনামল ছিল সেলজুক সাম্রাজ্যের উন্নতি ও সমৃদ্ধির কাল। কেবল যুদ্ধক্ষেত্রেই নয়, বরং বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গনেও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছিল। সুলতান আলপ আরসালানই প্রথম বাগদাদে নিজামিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ৪৫৮ হিজরি সনে (১০৬৬ খ্রিষ্টাব্দে) এর প্রতিষ্ঠা সমাপ্ত হয়। নিজামিয়া মাদরাসায় সমকালীন ইরাকের বরং

---

১২২. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৮/৩৮৮-৩৮৯।

১২৩. প্রাগুক্ত, ৭/৩০৯ ও ইবনে কাছির দিমাশকি, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ১১/২৬৬-২৬৭।

সমগ্র মুসলিম বিশ্বের শাফেয়ি শায়খ আবু ইসহাক সিরাজি পাঠদান করতেন।

৪৬৫ হিজরি সনে (১০৭২ খ্রিষ্টাব্দে) আলপ আরসালান প্রায় দুই লক্ষ সৈন্য নিয়ে তুর্কিস্তান অভিমুখে রওনা হন এবং আমু দরিয়া পাড়ি দেন। কিন্তু এরইমধ্যে তার পরপারের ডাক এসে যায়। বর্ণিত আছে, মৃত্যুর পূর্বে তিনি বলেছিলেন—

> আমি যখনই কোনো শত্রুর উদ্দেশে কোনো যুদ্ধক্ষেত্রে রওনা হয়েছি, কেবল আল্লাহর ওপর ভরসা করেছি এবং তার কাছেই সাহায্যপ্রার্থনা করেছি। এবারের অভিযানে আমি একটি উঁচু টিলায় দাঁড়িয়ে আমার সৈন্যবাহিনীর দিকে তাকিয়ে বলেছিলাম, 'কে আছে আমার মোকাবিলা করার, আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার?! আমি তো আমার এই বাহিনী নিয়ে চীনের সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছতে পারব।' এখন আল্লাহ যা চেয়েছেন, তাই হতে যাচ্ছে।

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ইবনুল আছির আলপ আরসালান সম্পর্কে লিখেছেন—

> তিনি ছিলেন গুণী ও উদার, জ্ঞানী ও ন্যায়পরায়ণ। পরনিন্দা-কানকথা মোটেও শুনতে পারতেন না। তার শাসনামলে সেলজুক সাম্রাজ্যের পরিধি অনেক বৃদ্ধি পায় এবং দিগন্ত বিস্তৃত অঞ্চল তার বশীভূত হয়। তাকে প্রদত্ত 'সুলতানুল আলম' বা জগতের সুলতান অভিধা ছিল সত্যই তার শানে যথোপযুক্ত। মহৎ হৃদয় এই সুলতান দরিদ্রদের প্রতি অনুগ্রহপূর্ণ আচরণ করতেন, আল্লাহর দরবারে প্রচুর দোয়া করতেন। সৈন্যরা যেন জনসাধারণের সম্পদে অন্যায় হস্তক্ষেপ করতে না পারে, এ বিষয়ে তিনি কঠোর নজরদারি করতেন।[১২৪]

আলপ আরসালানের মৃত্যুর পর সেলজুক সালতানাতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তার পুত্র জালালুদ্দৌলা আবুল ফাতাহ মালিক শাহ। তার আমলেই ৪৬৭ হিজরি সনের ১৩ শাবান (১০৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ৩ এপ্রিল) মৃত্যুবরণ

---

[১২৪]. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৮/৩৯৪।

করেন খলিফা কায়িম বি আমরিল্লাহ। এ সময় খলিফার বয়স ছিল ছিয়াত্তর বছর। তিনি দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর খলিফা পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ঐতিহাসিক ইবনে কাছির রহ. খলিফা কায়িম বি আমরিল্লাহর আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন—

> তার পূর্বে অন্য কোনো খলিফা এত দীর্ঘ সময় খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেননি। তিনি সুভাষী, খোদাভীরু ও দুনিয়াবিরাগী ছিলেন। জনগণের প্রতি উদার ও বদান্য আচরণ করতেন। দ্বীন ও ধার্মিকতা, আকিদা ও ধর্মবিশ্বাস এবং রাষ্ট্রব্যবস্থাপনা—সর্ববিবেচনায় তিনি বনু আব্বাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ খলিফা ছিলেন। তিনি বাসাসিরির ফিতনার সম্মুখীন হন এবং এ কারণে তাকে রাজপ্রাসাদ, পরিবার-পরিজন ও মাতৃভূমি ছেড়ে নির্বাসিত হতে হয়। দীর্ঘ এক বছর তিনি হাদিসা আনা অঞ্চলে নির্বাসিত অবস্থায় জীবনযাপন করেন। এরপর আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে পুনরায় তিনি খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হন।[১২৫]

---

১২৫. ইবনে কাছির দিমাশকি, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ১২/১০৫।

মুকতাদি বি আমরিল্লাহ আবুল কাসিম আবদুল্লাহ বিন যাখিরুদ্দিন আবুল কাসিম বিন কায়িম বিন কাদির

[শাবান ৪৬৭ হিজরি—মুহাররম ৪৮৭ হিজরি]

[এপ্রিল ১০৭৫ খ্রিষ্টাব্দ—ফেব্রুয়ারি ১০৯৪ খ্রিষ্টাব্দ]

দ্বাদশ আব্বাসি খলিফা মুসতাইন, ষোড়শ আব্বাসি খলিফা মুতাযিদ ও ২৫ নং আব্বাসি খলিফা কাদির বিল্লাহর ন্যায় ২৭ নং আব্বাসি খলিফা মুকতাদি বি আমরিল্লাহর পিতাও খলিফা ছিলেন না। তার পিতা আমির যাখিরুদ্দিন আবুল কাসিম মুহাম্মাদ নিজ পিতা খলিফা কায়িম বি আমরিল্লাহর জীবদ্দশায় ইন্তেকাল করেন। মুকতাদি বি আমরিল্লাহ ৪৪৮ হিজরি সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৪৬৭ হিজরি সনে উনিশ বছর বয়সে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

মুকতাদি জন্মের পূর্ব থেকেই এতিম ছিলেন। তিনি তার পিতামহ আল-কায়িম বি আমরিল্লাহর যথার্থ তত্ত্বাবধানে তারই গৃহে প্রতিপালিত হন। তিনি বীর-সাহসী ছিলেন। তার শাসনকাল ছিল অত্যন্ত বরকতময়। সম্পদের প্রাচুর্য ছিল। খিলাফত ও খলিফা সকলের কাছে সম্মানের পাত্র ছিল। বিভিন্ন অঞ্চলের সুলতান ও শাসকগণ খলিফাকে শ্রদ্ধা করত এবং তার সম্মুখে বিনীত আচরণ করত। মক্কা-মদিনা, বাইতুল মুকাদ্দাস ও পুরো শাম অঞ্চলে খলিফার নামে খুতবা পাঠ করা হতো। তার আমলে মুসলিম অভিযাত্রীগণ শত্রুর হাত থেকে এডেসা ও এন্টিয়ক অঞ্চল পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়। বাগদাদ ও অন্যান্য নগরী পুনঃআবাদ হয়। খলিফা মুকতাদিরের আমলে উজির ও কাজিগণ ছিলেন তৎকালীন সমাজের শ্রেষ্ঠতম মানুষ। তিনি তার খিলাফতকালের শুরুর দিকেই দুশ্চরিত্রা নারীদেরকে বাগদাদ থেকে বের করে দেন। খলিফা বাগদাদ থেকে পানশালা, পতিতালয় ও গান-বাদ্যের আসর উচ্ছেদ করেন।

তৎকালীন সেলজুক সুলতান মালিক শাহও ছিলেন ন্যায়পরায়ণ ও নির্ভীক

সুলতান। তিনি যে অঞ্চল অভিমুখে অভিযান পরিচালনা করতেন, তা-ই জয় করতেন। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের শাসকগণ তার বশীভূত হয়। মালিক শাহর আমলে সেলজুক রাষ্ট্র পূর্বে চীন হতে পশ্চিমে শামের শেষ প্রান্তে মর্মর সাগর পর্যন্ত এবং উত্তরে ইসলামি ভূখণ্ডের শেষ সীমা হতে দক্ষিণে ইয়ামেনের শেষ সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এই সুবিশাল ইসলামি ভূখণ্ডের সর্বত্র জুমার খুতবায় তার নাম উচ্চারিত হতো। বাইজান্টাইন সম্রাট তার কাছে নিয়মিত জিজিয়া প্রেরণ করতেন। মালিক শাহর এই সাম্রাজ্যই ইতিহাসে 'বৃহত্তর সেলজুক সাম্রাজ্য' নামে খ্যাত।

এ সময় বাগদাদের উজির ছিলেন নিজামুল মুলক কিওয়ামুদ্দিন আবু আলি হাসান বিন আলি বিন ইসহাক রাযিউ আমিরিল মুমিনিন। তিনি সমকালের শ্রেষ্ঠতম আলিমগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং বিদ্যানুরাগী ছিলেন। তার মজলিস সর্বদা কারি, ফকিহ, শাস্ত্রজ্ঞ ও বুজুর্গদের পদচারণায় মুখরিত থাকত। নিজামুল মুলক মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে এক অসাধারণ খেদমতের আঞ্জাম দেন। তিনি বাগদাদ, বলখ, নিশাপুর, হেরাত, ইস্পাহান, বসরা, মার্ভ, আমিল ও মসুলসহ সেলজুক সাম্রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় অনেকগুলো মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তার প্রতি সম্বন্ধিত হয়ে মাদরাসাগুলো 'নিজামিয়া মাদরাসা' নামে খ্যাতি লাভ করে। জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অংশ হিসেবে প্রতিটি মাদরাসায় শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা ও আবাসনের সুলভ ব্যবস্থা ছিল। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে মাসিক ভাতাও প্রদান করা হতো। উজির নিজামুল মুলক মাদরাসাগুলোতে অধ্যাপনার জন্য ইসলামি বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে যুগশ্রেষ্ঠ আলিম ও বিদ্বানদের খুঁজে নিয়ে আসতেন। হাদিস, ফিকহসহ বিভিন্ন শাস্ত্রের খ্যাতনামা আলিমগণ নিজামিয়া মাদরাসাসমূহে পাঠদান করতেন।[১২৬] তৎকালে ইসলামি ভূখণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে ফিতনারূপে ছড়িয়ে পড়া শিয়া মতাদর্শ ও বাতিনি চিন্তাধারার বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিরোধে এসব প্রতিষ্ঠানের অনস্বীকার্য ভূমিকা ছিল।[১২৭]

মহান খলিফা, ন্যায়পরায়ণ সুলতান ও বিদ্যানুরাগী উজিরের এই হৃদ্যতাপূর্ণ সহাবস্থান স্বাভাবিকভাবেই স্বার্থান্বেষী ও কুচক্রী মহলের পছন্দ

---

১২৬. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৮/৪৮০-৪৮১।

১২৭. নিজামিয়া মাদরাসা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন : আলি সাল্লাবি, *দাওলাতুস সালাজিকা*, পৃষ্ঠা : ২৭৮-৩২৫।

হওয়ার কথা নয়। তাই তারা সুলতান ও উজিরের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টিতে তৎপর হয়। তাদের প্ররোচনায় সুলতান মালিক শাহ উজির কিওয়ামুদ্দিনের প্রতি রুষ্ট হন।

উনত্রিশ বছর উজিরের দায়িত্ব পালন করার পর কিওয়ামুদ্দিন ৪৮৫ হিজরি সনের ১০ রমজান (১০৯২ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ অক্টোবর) ইসমাইলি ফিরকার হাশাশিন বাহিনীর জনৈক আততায়ীর হাতে নিহত হন। কুদরতের কী বিস্ময়কর আচরণ! এর মাসখানেক পর ১৫ শাওয়াল (১৮ নভেম্বর) সুলতান মালিক শাহও ইন্তেকাল করেন। তাদের দুজনের মৃত্যুতে সেলজুক পরিবারের সৌভাগ্য-ধারারও যেন সমাপ্তি ঘটে। সেলজুক পরিবারে শুরু হয় দ্বন্দ্ব, অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং তির-তরবারির অবাধ ব্যবহার।[১২৮]

---

১২৮. পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সেলজুক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রাথমিককালেই সেলজুক পরিবারের তৎকালীন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে নিজেদের অধিকৃত সুবিস্তৃত রাষ্ট্রকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে পরিবারের প্রবীণ সদস্যদের মাঝে নেতৃত্ব বন্টন করে দেয় এবং তুগরুল বেগকে সকলের প্রধান নির্বাচিত করে। তখন থেকে বিভিন্ন অঞ্চলের শাসনকর্তাগণ ইরাকে অবস্থানকারী মূল সুলতানের প্রতি আনুগত্য বজায় রেখে আপন আপন অঞ্চল শাসন করত। কিন্তু তৃতীয় সেলজুক সুলতান মালিক শাহর মৃত্যুর পর সেলজুক রাজপরিবারের সদস্যদের মাঝে শুরু হয় ক্ষমতার অস্থির প্রতিযোগিতা। মূল সুলতান পদ নিয়ে যেমন মালিক শাহর পুত্রদের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হয়, তেমনই বিভিন্ন অঞ্চলের শাসকবর্গও একে অপরের এলাকা দখল করার এক অনিঃশেষ প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে। সুবিশাল সেলজুক রাষ্ট্র বিভক্ত হয় পাঁচ ভাগে। বরং প্রতিটি অংশের মধ্যেও সৃষ্টি হয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরও অনেক রাজ্য! ফলে কদিন পূর্বের অপ্রতিরোধ্য শক্তি সেলজুক সাম্রাজ্য হিজরি পঞ্চম শতাব্দী শেষ না হতেই পরিণত হয় বিভক্ত ও ছিন্নভিন্ন শক্তিতে।
হিজরি পঞ্চম শতকের শেষদিকে (খ্রিষ্টীয় একাদশ শতকের শেষে) সেলজুক সাম্রাজ্য নিম্নে উল্লেখিত অবস্থায় বিভক্ত ছিল।

১. বৃহত্তর সেলজুক রাষ্ট্র (The Great Seljuq Empire)। আরবি ইরাকসহ সুবিস্তৃত অঞ্চল এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। আব্বাসি খিলাফতের ওপর এই সেলজুক রাষ্ট্রেরই প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ছিল। বৃহত্তর সেলজুক রাষ্ট্রের রাজপরিবারে মোটামুটি পর্যায়ের ঐক্য বজায় থাকলেও গৃহসংঘাত থেকে পুরোপুরি মুক্ত ছিল না। প্রথম মালিক শাহর ইন্তেকালের পর বৃহত্তর সেলজুক রাষ্ট্রের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তার জ্যেষ্ঠ পুত্র বারকিয়ারুক।
২. কিরমানি সেলজুক রাষ্ট্র (Kermani Seljuqs)। এর অবস্থান ছিল দক্ষিণ পারস্য ও পাকিস্তান অঞ্চলে। কিরমানি সেলজুক রাষ্ট্রের ক্ষমতা ছিল কারুত বেগ বিন দাউদ বিন মিকাইল বিন সেলজুকের বংশধরদের হাতে। কারুত ছিলেন মহান সেনাপতি আলপ আরসালানের সহোদর।
৩. পারসিক সেলজুক রাষ্ট্র। উত্তর ইরাক তথা আজমি ইরাক, রায়, হামাদান ও কুর্দিস্তানজুড়ে ছিল এ রাষ্ট্রের বিস্তৃতি। =

সুলতান মালিক শাহর চার পুত্র ছিল। তাদের নাম যথাক্রমে বারকিয়ারুক, মুহাম্মাদ, সানজার ও মাহমুদ। মালিক শাহর মৃত্যুর পর যদিও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে বারকিয়ারুক সালতানাতের দাবিদার ছিলেন; কিন্তু কনিষ্ঠ পুত্র মাহমুদ তার মা তুরকান খাতুন ও উজির তাজুল মুলক সিরাজির সহায়তায় সুলতান পদে অধিষ্ঠিত হন। তখন মাহমুদের বয়স ছিল মাত্র চার বছর! বারকিয়ারুক অবশ্য উপর্যুপরি চেষ্টা চালিয়ে কিছুদিনের মধ্যেই নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। ৪৮৭ হিজরি সনের ১৪ মুহাররম (১০৯৪ খ্রিষ্টাব্দের ৩ ফেব্রুয়ারি) খলিফা মুকতাদি বি আমরিল্লাহ বারকিয়ারুককে সেলজুক সুলতান হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন। এর পরদিন ১৫ মুহাররম (৪ ফেব্রুয়ারি) খলিফা মুকতাদি বি আমরিল্লাহ উনচল্লিশ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

---

৪. শামীয় সেলজুক রাষ্ট্র। এটি দামেশকের সেলজুক রাষ্ট্র নামেও পরিচিত। আলপ আরসালানের পুত্র তুতুশের বংশধরগণ শামের সেলজুক রাষ্ট্রের হাল ধরেছিল। এখানেও রাজপরিবারের পারস্পরিক সংঘাত শামকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত করে রেখেছিল।

৫. রোমান সেলজুক রাষ্ট্র (Sultanate of Rum)। এর অবস্থান ছিল এশিয়া মাইনর (আনাতোলিয়া) অঞ্চলে। কুতুলমিশ বিন ইসরাইল বিন সেলজুকের বংশধরগণ রোমান সেলজুক রাষ্ট্র পরিচালনা করত।

উল্লেখ্য, ফুরাত ও দজলার নিম্নভূমিসহ ইরাকের সুবিস্তৃত সমতলভূমিকে ভৌগোলিকভাবে আরবি ইরাক (Arab Iraq) বলা হতো। আর এর পূর্বে অবস্থিত ইস্পাহান, রায়, কাজবিন, কির্মানশাহ-সহ বিস্তৃত পাহাড়িভূমিকে বলা হতো আজমি ইরাক (Persian Iraq)। জগ্রোস পর্বতমালাকে উভয় অঞ্চলের বিভক্তি রেখা বিবেচনা করা যায়। আরবি ইরাকের সিংহভাগ বর্তমানে আধুনিক ইরাক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত আর আজমি ইরাক বর্তমান ইরান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত।

যেহেতু বক্ষ্যমাণ অধ্যায়ে আব্বাসি খিলাফতের আলোচনা করা হচ্ছে, তাই সামনে আব্বাসি খিলাফতের ওপর প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাকারী বৃহত্তর সেলজুক রাষ্ট্রের আলোচনাই কেবল আসবে।

আল-মুসতাযহির বিল্লাহ আবুল আব্বাস আহমাদ বিন মুকতাদি বিন যাখিরুদ্দিন বিন কায়িম বি আমরিল্লাহ

[মুহাররম ৪৮৭ হিজরি—রবিউস সানি ৫১২ হিজরি]
[ফেব্রুয়ারি ১০৯৪ খ্রিষ্টাব্দ—আগস্ট ১১১৮ খ্রিষ্টাব্দ]

মুসতাযহির বিল্লাহ ৪৭০ হিজরি সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং পিতা মুকতাদি বি আমরিল্লাহর মৃত্যুর পর ৪৮৭ হিজরি সনে সতেরো বছর বয়সে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

মুসতাযহির বিল্লাহ সচ্চরিত্র ও কোমল স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। তিনি কল্যাণকর্মে উদ্যমী ও অগ্রগামী ছিলেন। তার শাসনামল জনসাধারণের জন্য শান্তি ও আনন্দের কাল হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল।

খলিফা মুসতাযহির বিল্লাহর শাসনামলে ইরাকের সুলতান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন বারকিয়ারুক বিন মালিক শাহ। বারকিয়ারুক আপন সহকর্মী ও অধীনস্থ নির্বাচনে প্রজ্ঞা ও দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেননি। এ সময় তার চাচা দামেশকের অধিপতি তুতুশ বিন আলপ আরসালান নিজেকে ইরাকের সুলতান দাবি করেন। একে কেন্দ্র করে উভয়ের মধ্যে বেশ কয়েকবার যুদ্ধের ঘটনা ঘটে। অবশেষে ৪৮৭ হিজরি সনে (১০৯৪ খ্রিষ্টাব্দে) তুতুশ নিহত হওয়ার মধ্য দিয়ে এ সংঘাতের সমাপ্তি ঘটে এবং হাতছাড়া হতে যাওয়া বিভিন্ন অঞ্চলের কর্তৃত্ব আবারও বারকিয়ারুকের হাতে ফিরে আসে।

কিছুদিন পর বারকিয়ারুকের ভাই মুহাম্মাদও নিজেকে সুলতান দাবি করেন। একে কেন্দ্র করে দুই ভাইয়ের মধ্যে বরং পুরো সেলজুক পরিবারের মধ্যে এক দীর্ঘ ও রক্তক্ষয়ী সংঘাতের সূচনা হয়। বরং বলা ভালো—দুই সেলজুক ভাইয়ের ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের প্রভাবে সমগ্র মুসলিম উম্মাহর জীবনে এক দীর্ঘমেয়াদি অকল্যাণের সূচনা হয়। ৪৯২ হিজরি সন হতে ৪৯৭ হিজরি সন পর্যন্ত একটানা পাঁচ বছর উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ চলতে

থাকে। সুযোগ পেয়ে ইউরোপিয়ান ক্রুসেড শক্তি নিজেদের গুহা ছেড়ে (তাদের ভাষায় বাইতুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে) ইসলামি ভূখণ্ডে হামলা চালাতে অগ্রসর হয়। বাগদাদের সুলতান তখন ব্যস্ত আপন ভাইয়ের সঙ্গে ভ্রাতৃঘাতী লড়াইয়ে!

পরবর্তী সময়ে অবশ্য ক্ষমতাবিভক্তির শর্তে দুই ভাইয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয় এবং সিদ্ধান্ত হয় যে, প্রত্যেকে আপন আপন অধিকৃত অঞ্চল শাসন করবেন। এই সন্ধিচুক্তির কিছুদিন পর ৪৯৮ হিজরি সনের রবিউস সানি (১১০৫ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি) মাসে বারকিয়ারুক ইন্তেকাল করেন। ইন্তেকালের পূর্বে তিনি তার পুত্র রুকনুদ্দৌলা দ্বিতীয় মালিক শাহকে পরবর্তী সুলতান ঘোষণা করে গিয়েছিলেন। কিন্তু বারকিয়ারুকের ভাই মুহাম্মাদ বারকিয়ারুকের মৃত্যুসংবাদ জানতে পেরে দ্রুত বাগদাদে ছুটে আসেন এবং সালতানাতের কর্তৃত্ব নিজের হাতে তুলে নেন।

সুলতান মুহাম্মাদ বিন মালিক শাহ ন্যায়পরায়ণ,-সচ্চরিত্র ও বীর-যোদ্ধা ছিলেন। তবে উজির ও গভর্নর নির্বাচনে দুর্ভাগ্যের শিকার হওয়ায় তার পুরো শাসনামলই গোলযোগ ও অস্থিরতায় অতিবাহিত হয়। মুহাম্মাদ বিন মালিক শাহ ৫১১ হিজরি সনে (১১১৮ খ্রিষ্টাব্দে) ইন্তেকাল করেন। তার মৃত্যুর পর সুলতান নির্বাচন করা হয় তার পুত্র মুগিছুদ দুনিয়া ওয়াদ দ্বীন আবুল কাসিম মাহমুদ বিন মুহাম্মাদ বিন মালিক শাহকে। মাহমুদ সুলতান পদ লাভের চার মাস পর ৫১২ হিজরি সনের রবিউস সানি (১১১৮ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট) মাসে খলিফা মুসতাযহির বিল্লাহ বিয়াল্লিশ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

২৯ নং আব্বাসি খলিফা

আল-মুসতারশিদ বিল্লাহ আবু মানসুর ফজল বিন মুসতাযহির বিল্লাহ বিন মুকতাদি বিন যাখিরুদ্দিন

[রবিউস সানি ৫১২ হিজরি—জিলকদ ৫২৯ হিজরি]
[আগস্ট ১১১৮ খ্রিষ্টাব্দ—আগস্ট ১১৩৫ খ্রিষ্টাব্দ]

মুসতারশিদ বিল্লাহ ৪৮৫ হিজরি সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং তার পিতার ইন্তেকালের পর ৫১২ হিজরি সনের রবিউস সানি মাসে সাতাশ বছর বয়সে খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হন।

মুসতারশিদ বিল্লাহ বিচক্ষণ, দুঃসাহসী, উচ্চাভিলাষী, সুভাষী ও সুহস্তলিপির অধিকারী ছিলেন। তিনি ফকিহ আলিম ছিলেন। হাদিসশাস্ত্রের বিখ্যাত ইমাম ইবনুস সালাহ রহ. শাফিয়ি মাজহাবের শ্রেষ্ঠতম আলিমদের তালিকায় তার নাম উল্লেখ করেছেন। ইবনুস সালাহ-এর ন্যায় একজন বিদগ্ধ শাস্ত্রজ্ঞের এই স্বীকৃতিকে নিঃসন্দেহে খলিফা মুসতারশিদ বিল্লাহর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য করা যায়। ঐতিহাসিক ইবনুল আছির তার সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—তিনি তার পূর্বপুরুষের গৌরব ও ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু তাকদির তার অনুকূলে ছিল না।

তার খিলাফত আমলের প্রথমদিকে ইরাকের সুলতান ছিলেন সুলতান মাহমুদ বিন মুহাম্মাদ বিন মালিক শাহ। কিন্তু (সুলতান মাহমুদের চাচা) খোরাসান ও ট্রান্সঅক্সিয়ানাভুক্ত অন্যান্য অঞ্চলের শাসক সানজার বিন মালিক শাহ এতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি ইরাকের সুলতান হওয়ার অভিপ্রায়ে ইরাক অভিমুখে রওনা হলে সুলতান মাহমুদ তার বাহিনী নিয়ে প্রতিরোধে অগ্রসর হন। রায় অঞ্চলে উভয়ের বাহিনী মুখোমুখি হয় এবং চাচা সানজার বিজয়ী হন। ফলে মিম্বরসমূহে সুলতান হিসেবে তার নাম পাঠ করা হতে থাকে। সানজার তখন আহওয়াজে বসবাস করতেন। পরবর্তী সময়ে উভয়ের মধ্যে সন্ধিচুক্তি হয় এবং সিদ্ধান্ত হয় যে, খুতবায়

চাচার নামের পর মাহমুদের নামও পাঠ করা হবে। চাচা সানজার রায় ব্যতীত অন্য যেসব অঞ্চল মাহমুদের কাছ থেকে অধিকার করেছিলেন, সন্ধিচুক্তির পর সেগুলো মাহমুদকে ফিরিয়ে দেন। এরপর থেকে সুলতান মাহমুদ সন্ধিচুক্তির শর্ত অনুসারে চাচা সানজারের অধীনস্থ হিসেবে ইরাক শাসন করতে থাকেন।

৫১৪ হিজরি সনে মাহমুদের ভাই মাসউদ বিন মুহাম্মাদও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। মাসউদ তখন মসুল ও আজারবাইজান অঞ্চলের প্রশাসক ছিলেন। উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হলে মাসউদের বাহিনী পরাজিত হয়। কিছুদিন পর সুলতান মাহমুদ তার ভাইয়ের সঙ্গেও সন্ধি করেন।

সেলজুক পরিবারের নেতৃস্থানীয় সদস্যদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাত খলিফা মুসতারশিদকে পরিস্থিতি নিয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে। তিনি এবার সুলতানদের দাপটে প্রথাগত পদে পরিণত হওয়া খিলাফত পদের হারানো প্রভাব ও ক্ষমতা ফিরিয়ে আনতে তৎপর হন। বিরোধীদের মোকাবিলা করার জন্য তিনি নিজেই সেনাবাহিনীর পরিচালন-দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দীর্ঘদিন যাবৎ আব্বাসি খিলাফতের ইতিহাসে এর কোনো দৃষ্টান্ত ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই খলিফার এই তৎপরতা সেলজুক শাসকদের পছন্দ হওয়ার কথা নয়। তারা বুঝতে পারছিল যে, এর মাধ্যমে তাদের কর্মক্ষেত্র ও ভূমিকা সংকুচিত হয়ে পড়বে এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি হুমকির মুখে পড়বে। সুলতান মাহমুদ আবহাওয়াজনিত অসুস্থতার কারণে বাগদাদে বসবাস করতেন না। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এবার বাগদাদে ফিরে আসার মনস্থ করেন। খলিফা সর্বোচ্চ শক্তি ব্যয় করে তাকে বাধা দিতে চেষ্টা করলেও যখন দেখতে পান যে, নাছোড়বান্দা সুলতানকে কিছুতেই নিবৃত্ত করা যাবে না, তখন তিনি সমঝোতার পথকেই প্রাধান্য দেন। ৫২১ হিজরি সনে মাহমুদ বাগদাদে প্রবেশ করেন এবং কয়েক মাস বাগদাদে অবস্থান করেন। অবশ্য পরে খলিফা কর্তৃক খেলাত (সম্মানসূচক পোশাক) ও প্রচুর সংখ্যক রাজকীয় বাহন প্রাপ্ত হয়ে তিনি বাগদাদ ত্যাগ করে হামাদানে চলে যান।

৫২৪ হিজরি সনে সুলতান মাহমুদ ইসমাইলি হাশাশিন সম্প্রদায়ের নেতা হাসান বিন সাবাহর কাছ থেকে আলমুত কেল্লা অধিকার করতে সক্ষম হন।[১২৯]

---

১২৯. পেছনে 'শিয়া সম্প্রদায়ের পরিচিতি' শিরোনামের পরিচ্ছেদে ইসমাঈলি ফিরকার প্রধান শাখা নিযারিয়া ফিরকার কথা আলোচনা করা হয়েছে। নিযারিয়া ফিরকার পুরোধা নিযার আল-মুসতাফা বন্দি অবস্থায় আলেকজান্দ্রিয়ায় মৃত্যুবরণ করার পর তার পুত্র আল-হাদি পালিয়ে ইসমাইলি ধর্মপ্রচারক হাসান বিন সাবাহর কাছে আশ্রয় নেয়। এটি ৪৮৮ হিজরি সনের (১০৯৫ খ্রিষ্টাব্দের) ঘটনা। হাসান সাবাহ এর পূর্ব থেকেই আলমুত দুর্গকে কেন্দ্র করে ইসমাইলি মতাদর্শ প্রচারণার ঘাঁটি গড়ে তুলেছিল। হাসান সাবাহ এবার আল-হাদিকে সঙ্গে নিয়ে (মুসতালিয়া ফিরকার অধিকারে থাকা) উবায়দি সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার এবং ইসমাইলি মতাদর্শের বিস্তারে এক সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করে। তার এই আন্দোলনের অনুসারীরাই ফিদায়িন ও হাশাশিন নামে পরিচিত ছিল। যেহেতু হাসান সাবাহ তার অনুসারীদের নেশাগ্রস্ত করে আত্মঘাতী হামলায় প্রাণ উৎসর্গ করার জন্য গড়ে তুলত, তাই তাদেরকে হাশাশিন (হাশিশের নেশায় আক্রান্ত) ও ফিদায়িন (আত্মোৎসর্গকারী) বলা হতো।

হাশাশিন গোষ্ঠীর উদ্ভাবক হাসান সাবাহ ছিল শিয়া মতাদর্শের প্রতিষ্ঠাতা আবদুল্লাহ বিন সাবার বংশধর। সে প্রথমে ৪৮৩ হিজরি সনে (১০৯০ খ্রিষ্টাব্দে) পারস্যের দুর্ভেদ্য পাহাড়ি অঞ্চল 'মাযানদারান'-এ অবস্থিত আলমুত দুর্গ (বর্তমান ইরানের কাজবিন নগরী হতে ১০২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত একটি পাহাড়ি এলাকা) অধিকার করে সেখানে তার মতাদর্শের প্রশিক্ষণকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে। এরপর সে আশেপাশের আরও চল্লিশটি দুর্গ দখল করে সেলজুক সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে হাশাশিন রাজ্য গড়ে তোলে। হাশাশিনরা ধীরে ধীরে তাদের রাজ্য বিস্তৃত করে এবং পারস্যের অভ্যন্তরেই মাযানদারানের পাশাপাশি জিবাল ও কুহিস্তানে হাশাশিন রাজ্যের আরও দুটি প্রদেশ গড়ে তোলে। পারস্যের বাইরে শামের নাসিরিয়া পার্বত্যাঞ্চলেও তারা আরেকটি হাশাশিন প্রদেশ প্রতিষ্ঠা করে। ৫১৮ হিজরি সনে (১১24 খ্রিষ্টাব্দে) হাসান সাবাহর মৃত্যুর পর শামের হাশাশিন রাজ্য পারস্যের হাশাশিন রাজ্যের কর্তৃত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের অস্তিত্ব লাভ করে।

যেহেতু হাশাশিনদের মূল লক্ষ্য ছিল সারা বিশ্বে ইসমাইলি মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করা এবং উবায়দি রাষ্ট্র পুনরুদ্ধার করে পুরো বিশ্বকে উবায়দি শাসনের অধীনে নিয়ে আসা, তাই তারা মুসলিম বিশ্বকে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দিক থেকে নেতৃত্বশূন্য করার লক্ষ্যে গুপ্তহত্যা ও আত্মঘাতী হামলার মাধ্যমে সমকালীন ইসলামি বিশ্বের বিভিন্ন ইসলামি শক্তি যথা আব্বাসি খিলাফত, শিয়া উবায়দি সাম্রাজ্য, সেলজুক, খোয়ারিজমি, জিনকি ও আইয়ুবি রাষ্ট্রের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। তারা আব্বাসি খলিফা মুসতারশিদ ও রাশিদ, বাগদাদের সেলজুক উজির কিওয়ামুদ্দিন নিজামুল মুলক, সুলতান মুহাম্মাদ ঘুরি, মসুলের প্রশাসক মওদুদ বিন তুনতেকিন ও আক সুনকুর আল-বুরসুকি, হিমসের আমির জানাহুদ্দৌলা হুসাইন বিন মালাইব-সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও আলিমকে হত্যা করে এবং=

৫২৫ হিজরি সনে সুলতান মাহমুদ বিন মুহাম্মাদ মৃত্যুবরণ করেন। এরপর বাগদাদের পরিস্থিতি অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে। সুলতান মাহমুদ যদিও মৃত্যুর পূর্বে তার শিশুপুত্র দাউদকে পরবর্তী সুলতান ঘোষণা করে গিয়েছিলেন; কিন্তু মাহমুদের ভাই মাসউদ, দ্বিতীয় তুগরুল বেগ ও সেলজুক শাহ এবং মাহমুদের চাচা সানজার ইরাকের সালতানাত লাভে অভিলাষী হয়ে ওঠেন। একে কেন্দ্র করে বিবাদমান পক্ষগুলোর মধ্যে অব্যাহত সংঘাত ও যুদ্ধ চলতে থাকে এবং সুলতান পদেও পালাবদল চলতে থাকে। সুলতান মাহমুদের মৃত্যু-পরবর্তী তিন বছরে পর্যায়ক্রমে ইরাকের সুলতান পদে অধিষ্ঠিত হন দাউদ বিন মাহমুদ, মাসউদ বিন মুহাম্মাদ, তুগরুল বিন মুহাম্মাদ, এরপর আবার মাসউদ এবং তারপর আবার তুগরুল।[১৩০] অবশেষে ৫২৯ হিজরি সনের শুরুতে সুলতান তুগরুল ইন্তেকাল করার পর সুলতান মাসউদ সালতানাতের একচ্ছত্র অধিপতি হতে সক্ষম হন। তিনি গিয়াছুদ দুনিয়া ওয়াদ দ্বীন উপাধি ধারণ করেন।

=সেলজুক সুলতান মালিক শাহ, জিনকি সুলতান নুরুদ্দিন মাহমুদ ও আইয়ুবি সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবিকে হত্যা করার জন্য একাধিকবার চেষ্টা চালায়।

বাগদাদের সেলজুক সুলতানগণসহ বিভিন্ন ইসলামি রাষ্ট্রের শাসকগণ একাধিকবার হাশাশিনদের নিপাত করার উদ্দেশ্যে অভিযান চালালেও কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জিত হয়নি। অবশেষে খোয়ারিজম রাষ্ট্রের শেষ শাসক জালালুদ্দিন শাহ (চেঙ্গিস খানের আগ্রাসন চলাকালীন শাসক আলাউদ্দিন মুহাম্মাদের পুত্র) আলমুত বাদে হাশাশিনদের সবকটি পারসিক দুর্গ ধ্বংস করতে সক্ষম হন। পরবর্তী সময়ে জালালুদ্দিন শাহ নিরুদ্দেশ হয়ে গেলে হাশাশিনরা পুনরায় সংঘটিত হওয়ার চেষ্টা করে। তখন তাতার সম্রাট হালাকু খান তাদের ওপর চূড়ান্ত আঘাত হানেন এবং ৬৫৪ হিজরি সনে (১২৫৬ খ্রিষ্টাব্দে) পারস্যে হাশাশিনদের পুরোপুরি নিপাত করেন। এ সময় তৎকালীন হাশাশিন শাসক রুকনুদ্দিন খুরশাহের উজির নাসিরুদ্দিন তুসি হালাকু খানের চাটুকারিতা করে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয় এবং পরবর্তীকালে হালাকু খানের উপদেষ্টা উজিরে পরিণত হয়। এই নাসিরুদ্দিন তুসিই পরবর্তী সময়ে হালাকু খানকে বাগদাদে হামলা করতে প্ররোচিত করে। বাগদাদপতন ছিল দুই শিয়া উজির (আব্বাসি খলিফার উজির ইবনুল আলকামি ও হালাকু খানের উজির নাসিরুদ্দিন তুসি)-এর কূটকৌশলের ফসল।

শামের হাশাশিন রাজ্য এরপরও টিকে ছিল। বিখ্যাত আইয়ুবি সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রহ. একবার শামের হাশাশিন রাজ্য অবরোধ করলেও শেষ পর্যন্ত অবরোধ প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। অবশেষে মামলুক সুলতান রুকনুদ্দিন বাইবার্সের হাতে ৬৬৯ হিজরি সনে (১২৭০-৭১ খ্রিষ্টাব্দে) শামেও হাশাশিনদের পতন ঘটে।

১৩০. এ সময়কার অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন মাকতাবাতুল হাসান থেকে প্রকাশিত ড. রাগিব সারজানির *ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস*, ২/২৪৩-২৭৭।

এ সময় খলিফা মুসতারশিদ আরও একবার শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে খিলাফতের হারানো প্রতিপত্তি পুনরুদ্ধার এবং সেলজুক প্রভাব হতে মুক্তিলাভের চেষ্টা চালান। একে কেন্দ্র করে সুলতান মাসউদের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব ও দূরত্ব সৃষ্টি হয়। খলিফা বাগদাদের মিম্বরসমূহে জুমার খুতবা হতে মাসউদের নাম বাদ দেওয়ার নির্দেশ জারি করেন। এরপর খলিফা বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়ে মাসউদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অগ্রসর হন। কিন্তু নির্মম বাস্তবতা হলো—খলিফার পতাকাতলে যারা যুদ্ধ করতে সমবেত হয়েছিল, তারা কোনো এক ও অভিন্ন (বংশ) পরিচয়ে আবদ্ধ ছিল না। আর এরূপ না হলে লড়াইয়ের সঙ্গিন মুহূর্তে সাধারণত নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় না। এ কারণেই উভয় বাহিনী মুখোমুখি হতেই খলিফার পক্ষে যুদ্ধ করতে আসা তুর্কি সৈন্যদের অনেকেই শিবির বদলে সুলতান মাসউদের পক্ষে চলে যায়। স্বাভাবিকভাবেই খলিফার বাহিনী যুদ্ধে পরাজিত হয়। খলিফা নিজে অটল-অবিচল থেকে যুদ্ধ করতে করতে একসময় প্রতিপক্ষের হাতে বন্দি হন। বন্দি খলিফা ৫২৯ হিজরি সনের ১৭ জিলকদ (১১৩৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ আগস্ট) বাতিনি গুপ্তঘাতকদের হাতে নিহত হন।[১৩১] এ সময় খলিফার বয়স ছিল পঁয়তাল্লিশ বছর।

আর-রাশিদ বিল্লাহ্ আবু জাফর মানসুর বিন মুসতারশিদ বিন মুসতাযহির বিন মুকতাদি

[জিলকদ ৫২৯ হিজরি—জিলকদ ৫৩০ হিজরি]
[আগস্ট ১১৩৫ খ্রিষ্টাব্দ—আগস্ট ১১৩৬ খ্রিষ্টাব্দ]

রাশিদ বিল্লাহ ৫০২ হিজরি সনে জন্মগ্রহণ করেন। ৫২৯ হিজরির জিলকদ মাসে তার পিতাকে হত্যা করা হলে সাতাশ বছর বয়সে তিনি খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হন। তার পিতা মুসতারশিদ পূর্বেই তাকে ওলিয়ে আহদ বা ভাবী খলিফা ঘোষণা করে গিয়েছিলেন।

খলিফা হয়েই তিনি তার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের মনস্থ করেন এবং সরাসরি সুলতান মাসউদের প্রতিপক্ষ হিসেবে আবির্ভূত হন। কিন্তু সুলতান মাসউদ বিন মুহাম্মাদ বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করে তার ওপর চাপ সৃষ্টি করেন। ফলে দায়িত্ব গ্রহণের মাত্র এগারো মাস এগারো দিন পর ৫৩০ হিজরি সনে জিলকদ মাসে তিনি মসুলে চলে যান। পরবর্তীকালে তিনি ৫৩২ হিজরি সনের রমজান মাসে (১১৩৮ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে) ইস্পাহানে বাতিনি গুপ্তঘাতকদের হাতে নিহত হন।

মুকতাফি লি আমরিল্লাহ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন মুসতাযহির বিন মুকতাদি বিন যাখিরুদ্দিন

[জিলকদ ৫৩০ হিজরি—রবিউল আউয়াল ৫৫৫ হিজরি]

[আগস্ট ১১৩৬ খ্রিষ্টাব্দ—মার্চ ১১৬০ খ্রিষ্টাব্দ]

মুকতাফি লি আমরিল্লাহ ৪৮৯ হিজরি সনে জন্মগ্রহণ করেন। ৫৩০ হিজরি সনের জিলকদ মাসে খলিফা রাশিদ বিল্লাহ মসুলে চলে যাওয়ার পর সুলতান মাসউদ জনসাধারণকে অবহিত করেন যে, খলিফা রাশিদ স্বেচ্ছায় অব্যাহতি দিয়ে চলে গেছেন। এরপর সুলতান মাসউদ আব্বাসি রাজপরিবারের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ করে রাশিদের চাচা আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদকে খলিফা নির্বাচিত করেন। দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি 'আল-মুকতাফি লি-আমরিল্লাহ' উপাধি গ্রহণ করেন। এ সময় তার বয়স ছিল একচল্লিশ বছর।

মুকতাফির খিলাফত আমলেই ৫৪৭ হিজরি সনে সুলতান মাসউদ বিন মুহাম্মাদ হামাদানে ইন্তেকাল করেন। মাসউদের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সেলজুক পরিবারের সৌভাগ্যের সূর্য অস্তমিত হয়ে যায়। এরপর সেলজুক পরিবারের আর কোনো সদস্য আব্বাসি সাম্রাজ্যে উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি।

মাসউদের মৃত্যুর পর ইরাকের সুলতান পদ গ্রহণ করেন তার ভ্রাতুষ্পুত্র মুইনুদ্দিন মালিক শাহ বিন মাহমুদ বিন মুহাম্মাদ। কিছুদিন পরই তার স্থলাভিষিক্ত হন তার ভাই দ্বিতীয় মুহাম্মাদ বিন মাহমুদ বিন মুহাম্মাদ। ৫৫৪ হিজরি সনে তিনি হামাদানে ইন্তেকাল করেন। এরপর ইরাকের সেলজুক সালতানাতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন দ্বিতীয় মুহাম্মাদের চাচা সুলায়মান শাহ বিন মুহাম্মাদ বিন মালিক শাহ। এর কিছুদিন পর ৫৫৫ হিজরি সনের ২ রবিউল আউয়াল (১১৬০ খ্রিষ্টাব্দের ১২ মার্চ) খলিফা মুকতাফি লি আমরিল্লাহ ছেষট্টি বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

খলিফা মুকতাফিই প্রথম খলিফা, যিনি সেলজুক পরিবারের প্রভাবমুক্ত হয়ে অনেকটা স্বাধীনভাবে ইরাক শাসন করেন এবং খিলাফতের প্রকৃত অধিকার লাভ করেন। তিনি সাহসী ও নির্ভীক ছিলেন; সশরীরে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন। পাশাপাশি তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ ও সচ্চরিত্র এবং সূক্ষ্ম চিন্তা ও প্রজ্ঞার অধিকারী।

আল-মুসতানজিদ বিল্লাহ আবুল মুযাফফার ইউসুফ বিন মুকতাফি বিন মুসতাযহির বিন মুকতাদি

[রবিউল আউয়াল ৫৫৫ হিজরি—রবিউস সানি ৫৬৬ হিজরি]
[মার্চ ১১৬০ খ্রিষ্টাব্দ—ডিসেম্বর ১১৭০ খ্রিষ্টাব্দ]

মুসতানজিদ বিল্লাহ ৫১৮ হিজরি সনে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর ৫৫৫ হিজরিতে সাঁইত্রিশ বছর বয়সে তিনি খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হন।

মুসতানজিদ বিল্লাহকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আব্বাসি খলিফা বিবেচনা করা হয়। তিনি তার শাসনামলে অতিরিক্ত কর ও জুলুম-উৎপীড়ন সম্পূর্ণ বাতিল করেন। সন্ত্রাসী ও চোর-ডাকাতদের প্রতি তিনি অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। একবার তিনি জনৈক সন্ত্রাসীকে বন্দি করার নির্দেশ দেন। তখন তার এক অনুচর উক্ত সন্ত্রাসীকে মুক্তিদানের সুপারিশ করে এবং বিনিময়ে দশ হাজার দিনার প্রদানের প্রস্তাব দেয়। প্রত্যুত্তরে খলিফা তাকে বলেন, 'আমি তোমাকে দশ হাজার দিনার দিচ্ছি। তুমি আমাকে এমন আরেকজন সন্ত্রাসীর সন্ধান দাও। আমি তাকেও বন্দি করে জনসাধারণকে নিরাপত্তা প্রদানের চেষ্টা করব।'

খলিফা মুসতানজিদ বিল্লাহর আমলে ব্যাপক ও বিস্তৃত ক্ষেত্রজুড়ে মুসলিম-খ্রিষ্টান যুদ্ধ সংঘটিত হয়। শাম ও মিশরের বিভিন্ন অঞ্চলে উভয় পক্ষ পরস্পর লড়াই করতে থাকে। তখন উভয় ফ্রন্টে মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব দিতেন জিনকি রাষ্ট্রের সুলতান নুরুদ্দিন মাহমুদ রহ.। এ সময় উবায়দি রাষ্ট্র অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তাই মিশরের প্রতিরক্ষার দায়িত্বও নুরুদ্দিন মাহমুদই গ্রহণ করেন। এ সম্পর্কে সামনে যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

খলিফা মুসতানজিদের খিলাফত আমলের শুরুতে ইরাক অঞ্চলের সেলজুক সুলতান ছিলেন সুলায়মান শাহ বিন মুহাম্মাদ বিন মালিক শাহ।

৫৫৬ হিজরি সনে তিনি নিহত হলে তার স্থলাভিষিক্ত হন তার ভ্রাতুষ্পুত্র আরসালান শাহ বিন দ্বিতীয় তুগরুল বিন মুহাম্মাদ বিন মালিক শাহ। তবে ইরাকের চলমান ক্ষমতাপ্রবাহে তার উল্লেখযোগ্য কোনো অংশগ্রহণ ছিল না।

খলিফা মুসতানজিদ ৫৬৬ হিজরি সনের রবিউস সানি মাসে (১১৭০ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে) আটচল্লিশ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

আল-মুসতাযি বি আমরিল্লাহ আবু মুহাম্মাদ হাসান বিন মুসতানজিদ বিন মুকতাফি বিন মুসতাযহির

[রবিউস সানি ৫৬৬ হিজরি—জিলকদ ৫৭৫ হিজরি]

[ডিসেম্বর ১১৭০ খ্রিষ্টাব্দ—মার্চ ১১৮০ খ্রিষ্টাব্দ]

মুসতাযি বি আমরিল্লাহ ৫৩৬ হিজরি সনে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা খলিফা মুসতানজিদ ৫৬৬ হিজরি সনে ইন্তেকাল করলে তিনি ত্রিশ বছর বয়সে খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হন।

খলিফা মুসতাযি ন্যায়পরায়ণ ও সচ্চরিত্র ছিলেন। তিনি জনগণের সঙ্গে উদার আচরণ করতেন। যতদিন খলিফা ছিলেন, জনগণের কাছে প্রশংসিত ছিলেন। জনসমর্থন ও সৌভাগ্যকে সঙ্গী করেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ঐতিহাসিক ইবনুল আছির (৫৫৫-৬৩০ হিজরি) তার শাসনকাল পেয়েছেন। তিনি খলিফা মুসতাযির আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন,

> আমি পূর্ববর্তী খলিফা ও শাসকগণের জীবনেতিহাস অধ্যয়ন করেছি। পুরো ইতিহাসে খোলাফায়ে রাশিদিন ও উমর ইবনে আবদুল আজিজের পর তার (খলিফা মুসতাযি বি আমরিল্লাহ) চেয়ে অধিক সচ্চরিত্র ও ন্যায়প্রতিষ্ঠায় অধিক সচেষ্ট কাউকে পাইনি।[১৩২]

মুসতাযি বি আমরিল্লাহর খিলাফতকালে ৫৬৭ হিজরি সনের মুহাররম মাসে (১১৭১ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে) সালাহুদ্দিন আইয়ুবির হাতে উবায়দি রাষ্ট্রের পতন ঘটে। এরপর থেকে মিশর, আফ্রিকা, শাম অঞ্চল ও

---

১৩২. প্রাগুক্ত, ৯/৩৯৪।

ইয়ামেনে মুসলিম সাম্রাজ্যের খলিফা হিসেবে জুমার খুতবায় মুসতাযি বি আমরিল্লাহর নাম উচ্চারিত হতে থাকে।

খলিফা মুসতাযি বি আমরিল্লাহ ৫৭৫ হিজরি সনে (১১৮০ খ্রিষ্টাব্দে) উনচল্লিশ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

৩৪ নং আব্বাসি খলিফা

আন-নাসির লি দ্বীনিল্লাহ আবুল আব্বাস আহমাদ বিন মুসতাযি বিন মুসতানজিদ বিন মুকতাফি

[জিলকদ ৫৭৫ হিজরি—রমজান ৬২২ হিজরি]

[মার্চ ১১৮০ খ্রিষ্টাব্দ—অক্টোবর ১২২৫ খ্রিষ্টাব্দ]

খলিফা নাসির লি দ্বীনিল্লাহ ৫৫৩ হিজরি সনে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মুসতাযি বি আমরিল্লাহর মৃত্যুর পর ৫৭৫ হিজরি সনে বাইশ বছর বয়সে তিনি খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হন।

নাসির লি দ্বীনিল্লাহ ছিলেন সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদি আব্বাসি খলিফা। তার শাসনামলেই ৫৯০ হিজরি সনে (১১৯৪ খ্রিষ্টাব্দে) খোয়ারিজম রাষ্ট্রের সুলতান আলাউদ্দিন তিকিশের হাতে তৃতীয় তুগরুল বিন আরসালান শাহর হত্যার মধ্য দিয়ে ইরাকে সেলজুক সালতানাতের পতন ঘটে। আলাউদ্দিন তিকিশের রাজত্ব ততদিনে বেশ বিস্তৃত হয়েছিল। সেলজুকদের পরাজিত করে রায় নগরী অধিকার করার পর তার রাজত্ব পূর্বে মাওয়ারাউন নাহারের সীমান্ত এলাকা হতে পশ্চিমে রায় নগরী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। আলাউদ্দিন তিকিশের আকাঙ্ক্ষা ছিল বাগদাদের মিম্বরে সুলতান হিসেবে তার নাম উচ্চারিত হবে এবং খুতবায় সেলজুকদের পরিবর্তে তার নাম পাঠ করা হবে। কিন্তু খলিফা তার দাবি মেনে নিতে সুস্পষ্ট ভাষায় অস্বীকৃতি জানান। একে কেন্দ্র করে উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড শত্রুতা সৃষ্টি হয় এবং আলাউদ্দিন তিকিশ তার শাসিত অঞ্চলসমূহে খলিফা নাসির লি দ্বীনিল্লাহর নামে খুতবা পাঠ বন্ধ করে দেন। আলাউদ্দিন তিকিশ ৫৯৬ হিজরি সনে (১২০০ খ্রিষ্টাব্দে) ইন্তেকাল করেন এবং তার পুত্র আলাউদ্দিন মুহাম্মাদ খোয়ারিজম রাষ্ট্রের শাসক পদে তার স্থলাভিষিক্ত হন।

ইরাকের সেলজুক সুলতানগণের তালিকা

০১.	রুকনুদ্দিন তুগরুল বেগ বিন মিকাইল বিন সেলজুক	:	৪৪৭-৪৫৫ হি. ১০৫৫-১০৬৩ খ্রি.
০২.	আযদুদ্দৌলা আলপ আরসালান বিন চাঘরি বেগ বিন মিকাইল	:	৪৫৫-৪৬৫ হি. ১০৬৩-১০৭২ খ্রি.
০৩.	জালালুদ্দৌলা আবুল ফাতাহ মালিক শাহ বিন আলপ আরসালান	:	৪৬৫-৪৮৫ হি. ১০৭২-১০৯২ খ্রি.
০৪.	নাসিরুদ্দিন মাহমুদ বিন মালিক শাহ	:	৪৮৫-৪৮৭ হি. ১০৯২-১০৯৪ খ্রি.
০৫.	রুকনুদ্দিন বারকিয়ারুক বিন মালিক শাহ	:	৪৮৭-৪৯৮ হি. ১০৯৪-১১০৪ খ্রি.
০৬.	২য় মালিক শাহ বিন বারকিয়ারুক	:	৪৯৮-৪৯৮ হি. ১১০৪-১১০৫ খ্রি.
০৭.	গিয়াসুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন মালিক শাহ	:	৪৯৮-৫১১ হি. ১১০৫-১১১৮ খ্রি.
০৮.	মুগিছুদ্দিন আবুল কাসিম ২য় মাহমুদ বিন মুহাম্মাদ বিন মালিক শাহ	:	৫১১-৫২৫ হি. ১১১৮-১১৩১ খ্রি.
০৯.	২য় তুগরুল বেগ বিন মুহাম্মাদ বিন মালিক শাহ (১৩৩)	:	৫২৬-৫২৭ হি. ১১৩১-১১৩২ খ্রি.

---

[১৩৩]. ৫২৫ হিজরি সনে সুলতান ২য় মাহমুদ বিন মুহাম্মাদের ইন্তেকালের পর থেকে ৫২৯ হিজরি সনের মুহাররম মাস পর্যন্ত সময়ে ইরাকের সুলতান পদে বারবার পালাবদল ঘটে। এ সময় পর্যায়ক্রমে সুলতান পদে অধিষ্ঠিত হন দাউদ বিন ২য় মাহমুদ, গিয়াসুদ্দিন মাসউদ বিন মুহাম্মাদ, তুগরুল বিন মুহাম্মাদ, এরপর আবার মাসউদ এবং তারপর আবার=

১০.	গিয়াসুদ্দিন মাসউদ বিন মুহাম্মাদ বিন মালিক শাহ	:	৫২৭-৫৪৭ হি. ১১৩২-১১৫২ খ্রি.
১১.	মুইনুদ্দিন ৩য় মালিক শাহ বিন ২য় মাহমুদ বিন মুহাম্মাদ	:	৫৪৭-৫৪৮ হি. ১১৫২-১১৫৩ খ্রি.
১২.	২য় মুহাম্মাদ বিন ২য় মাহমুদ বিন মুহাম্মাদ	:	৫৪৮-৫৫৪ হি. ১১৫৩-১১৫৯ খ্রি.
১৩.	সুলায়মান শাহ বিন মুহাম্মাদ বিন মালিক শাহ	:	৫৫৪-৫৫৬ হি. ১১৫৯-১১৬১ খ্রি.
১৪.	আরসালান শাহ বিন ২য় তুগরুল বেগ বিন মুহাম্মাদ	:	৫৫৬-৫৭৩ হি. ১১৬১-১১৭৭ খ্রি.
১৫.	৩য় তুগরুল বেগ বিন আরসালান শাহ বিন ২য় তুগরুল বেগ	:	৫৭৩-৫৯০ হি. ১১৭৭-১১৯৪ খ্রি.

* * *

=তুগরুল। ৫২৯ হিজরি সনের শুরুতে সুলতান তুগরুল ইন্তেকাল করার পর সুলতান মাসউদ সালতানাতের একচ্ছত্র অধিপতি হতে সক্ষম হন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তাতারদের আগ্রাসন চলাকালীন আব্বাসি খলিফাগণের বিবরণ

[৬১৫-৬৫৬ হিজরি—১২১৮-১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ]

খলিফা নাসির লি দ্বীনিল্লাহর সঙ্গে খোয়ারিজমের সুলতানের সংঘাতকে কেন্দ্র করেই একসময় ইসলামি ভূখণ্ডে তাতারদের আগ্রাসন শুরু হয়। নাসির লি দ্বীনিল্লাহর খিলাফত আমলেই ৬১৫ হিজরি সনে তাতার নেতা চেঙ্গিস খান ইসলামি ভূখণ্ডে তাতারি আগ্রাসনের সূচনা করেন। তাই ইতিহাসের ধারাবর্ণনার এ পর্যায়ে ইসলামি বিশ্বে তাতার জাতির আগ্রাসনের প্রেক্ষাপট সংক্ষেপে তুলে ধরা হচ্ছে।

তাতার জাতি ও মুসলিম উম্মাহ

তাতার জাতির পরিচয়

তাতার একটি যাযাবর সম্প্রদায়। চীন ও মঙ্গোলিয়ার বিশাল অঞ্চলজুড়ে বিস্তৃত এশিয়ার সর্ববৃহৎ মরুভূমি গোবি মরুভূমির বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে ছিল তাতারদের বসবাস। গোত্রনির্ভর জীবনব্যবস্থায় অভ্যস্ত তাতাররা মূলত মেষপালনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করত। লুটপাট, রাহাজানি, পরস্পর হানাহানি ও প্রতারণার স্বভাবের কারণে তাতারদের কুখ্যাতি ছিল। অবশ্য তারা গোত্রপ্রধানের পূর্ণ আনুগত্য করত।

ধর্মপরিচয়ে তাতাররা প্রাচীন ধর্ম শামানি (Shamanism)-এর অনুসারী ছিল। তারা তারকারাজির পূজা করত এবং সূর্যোদয়ের সময় সূর্যকে প্রণাম করত। কুকুরসহ সব ধরনের প্রাণীর মাংস তারা ভক্ষণ করত। এ ছাড়াও তারা বিভিন্ন হিংস্র প্রাণীর সামনে নজরানা পেশ করত এবং পূর্বপুরুষদের অদৃশ্য আত্মাকে সম্মান জানাত। তাতার সমাজে স্বেচ্ছাচার ও নৈরাজ্যবাদের বিস্তার ছিল।

তাতার ও মোঙ্গল : ভিন্ন নাকি অভিন্ন?!

মোঙ্গল, তুর্কি, সেলজুক ইত্যাদি ঐতিহাসিক পরিবার মূলত তাতার গোত্রেরই শাখা। তবে ইতিহাসের পরিক্রমায় কোনো কালে পুরো তাতার জাতিগোষ্ঠীর ওপর মোঙ্গল পরিবার প্রতিপত্তি বিস্তার করায় তাতারদের সকল শাখাগোত্রকে মোঙ্গল নামেও অভিহিত করা হয়। অবশ্য একদল ঐতিহাসিকের ভাষ্যমতে তাতার ও মোঙ্গল মূলত তাতার গোত্রের পূর্বপুরুষ দুই ভাইয়ের নাম।

চেঙ্গিস খান ছিলেন মোঙ্গল গোত্রীয়। তার নেতৃত্বে তাতাররা যখন বহির্বিশ্বে আগ্রাসন শুরু করে, মূলত তখন থেকেই মোঙ্গল শাখাগোত্র অন্যান্য তাতার শাখাগোত্রের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। তাই তখন মোঙ্গল নামটিই সকল গোত্রের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। অপরদিকে তৈমুর লং-এর আমলে তাতাররা প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং সকল শাখাগোত্র তাতার নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

বর্তমানে রাশিয়া, সাইবেরিয়া ও ক্রিমিয়া উপদ্বীপে বসবাসকারী গোত্রসমূহকে তাতার বলা হয় আর চীন ও আফগানিস্তানে বিদ্যমান গোত্রসমূহকে বলা হয় মোঙ্গল।

চেঙ্গিস খানের নেতৃত্বে ইসলামি ভূখণ্ডে তাতারি আগ্রাসন

চেঙ্গিস খান ছিলেন সুউচ্চ মনোবলের অধিকারী। তিনিই প্রথম তাতার গোত্রের অন্যান্য শাখার সঙ্গে আবহমানকাল ধরে চলমান সংঘাতে পরাজিত ও বিধ্বস্ত মোঙ্গল গোত্রকে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হন। এরপর তিনি অন্যান্য সকল তুর্কি গোত্রের বিরুদ্ধে দীর্ঘ ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর তাদেরকে পরাজিত করেন। এভাবে তিনি এমন এক সুবিস্তৃত রাজ্যের অধিপতি হন, যার অধিবাসীর সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ তাআলা জানেন। তার সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল বর্তমান মঙ্গোলিয়ার অন্তর্গত কারাকোরাম (Karakorum) নগরী।

চেঙ্গিস খান তার সুবিশাল জাতি ও রাষ্ট্রের জন্য এমন একটি সংবিধান প্রণয়নের চিন্তা করেন, যার দাবি অনুযায়ী পুরো জাতি চলবে। এ উদ্দেশ্যে তিনি ইয়াসাক বা ইয়াসা নামক একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। মোঙ্গলরা তাদের লেনদেন, জীবনাচারসহ সকল ক্ষেত্রে এই গ্রন্থেরই অনুসরণ করত। মুসলিম জাতির কাছে কুরআন যেমন অকাট্য জীবনবিধান, তাদের কাছেও তেমনই জীবনবিধান হিসেবে এ গ্রন্থ সমাদৃত ছিল।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, খোয়ারিজমের শাহ (সুলতান) আলাউদ্দিন মুহাম্মাদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের জের ধরে খলিফা নাসির লি দ্বীনিল্লাহই চেঙ্গিস খানকে খোয়ারিজম রাষ্ট্রে আক্রমণ করতে প্ররোচিত করেন।[১৩৪] খলিফা ভেবেছিলেন, এর ফলে আলাউদ্দিন মুহাম্মাদ ইরাকের সুলতান

---

১৩৪. খোয়ারিজম রাষ্ট্র তখন মুসলিম বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ শক্তি ছিল। বর্তমান পাকিস্তানের অংশবিশেষসহ পুরো আফগানিস্তান এবং মধ্য ও পূর্ব এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল খোয়ারিজম রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। খোয়ারিজমের বাহিনীর অশ্বারোহী সদস্যের সংখ্যাই ছিল পাঁচ লক্ষ। তাতার শাসক চেঙ্গিস খান ততদিনে বিভিন্ন ভূখণ্ডে আগ্রাসন চালালেও তার মনে মুসলিম ভীতি ছিল প্রবল। এ কারণেই তিনি খোয়ারিজমের সুলতান আলাউদ্দিন মুহাম্মাদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করেছিলেন এবং চুক্তি মেনে চলছিলেন। কিন্তু খলিফা নাসির লি দ্বীনিল্লাহ নিজের প্রতিপত্তি রক্ষার্থে চেঙ্গিস খানের কাছে দূত পাঠিয়ে তাকে খোয়ারিজমে হামলা চালাতে প্ররোচিত করেন। চেঙ্গিস খান যদিও তৎক্ষণাৎ খলিফার প্রস্তাবে রাজি হননি; কিন্তু তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই মুসলিম জাতি সেই মুসলিম জাতি নয়!

হওয়ার চিন্তা বাদ দিয়ে তাতারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যস্ত থাকবেন। খলিফা চেয়েছিলেন, সেলজুকদের পতনের পর আব্বাসি খিলাফতের ওপর নতুন করে যেন কারও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে। স্বীকার করতেই হবে যে, আব্বাসি খলিফা তাতার জাতির শক্তিমত্তা ও তাতারদের মোকাবিলায় খোয়ারিজমের সুলতানের দুর্বলতার বিষয়টি মোটেও ধারণা করতে পারেননি। এই অদূরদর্শিতার ফলাফল যা হয়েছিল, তা সম্ভবত খলিফার চাওয়া ও কল্পনায় ছিল না।

অবশ্য চেঙ্গিস খানও কেবল আব্বাসি খলিফার প্ররোচনাকে খোয়ারিজম রাষ্ট্রে হামলা চালানোর জন্য উপযুক্ত ও যথেষ্ট কারণ বিবেচনা করেননি। কারণ, আগে থেকেই আলাউদ্দিন মুহাম্মাদের সঙ্গে চেঙ্গিস খানের সমঝোতা-চুক্তি ছিল।

৬১৫ হিজরি সনে (১২১৮ খ্রিষ্টাব্দে) একদল মোঙ্গল ব্যবসায়ী প্রচুর মালামাল নিয়ে খোয়ারিজম রাষ্ট্রের (বর্তমান কাজাখস্তানের অন্তর্গত) উতরার (ফারাব) নগরীতে গমন করে। বণিক কাফেলার সদস্যসংখ্যা ছিল প্রায় চারশ। নগরীটির খোয়ারিজমি গভর্নর এত বিপুল সম্পদ দেখে তাদের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং সুলতান আলাউদ্দিন মুহাম্মাদের কাছে বার্তা পাঠিয়ে জানায় যে, চেঙ্গিস খানের কিছু গুপ্তচর বণিক বেশে আমাদের এলাকায় আগমন করেছে। তখন আলাউদ্দিন মুহাম্মাদ তাদেরকে হত্যা করে সঙ্গে থাকা সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দেন। গভর্নর কালবিলম্ব না করে সুলতানের নির্দেশ বাস্তবায়ন করে।[১৩৫]

চেঙ্গিস খান এ সংবাদ জানতে পেরে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হন এবং উক্ত গভর্নরকে তার হাতে তুলে দেওয়ার জন্য আলাউদ্দিন মুহাম্মাদের কাছে দাবি জানান। খোয়ারিজমের সুলতান আলাউদ্দিন মুহাম্মাদ চেঙ্গিস খানের দাবি মেনে নেওয়ার পরিবর্তে তার বার্তাবাহককে হত্যা করেন। ক্রুদ্ধ চেঙ্গিস খান এবার আলাউদ্দিন মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অগ্রসর হন।

চেঙ্গিস খানের আগমন-সংবাদ জানতে পেরে আলাউদ্দিন মুহাম্মাদই প্রথম আক্রমণের সূচনা করেন। তিনি মোঙ্গল রাষ্ট্রের সীমান্তবর্তী একটি অঞ্চলে

---

[১৩৫]. ঠিক কী কারণে খোয়ারিজমি সুলতানের গভর্নর মোঙ্গল বণিকদের হত্যা করেছিল, তা নিয়ে ঐতিহাসিকগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। বিস্তারিত জানতে দেখুন মাকতাবাতুল হাসান থেকে প্রকাশিত ড. রাগিব সারজানির *তাতারদের ইতিহাস*, পৃষ্ঠা : ৪০-৪১।

হামলা চালান। সেখানে প্রতিপক্ষের সামান্য কিছু যোদ্ধা উপস্থিত ছিল। আলাউদ্দিন মুহাম্মাদ সেখানকার শিশুদের হত্যা করেন এবং নারীদের বন্দি করেন। সংবাদ পেয়ে তাতাররা দ্রুত অগ্রসর হয়। তারা এসে আলাউদ্দিন মুহাম্মাদকে সেখানেই পেয়ে যায়। উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘটিত হয় প্রচণ্ড ও রক্তক্ষয়ী এক যুদ্ধ। কেউ কাউকে এক চুল ছাড় দিতে নারাজ। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে, উভয় পক্ষই সমূলে শেষ হয়ে যাবে। অবশেষে উভয় পক্ষ যখন ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং যুদ্ধস্পৃহা দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন আলাউদ্দিন মুহাম্মাদ বুখারায় ফিরে আসেন এবং পুনরায় যুদ্ধপ্রস্তুতি শুরু করেন। তিনি বুখারা ও সমরকন্দে সুদৃঢ় দুর্গ গড়ে তুলে খোয়ারিজম ও খোরাসান থেকে সৈন্য সমবেত করা শুরু করেন।

চেঙ্গিস খানের মোঙ্গল বাহিনী ঝড়ের বেগে অগ্রসর হতে থাকে। চেঙ্গিস খান সির দরিয়া পাড়ি দিয়ে পথচলা অব্যাহত রেখে বুখারায় পৌঁছেন। বুখারায় তখন বিশ হাজার খোয়ারিজমি সৈন্য অবস্থান করছিল। আলাউদ্দিন মুহাম্মাদ নিজে যুদ্ধপ্রস্তুতির কারণে বুখারায় অনুপস্থিত ছিলেন। তাতার বাহিনীর আগমন সংবাদ পেয়ে খোয়ারিজমি সৈন্যরা বুখারা নগরীকে অরক্ষিত রেখেই পালিয়ে চলে যায়।

৬১৬ হিজরি সনের ৪ জিলহজ (১২২০ খ্রিষ্টাব্দের ১০ ফেব্রুয়ারি) তাতাররা বুখারায় প্রবেশ করে। চেঙ্গিস খান সঙ্গে থাকা মোঙ্গল বণিকদেরকে নির্দেশ দেন যে, ইতিপূর্বে মোঙ্গল বণিক কাফেলার যেসব সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল, তারা যেন তা বের করে নিয়ে আসে। এরপর চেঙ্গিস খান বুখারার নেতৃবৃন্দকে নগরী থেকে বের করে করে দেন। অবশিষ্ট নাগরিকদের সৈন্যদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হয়। সকল সম্পদ লুট করা হয়। দুদিন আগের সুবিশাল ও সুসমৃদ্ধ বুখারা নগরী পরিণত হয় বিধ্বস্ত এক ধ্বংসস্তূপে, যেন গতকালও সেখানে কিছুই ছিল না! ৬১৭ হিজরি সনের মুহাররম মাসে (১২২০ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে) একইভাবে সমরকন্দকেও ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হয়।[১৩৬]

এরপর চেঙ্গিস খান তার সবচেয়ে দক্ষ ও শক্তিশালী বিশ হাজার সৈন্যকে বাছাই করেন। তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন, আলাউদ্দিন মুহাম্মাদ

---

১৩৬. বুখারা ও সমরকন্দে তাতার বাহিনীর ধ্বংসাত্মক আগ্রাসনের বিস্তারিত বিবরণ জানতে দ্রষ্টব্য মাকতাবাতুল হাসান থেকে প্রকাশিত ড. রাগিব সারজানির *তাতারদের ইতিহাস*।

যেখানেই থাকুক, এমনকি আসমানে ঝুলে থাকলেও তাকে খুঁজে বের করতে হবে। নেতার নির্দেশ যথার্থভাবে পালন করতে তাতার বাহিনী বেরিয়ে পড়ে। তাতার বাহিনী যেখানেই আলাউদ্দিন মুহাম্মাদের নাগাল পেতে উদ্যত হয়, তিনি সেখান থেকে পালিয়ে আরেক নগরীতে আশ্রয় নেন। খোয়ারিজমের প্রতাপশালী সুলতান আলাউদ্দিন মুহাম্মাদ তখন তাতার-ভীতিতে আক্রান্ত হয়ে ভীরু ও সাহসহারা এক পলাতক শাসক। অবশেষে তিনি কাস্পিয়ান হ্রদের এক দ্বীপ-দুর্গে আশ্রয় নেন। আলাউদ্দিন মুহাম্মাদ ও তার সঙ্গীগণ যখন নৌযানে উঠে সেই দুর্গের উদ্দেশে রওনা হন, তখন তাতাররা তাকে ধরার আশা ছেড়ে দিয়ে প্রত্যাবর্তন করে। এর কিছুদিন পর ৬১৭ হিজরি সনেই (১২২০ খ্রিষ্টাব্দে) রিক্ত ও বিধ্বস্ত আলাউদ্দিন মুহাম্মাদ মৃত্যুবরণ করেন।

প্রত্যাবর্তনের পথে তাতার বিশেষ বাহিনীটি আশেপাশের প্রতিটি অঞ্চল জয় করতে থাকে। তারা একে একে মাজানদারান (Mazandaran), রায়, হামাদান ও কাযবিন (Qazvin) নগরী জয় করে উত্তরে কুমানিয়া[১৩৭] (Cumania) অঞ্চলে পৌঁছে যায়। কুমানিয়ায় 'কিপচাক' নামক একটি তুর্কি উপজাতি বসবাস করত। তাদের একটি শাখার নাম ছিল 'কুমান'। যাযাবর কুমান-কিপচাক জাতি ধর্মপরিচয়ে মুসলিম ছিল। তাতাররা কুমানিয়াতেও নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালায়। তাতারি আগ্রাসনে বিপর্যস্ত কিপচাক জাতি বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন জনপদে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবেই প্রথমবারের মতো কুমান-কিপচাক দাসদের মিশরে আগমন শুরু হয়। পরবর্তীকালে মিশরের আইয়ুবি সুলতান সালিহ নাজুমদ্দিন আইয়ুব এদের মধ্য হতেই বাহরি মামলুকদের ক্রয় করেন, যারা (আইয়ুবি সালতানাতের পর) মিশরে মামলুক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন রুকনুদ্দিন বাইবার্স, মুইযুদ্দিন আইবেক, সাইফুদ্দিন কুতুজ, মানসুর কালাউন প্রমুখ।

এরপর তাতার বাহিনী পর্যায়ক্রমে রাশিয়া ও বুলগেরিয়ায় প্রবেশ করে। কিন্তু ৬২০ হিজরি সনে বুলগেরিয়ায় তাতার বাহিনী প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয় এবং বহু তাতার সৈন্য বুলগেরিয়ানদের হাতে নিহত হয়।

---

১৩৭. **কুমানিয়া :** আধুনিক কাজাখস্তানের অন্তর্ভুক্ত একটি অঞ্চল।

এভাবেই খোয়ারিজমের শাসক আলাউদ্দিন মুহাম্মাদের সন্ধানে বের হওয়া সীমিত সংখ্যক সৈন্যের তাতার বাহিনীটি বিশাল ধ্বংসযজ্ঞ ও ক্ষতিসাধনের পাশাপাশি ব্যাপক ত্রাস সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। এরপর চেঙ্গিস খান তার বাহিনীকে পাঠিয়ে একের পর এক অঞ্চল জয় করতে থাকেন। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি পরিণত হন এক সুবিশাল ও সুবিস্তৃত রাজ্যের অধিপতিতে, যার বিস্তৃতি ছিল পূর্বে চীন থেকে পশ্চিমে ইরাক, কাস্পিয়ান সাগর ও রাশিয়া পর্যন্ত এবং দক্ষিণে ভারতবর্ষ হতে উত্তরে উত্তর মহাসাগর পর্যন্ত। ৬১৬ হিজরি সন হতে ৬২৩ হিজরি সন—মাত্র আট বছরে চেঙ্গিস খান এই বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হন।

চেঙ্গিস খান যখন অনুভব করেন যে, তার বিদায়ের সময় ঘনিয়ে এসেছে, তখন তিনি তার সুবিশাল রাষ্ট্রকে চার ভাগে বিভক্ত করে তার চার পুত্রকে বণ্টন করে দেন। এর বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসবে।

চেঙ্গিস খান ৬২৪ হিজরি সনে (১২২৭ খ্রিষ্টাব্দে) মৃত্যুবরণ করেন। জীবনের শেষ তিন বছর তিনি চলৎশক্তিহীন ছিলেন। এ সময় তার এক চোখ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, অপর চোখেও তিনি সামান্য দেখতে পেতেন। এ অবস্থায়ই তার মৃত্যু হয়। নির্বিচারে অগণিত মানুষ হত্যা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিনাশ সাধনসহ গর্হিত নানাবিধ কর্মকাণ্ডের কারণে চেঙ্গিস খান ইতিহাসে কুখ্যাত হয়েই থাকবেন।

চেঙ্গিস খানের নেতৃত্বে তাতাররা যখন মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন ভূখণ্ডে ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছিল, মুসলিম বিশ্বের অভিভাবক আব্বাসি খলিফা নাসির লি দ্বীনিল্লাহ তখন ব্যস্ত জনসাধারণের ওপর জুলুম করে তাদের সম্পদ লুণ্ঠনে এবং ভোগবিলাসের মাধ্যমে প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণে! তিনি যদিও 'নাসির লি দ্বীনিল্লাহ' বা আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যকারী উপাধি ধারণ করেছিলেন; কিন্তু ইসলাম ও মুসলিম বিশ্বের দুর্দশার প্রতি তার কোনো ভ্রুক্ষেপই ছিল না। চেঙ্গিস খানের মৃত্যুর দু-বছর পূর্বে ৬২২ হিজরির রমজান (১২২৫ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর) মাসে খলিফা নাসির লি দ্বীনিল্লাহ উনসত্তর বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তিনি দীর্ঘ সাতচল্লিশ বছর খলিফা পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

আযযাহির বি আমরিল্লাহ আবু নাসর মুহাম্মাদ বিন নাসির লি দ্বীনিল্লাহ বিন মুসতাযি বিন মুসতানজিদ

[শাওয়াল ৬২২ হিজরি—রজব ৬২৩ হিজরি]
[অক্টোবর ১২২৫ খ্রিষ্টাব্দ—জুলাই ১২২৬ খ্রিষ্টাব্দ]

খলিফা যাহির বি আমরিল্লাহ ৫৭১ হিজরি সনে জন্মগ্রহণ করেন। ৬২২ হিজরিতে তার পিতা নাসির লি দ্বীনিল্লাহ মৃত্যুবরণ করলে বায়ান্ন বছর বয়সে তিনি খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হন।

খলিফা যাহির বি আমরিল্লাহ ন্যায়পরায়ণ ও সদাচারী ছিলেন।(১৩৮) ঐতিহাসিকগণ তার সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, তিনি উমরদ্বয়ের (দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. ও উমাইয়া খলিফা উমর বিন আবদুল আজিজ রহ.) আদর্শ পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন।

পূর্ববর্তী খলিফাদের রীতি অনুসারে যখন তাকেও জনসাধারণের বিভিন্ন তথ্য ও পরিস্থিতি জানানো হয়, তখন তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে বলেন, 'মানুষের ঘরের খবর জেনে আমাদের কী লাভ? আমার কাছে কেউ বার্তার মাধ্যমে কিছু জানাতে চাইলে যেন কেবল রাষ্ট্রের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ই জানায়।' তাকে বলা হয়, এরূপ করা হলে তো জনসাধারণের অন্যায়-আচরণ বেড়ে যাবে। তিনি উত্তর দেন, 'আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করব, তিনি যেন তাদেরকে সংশোধন করে দেন।' খলিফা যাহির বি

---

১৩৮. প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির রহ. তার সমসাময়িক ছিলেন। তিনি লিখেছেন,

> আল্লাহ জানেন, তিনি যখন খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হন, তখন থেকেই আমি কালের বিপর্যয় ও কালবাসীর মন্দাচারের কারণে তার শাসনকাল সংকীর্ণ হওয়ার আশঙ্কা করেছি। আমি আমার অনেক বন্ধুবান্ধবকেও আমার এ আশঙ্কার কথা বলেছি। [ইবনুল আছির, *আলকামিল ফিত তারিখ*, ১০/৪১৪]

আর বাস্তবেও তাই হয়েছিল। তার খিলাফতকাল এক বছরও স্থায়ী হয়নি।

আমরিল্লাহ প্রতিদিন পূর্বের দিনের তুলনায় আরও অধিক জনগণের প্রতি সদাচরণ করতেন, সমাজে চর্চিত ন্যায়পরায়ণতা অব্যাহত রাখতেন, বিরলগুলো পুনরুজ্জীবিত করতেন।

দায়িত্ব পালনের মাত্র নয় মাস পর ৬২৩ হিজরি সনের রজব মাসে (১২২৬ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে) তিনি ইন্তেকাল করেন।

আল-মুসতানসির বিল্লাহ আবু জাফর মানসুর বিন যাহির বি আমরিল্লাহ বিন নাসির বিন মুসতাযি

[রজব ৬২৩ হিজরি—জুমাদাল উখরা ৬৪০ হিজরি]
[জুলাই ১২২৬ খ্রিষ্টাব্দ—ডিসেম্বর ১২৪২ খ্রিষ্টাব্দ]

যাহির বি আমরিল্লাহর মৃত্যুর পর তার পুত্র মুসতানসিরের নামে বায়আত গ্রহণ করা হয়। মুসতানসির বিল্লাহ ৫৮৮ হিজরি সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬২৩ হিজরি সনে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হন।

খলিফা হয়ে তিনি জনগণের মাঝে ন্যায় ও কল্যাণের বিস্তার করেন, বিচারকার্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেন, ইলম ও ধর্মীয় বিষয়ে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের সাহচর্য গ্রহণ করেন, মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণ করেন। তিনিই বাগদাদে চার মাজহাবের জন্য মুসতানসিরিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এ মাদরাসায় তিনি দারুল হাদিস, স্নানাগার ও চিকিৎসালয়ও প্রতিষ্ঠা করেন। খলিফা মুসতানসির ইসলামের মর্যাদা রক্ষায় সৈন্যসমাবেশ করতেন। তিনি নিজেও বীর সাহসী ছিলেন, সশরীরে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন। জনগণও তাকে ভালোবাসত। যে সময় পুরো পৃথিবী তাতার জাতির ভয়ে তটস্থ ছিল, তখন তিনি তাতার বাহিনীকে পরাজিত করেন। তার এক ভাইয়ের নাম ছিল খাফাজি। তিনিও সাহসী ও সুউচ্চ মনোবলের অধিকারী ছিলেন। তিনি বলতেন, 'আমাকে যদি খিলাফতের দায়িত্ব প্রদান করা হয়, তাহলে আমি সেনাবাহিনী নিয়ে আমু দরিয়া পাড়ি দেবো এবং তাতারদের সমূলে বিনাশ করে তাদের অধিকৃত অঞ্চলগুলো জয় করব।' অবশ্য তিনি খিলাফতের দায়িত্ব লাভ করতে পারেননি। বরং মুসতানসির বিল্লাহর পর তার পুত্র মুসতাসিম খলিফা-পদ লাভ করেন।

খলিফা মুসতানসির সুদর্শন, নিষ্ঠাবান ও চরিত্রবান ছিলেন। তিনি আপন সামর্থ্য অনুযায়ী জনগণকে প্রচুর দান-সদকা করতেন। তিনি আব্বাসি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার পথেঘাটে প্রহরা-চৌকি, অশ্বশালা, সরাইখানা

ও সেতু নির্মাণ করেন। বাগদাদের প্রতিটি মহল্লায় তিনি বিশেষ করে রমজান মাসসহ অন্যান্য সময় দরিদ্র জনসাধারণের জন্য লঙ্গরখানা চালু রাখতেন। মুসতানসিরিয়া মাদরাসায় তিনি মূল্যবান অনেক গ্রন্থ ওয়াকফ করেন। খলিফা মুসতানসির তিপ্পান্ন বছর বয়সে ৬৪০ হিজরি সনের ১০ জুমাদাল উখরা (১২৪২ খ্রিষ্টাব্দের ৫ ডিসেম্বর) ইন্তেকাল করেন।

মুসতাসিম বিল্লাহ আবু আহমাদ আবদুল্লাহ বিন মুসতানসির বিন যাহির বিন নাসির

[জুমাদাল উখরা ৬৪০ হিজরি—সফর ৬৫৬ হিজরি]

[ডিসেম্বর ১২৪২ খ্রিষ্টাব্দ—ফেব্রুয়ারি ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ]

মুসতাসিম বিল্লাহ ৬০৯ হিজরি সনে জন্মগ্রহণ করেন। ৬৪০ হিজরি সনে তার পিতা খলিফা মুসতানসিরের ইন্তেকাল হলে একত্রিশ বছর বয়সে তিনি বাগদাদে আব্বাসি খিলাফতের হাল ধরেন।

খলিফা মুসতাসিম বিল্লাহর বংশপরম্পরা হলো—

> মুসতাসিম বিন মুসতানসির বিন যাহির বিন নাসির বিন মুসতাযি বিন মুসতানজিদ বিন মুকতাফি বিন মুসতাযহির বিন মুকতাদি বিন যাখিরুদ্দিন বিন কায়িম বিন কাদির বিন ইসহাক বিন মুকতাদির বিন মুতাযিদ বিন তালহা (মুওয়াফফাক বিল্লাহ) বিন মুতাওয়াককিল বিন মুতাসিম বিন হারুনুর রাশিদ বিন মাহদি বিন মানসুর।

অর্থাৎ তার সরাসরি ঊর্ধ্বতন বিশজন পূর্বপুরুষের মধ্যে যাখিরুদ্দিন, ইসহাক ও তালহা বাদে বাকি সতেরোজনই খলিফা ছিলেন। কিন্তু এই সুউচ্চ বংশমর্যাদা ও পিতৃপরিচয় আল্লাহর দরবারে তার কোনো কাজে আসেনি।

তাতার শাসক হালাকু খানের[১৩৯] সামনে তাকে হত্যা করা হয় আর এর মাধ্যমে বাগদাদে আব্বাসি খিলাফতের ইতি ঘটে।

খলিফা মুসতাসিম ধার্মিক, সংযমী ও সচ্চরিত্র ছিলেন। তিনি মুখস্থ ও বিশুদ্ধ তেলাওয়াতের অধিকারী ছিলেন। বিশিষ্ট মুহাদ্দিস শারফুদ্দিন

---

১৩৯. হালাকু খান ছিলেন মোঙ্গল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চেঙ্গিস খানের পৌত্র।

দিময়াতি রহ. তার সনদে ৪০টি হাদিস বর্ণনা করেছেন। তার হাদিস বর্ণনার ইজাজত (শাস্ত্রীয় অনুমতি) ছিল। তার থেকে অনেকেই হাদিস বর্ণনার ইজাজত লাভ করেছেন। তবে তার দূরদর্শিতা ও সাহসের অভাব ছিল।

খলিফা মুসতাসিমের উজির ছিল মুআইয়াদুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন আলকামি। সে ছিল কট্টরপন্থি শিয়া মতান্তরে ইহুদি বংশোদ্ভূত। স্বাভাবিকভাবেই তার অন্তরে আব্বাসি খিলাফতের প্রতি বিদ্বেষ লুকিয়ে ছিল এবং সে যেকোনো মূল্যে আব্বাসি খিলাফত ধ্বংস করে প্রতিশোধ নিতে উদ্গ্রীব ছিল। উজির আলকামিই তাতারদের কাছে মুসলিম সাম্রাজ্যের যাবতীয় গোপন তথ্য সরবরাহ করত এবং তাতারদের কর্মতৎপরতার সংবাদ খলিফার কাছে পৌঁছতে বাধা দিত।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে কাছির রহ.-এর বর্ণনার মাধ্যমেই আমরা বাগদাদকেন্দ্রিক আব্বাসি খিলাফতের আলোচনার ইতি টানতে চাই। তিনি বাগদাদে তাতারদের প্রবেশের বিবরণ উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন—

> এরপর এলো ৬৫৬ হিজরি। এ বছরই তাতাররা বাগদাদ দখল করে এবং বাগদাদের অধিকাংশ নাগরিককে হত্যা করে। তারা খলিফাকেও হত্যা করে। আর এর মাধ্যমেই বাগদাদে বনু আব্বাসের সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত পতন ঘটে।
>
> বছরের শুরুতেই তাতার শাসক হালাকু খানের বাহিনীর অগ্রবর্তী অংশ দুজন সেনাপতির নেতৃত্বে বাগদাদে অবতরণ করে। মসুলের শাসক তাদেরকে বাগদাদবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য হাদিয়া-তোহফা দিয়ে সহায়তা করেছিল।[১৪০] এর মাধ্যমে সে

---

১৪০. মসুলের তৎকালীন শাসকের নাম ছিল বদরুদ্দিন লুলু। আর্মেনীয় দাস বদরুদ্দিনকে জনৈক দরজি ক্রয় করে মসুলে নিয়ে আসে এবং মসুলের শাসক নুরুদ্দিন আরসালান শাহ বিন ইযযুদ্দিন বিন মাসউদকে উপহার দেয়। সুদর্শন ও প্রখর মেধার অধিকারী বদরুদ্দিন অল্পদিনের মধ্যেই নুরুদ্দিনের আস্থাভাজন হয়ে যায় এবং রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিতে পরিণত হয়। পরবর্তী সময়ে সে নুরুদ্দিনের সকল পুত্রকে হত্যা করে নিজেই মসুলের শাসক পদে অধিষ্ঠিত হয়। শিয়া মতাদর্শী বদরুদ্দিন একটানা প্রায় পঞ্চাশ বছর মসুল শাসন করে। সে প্রতিবছর আলি রাযি.-এর মাজারে এক হাজার দিনার ওজনের স্বর্ণ প্রেরণ করত। বাগদাদ=

তাতারি আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে এবং তাদের মনস্তুষ্টি অর্জন করতে চেয়েছিল। আল্লাহ তাদেরকে লাঞ্ছিত করুন। (তাতার বাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়ে) পুরো বাগদাদকে নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে দেওয়া হয়, মিনজানিক ও অন্যান্য প্রতিরোধক অস্ত্র স্থাপন করা হয়। কিন্তু এসব অস্ত্রের কি ক্ষমতা আছে আল্লাহ-নির্ধারিত তাকদিরের প্রতিরোধ করার?! যেমন এক বর্ণনায় আছে—

«لَنْ يُغْنِيَ حَذَرٌ عَنْ قَدَرٍ»

তাকদিরের সামনে কোনো ধরনের তাদবির ও সতর্কতা কাজে আসে না।

আল্লাহ তাআলা যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন—

﴿إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ﴾

> নিশ্চয়ই আল্লাহর নির্ধারিত কাল যখন এসে যায়, তখন আর তা বিলম্বিত হয় না। [সুরা নূহ : ০৪]

তাতাররা খলিফার বাসগৃহ অবরোধ করে চতুর্দিক থেকে তির নিক্ষেপ করতে শুরু করে। একটি তির খলিফার সামনে ক্রীড়ারত জনৈকা ক্রীতদাসীর শরীরে বিদ্ধ হয়। এই দাসীটি ছিল খলিফার অন্যতম মূল্যবান ও উৎকৃষ্ট দাসী। জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকে তিরটি তার গায়ে বিদ্ধ হতেই সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। সে তখন খলিফার সামনে নৃত্য করছিল এবং খলিফাকে আনন্দ দিচ্ছিল। খলিফা এতে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যান। বিদ্ধ হওয়া তিরটি খলিফার সামনে উপস্থিত করা হয়। তাতে লেখা ছিল—

> 'আল্লাহ যখন নিজ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ইচ্ছা করেন, তখন বুদ্ধিমানদের বিবেকবুদ্ধি বিলোপ করে দেন।'

=ধ্বংসের পর হালাকু খান যখন বাগদাদ ত্যাগ করেন, তখন বদরুদ্দিন তার খেদমতে উপস্থিত হয়ে তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। [মূল গ্রন্থের টীকা]

এরপর খলিফা প্রহরা ও সতর্কতা বৃদ্ধির নির্দেশ প্রদান করেন। পুরো প্রাসাদকে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তাপর্দায় ঢেকে দেওয়া হয়।

এ বছরেরই ১২ মুহাররম হালাকু খান তার পুরো বাহিনী নিয়ে বাগদাদে উপস্থিত হয়। তার বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় দুই লক্ষ। হালাকু খান খলিফার প্রতি প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ ছিল। এর কারণ হলো, হালাকু খান যখন প্রথমবার হামাদান থেকে ইরাক অভিমুখে রওনা হয়েছিল, তখন উজির মুআইয়াদুদ্দিন বিন আলকামি খলিফাকে পরামর্শ দিয়েছিল যে, তিনি যেন হালাকু খানের কাছে অতি মূল্যবান কিছু উপঢৌকন প্রেরণ করেন এবং এর মাধ্যমে তোষামোদ করে হালাকু খানকে বাগদাদে আক্রমণ করা হতে নিবৃত্ত রাখেন। কিন্তু খলিফার নবীন দুআইদার (লিপিকার ও বার্তাপ্রেরক) আইবেকসহ অনেকে খলিফাকে এরূপ করতে নিষেধ করেন। তারা খলিফাকে বোঝান যে, উজির ইবনুল আলকামি মূলত এর মাধ্যমে তাতার সম্রাটের আস্থাভাজন হতে চাচ্ছে। তারা খলিফাকে সামান্যকিছু হাদিয়া পাঠানোর পরামর্শ দেন। খলিফা যৎসামান্য হাদিয়া পাঠালে হালাকু খান অপমানিত বোধ করেন এবং খলিফার কাছে বার্তা পাঠিয়ে আইবেক ও সুলায়মান শাহকে তার হাতে তুলে দিতে বলেন। কিন্তু খলিফা তাদেরকে পাঠাতে সম্মত হননি।

যাই হোক, হালাকু খান তার খোদাদ্রোহী-অত্যাচারী বিশাল বাহিনী নিয়ে বাগদাদে উপস্থিত হয়। তারা না আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখত, না পরকালের প্রতি। হালাকু বাহিনী পূর্ব-পশ্চিম উভয় দিক থেকে বাগদাদ ঘেরাও করে ফেলে। বাগদাদের সেনাবাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল খুবই অল্প, একেবারেই নগণ্য। অশ্বারোহী সৈন্য দশ হাজারও ছিল না। তাদেরকে ও অন্যান্য সৈনিকদেরকে কিছুদিন পূর্বেই জায়গির হতে বঞ্চিত করা হয়েছিল। তাই তারা বাধ্য হয়ে বাজারঘাট ও বিভিন্ন মসজিদের দরজায় ভিড় করে ভিক্ষা করছিল। পেশাদার কবিরা তাদের মাঝে ঘুরে-ফিরে সান্ত্বনামূলক এবং ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য শোকপ্রকাশক বিভিন্ন কবিতা পাঠ করছিল। এ সবকিছু হচ্ছিল রাফিজি উজির ইবনুল আলকামির নির্দেশনায়।

পূর্ববর্তী বছর সুন্নি ও রাফিজিদের মধ্যে বিরাট সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছিল। তখন কারখসহ রাফিজিদের বিভিন্ন এলাকায় লুটপাট হয়, এমনকি উজির ইবনুল আলকামির নিকটজনদের অনেকের ঘরেও লুটপাট হয়। এতে তার ক্রোধ আরও বৃদ্ধি পায় এবং সে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে এমন ভয়ানক ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে থাকে, যার পরিণতি এত ভয়াবহ যে, বাগদাদ নগরীর পত্তনকাল হতে আজ পর্যন্ত এরূপ ভয়াবহ ঘটনা সংঘটিত হয়নি। এ কারণেই তাতার বাহিনী বাগদাদ অবরোধ করার পর বাগদাদ হতে সবার আগে যে তাতারদের উদ্দেশে বের হয়ে আসে, সে হলো এই ইবনুল আলকামি।

ইবনুল আলকামি তার পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন, সেবক ও অনুচরদের নিয়ে তাতার শিবিরে পৌঁছে যায় এবং সম্রাট হালাকু খানের সঙ্গে মিলিত হয়। আল্লাহ তার প্রতি অভিসম্পাত করুন। এরপর সে ফিরে আসে এবং খলিফাকে হালাকু খানের সামনে উপস্থিত হয়ে সন্ধি আলোচনায় প্রতিনিধিত্ব করার পরামর্শ দেয়। সে প্রস্তাব দেয়, খলিফা যেন ইরাকের বার্ষিক খারাজের অর্ধেক খলিফার থাকবে আর অর্ধেক তাতারদেরকে প্রদান করা হবে—এই শর্তে সন্ধি করেন। খলিফা মুসতাসিম কাজি, ফকিহ, সুফি এবং রাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয় ও পদস্থ ব্যক্তিবর্গের সাতশ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল নিয়ে হালাকু খানের সঙ্গে সাক্ষাতের লক্ষ্যে বের হন। প্রতিনিধিদল হালাকু খানের তাঁবুর কাছে পৌঁছলে প্রহরীরা খলিফাকে বাধা প্রদান করে এবং মাত্র সতেরোজনকে সঙ্গে নিয়ে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেয়। খলিফা সতেরোজনকে বাছাই করে তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করেন। বাকিদেরকে বাহন থেকে নামিয়ে সঙ্গে থাকা আত্মরক্ষার সবকিছু কেড়ে নেওয়া হয় এবং একে একে সকলকে হত্যা করা হয়। এরপর খলিফাকে হালাকু খানের সামনে উপস্থিত করা হয়। হালাকু খান তাকে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। কথিত আছে, হালাকু খানের প্রতাপের সামনে প্রচণ্ড ভীত খলিফার কথা বারবার জড়িয়ে আসছিল।

এরপর খলিফা খাজা নাসিরুদ্দিন তুসি ও উজির ইবনুল আলকামিসহ অন্যদের সঙ্গে বাগদাদে ফিরে আসেন। খলিফাকে প্রহরা দিয়ে নিয়ে আসা হয়। খলিফা রাজপ্রাসাদ হতে স্বর্ণ, অলংকার, দামি রত্ন ও অন্যান্য মূল্যবান সম্পদ উপস্থিত করেন। উক্ত রাফিজি দল ও অন্যান্য মুনাফিকরা হালাকু খানকে খলিফার সঙ্গে সন্ধি না করার পরামর্শ দেয়। উজির ইবনুল আলকামি তাকে বলে, 'অর্ধেক খারাজ প্রদানের চুক্তি করা হলে তা সর্বোচ্চ এক-দুই বছর টিকবে। তারপর অবস্থা যেমন ছিল, তেমন হয়ে যাবে।' তারা হালাকু খানকে বোঝায় যে, সন্ধি করার পরিবর্তে খলিফাকে হত্যা করাই শ্রেয়তর হবে। খলিফা যাবতীয় মূল্যবান সম্পদ নিয়ে হালাকু খানের কাছে উপস্থিত হলে তিনি খলিফাকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। কথিত আছে, খলিফাকে হত্যা করার পরামর্শ উজির ইবনুল আলকামি ও নাসিরুদ্দিন তুসিই দিয়েছিল। হালাকু খান যখন আলমুত দুর্গ জয় করেন এবং ইসমাইলিদের হাত থেকে তা কেড়ে নেন, তখন থেকেই নাসিরুদ্দিন তুসি হালাকু খানের সঙ্গী হয়েছিল। হালাকু খান তাকে নিজের উপদেষ্টা-উজির মনোনীত করেন। হালাকু খান যখন খলিফাকে হত্যা করতে দ্বিধা ও ভয় করছিলেন, তখন নাসিরুদ্দিন তুসি হালাকু খানকে বারবার প্ররোচিত করে উৎসাহ জোগাতে থাকে। সে হালাকু খানকে বলে, 'খলিফাকে অস্ত্রাঘাতে হত্যা না করে বরং বস্তায় ভরে উপর্যুপরি পদাঘাতে হত্যা করা হোক। এর ফলে তার রক্ত মাটিতে পতিত হবে না এবং পরবর্তীকালে তার প্রতিশোধও নেওয়া হবে না!'

খলিফাকে কীভাবে হত্যা করা হয়েছিল, তা নিয়ে অবশ্য বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। অনেকেই বস্তায় ভরে পদাঘাতের কথা বললেও কেউ কেউ শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করার কথাও বলেছেন। আবার অনেকের ধারণা, খলিফাকে পানিতে ডুবিয়ে হত্যা করা হয়। সঠিক তথ্য সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ তাআলা অবগত।

নিঃসন্দেহে খলিফাসহ যাদেরকে হত্যা করা হয়েছে, অর্থাৎ নেতৃস্থানীয় উলামায়ে কেরাম, বিচারক, রাজপরিবারের সদস্য, রাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয় নেতৃবৃন্দ—তাদের সকলের গোনাহর বোঝা

হত্যাকারীরা বহন করবে। এরপর হালাকু বাহিনী পুরো বাগদাদে ছড়িয়ে পড়ে এবং নারী-পুরুষ, শিশু-তরুণ-বৃদ্ধ-বয়োবৃদ্ধ—নির্বিচারে সকলকে হত্যা করে। আত্মরক্ষার জন্য অনেকে কূপ, ঝোপঝাড় ও ময়লার স্তূপের মধ্যে দিনের পর দিন লুকিয়ে ছিল। অনেকে দরজা বন্ধ করে গৃহাভ্যন্তরেই অবস্থান করছিল। তাতাররা দরজা ভেঙে বা দরজায় আগুন লাগিয়ে সেসব ঘরে প্রবেশ করে। অনেকে পালিয়ে বিভিন্ন উঁচু স্থানে আশ্রয় নিয়েছিল। হালাকু বাহিনী ছাদ ভেঙে ফেলে তাদেরকেও হত্যা করে। নিহত মানুষের রক্তে অলিগলির নালাগুলোতে রক্তের ধারা প্রবাহিত হচ্ছিল। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

যারা মহল্লার মসজিদ, জামে মসজিদ বা খানকায় আশ্রয় নিয়েছিল, তারাও নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়। হত্যাযজ্ঞ থেকে রেহাই পেয়েছিল কেবল ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা; তাদের কাছে আশ্রয় গ্রহণকারীরা, উজির ইবনুল আলকামির গৃহে আশ্রয়গ্রহণকারীরা এবং অল্প কয়েকজন ব্যবসায়ী, যারা প্রচুর পরিমাণ সম্পদ প্রদান করে নিজেদের জানমালের নিরাপত্তা লাভ করেছিল। যে সুবিশাল নগরী ছিল লক্ষ মানুষের কলতানে মুখরিত অনিন্দ্য ও মনোরম এক নগরী, সেই বাগদাদ এমন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় যে, মনে হচ্ছিল—এখানে হাতেগোনা গুটিকয়েক মানুষই বসবাস করে!

যারা বেঁচে ছিল, তারাও ছিল ভয় ও ক্ষুধা, লাঞ্ছনা ও বিচ্ছিন্নতায় আক্রান্ত। এ ঘটনার অনেক আগ থেকেই উজির ইবনুল আলকামি সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করার এবং সরকারি তালিকা থেকে তাদের নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। খলিফা মুসতানসিরের আমলের শেষদিকেও সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় এক লক্ষের মতো। তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল আমির পদমর্যাদার অধিকারী, যারা গভর্নরদের ন্যায় মর্যাদা লাভ করত। ইবনুল আলকামি তার

প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখে এই সুবিশাল সেনাবাহিনীর সৈন্যসংখ্যা কমিয়ে দশ হাজারে নিয়ে আসে।[১৪১]

এরপর সে উপর্যুপরি পত্রপ্রেরণের মাধ্যমে তাতারদেরকে বাগদাদ দখল করতে প্ররোচিত করতে থাকে। সে তাদেরকে বোঝায় যে, এখন বাগদাদ দখল করা একেবারেই সহজ, বাগদাদের প্রকৃত নিরাপত্তাব্যবস্থা, সেনাবাহিনী ও সেনাপতিদের অবস্থা বড় দুর্বল। তার উদ্দেশ্য ও চাওয়া ছিল বাগদাদের মাটিতে সুন্নাহকে সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ করে দেওয়া, রাফিজি বিদআত প্রতিষ্ঠা করা, উবায়দি কোনো ব্যক্তিকে খলিফা পদে অধিষ্ঠিত করা এবং আলিম-উলামা ও মুফতিদেরকে চিরতরে সরিয়ে দেওয়া। কিন্তু মহান আল্লাহ তো আপন বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি ইবনুল আলকামির ষড়যন্ত্র তার বিরুদ্ধেই চাপিয়ে দেন, মর্যাদাপূর্ণ জীবনের পর লাঞ্ছনার জীবন দান করেন এবং তাকে খলিফার উজিরের পদ থেকে তাতারদের চাকর ও কুমন্ত্রণাদাতায় পরিণত করেন। বাগদাদে যত নারী-পুরুষ, আবালবৃদ্ধবনিতা নির্মম হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়েছে, সকলের গুনাহর বোঝাও তার ঘাড়ে বর্তেছে। বিধান তো একমাত্র আল্লাহ তাআলার; যিনি সুমহান, যিনি আসমান-জমিনের প্রতিপালক।

এই মহাদুর্যোগে বাগদাদে কী পরিমাণ মুসলমান নিহত হয়েছিল, তা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। আট লক্ষ, আঠারো লক্ষ, বিশ লক্ষ—এ রকম বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য আর আমরাও তার কাছেই ফিরে যাব।

তাতাররা বাগদাদে প্রবেশ করেছিল মুহাররম মাসে। এরপর একটানা চল্লিশ দিন চলে হত্যাযজ্ঞ। আমিরুল মুমিনিন মুসতাসিম বিল্লাহকে হত্যা করা হয় সফর মাসের চৌদ্দ তারিখ বুধবার। তার কবরের কোনো চিহ্ন রাখা হয়নি। এ সময় তার

---

১৪১. উজির ইবনুল আলকামি যখন হালাকু খানকে বাগদাদ হামলায় প্ররোচিত করে পত্র পাঠান, তখন হালাকু খান প্রথমে রাজি হতে চাননি। পরে তিনি তার উজির নাসিরুদ্দিন তুসির অব্যাহত প্ররোচনায় রাজি হলেও শর্তারোপ করেন যে, ইবনুল আলকামিকে অবশ্যই যেকোনো মূল্যে বাগদাদের সেনাবাহিনী সংকুচিত করে ফেলতে হবে।

বয়স ছিল ছেচল্লিশ বছর চার মাস। তার খিলাফতকালের পরিধি ছিল পনেরো বছর আট মাসের সামান্য বেশি। তার সঙ্গে তার বড় পুত্র আবুল আব্বাস আহমাদকে হত্যা করা হয়, যার বয়স ছিল পঁচিশ বছর। এরপর হত্যা করা হয় মেজো পুত্র আবুল ফজল আবদুর রহমানকে, যার বয়স ছিল তেইশ বছর। কনিষ্ঠ পুত্র মুবারক ও তিন কন্যা ফাতিমা, খাদিজা ও মরিয়মকে বন্দি করা হয়। কথিত আছে—রাজপ্রাসাদ থেকে আরও বন্দি করা হয় প্রায় এক হাজার ক্রীতদাসীকে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

খলিফার বাসগৃহের শিক্ষক শায়খ মুহিউদ্দিন ইউসুফ বিন শায়খ আবুল ফরজ ইবনুল জাওযিকে হত্যা করা হয়। তিনি ইবনুল আলকামির ঘোর বিরোধী ছিলেন। তার তিন পুত্র আবদুল্লাহ, আবদুর রহমান ও আবদুল কারিমকেও হত্যা করা হয়। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদধারী ব্যক্তিদেরকেও একের পর এক হত্যা করা হয়। যেমন : দুআইদার আস-সাগির মুজাহিদুদ্দিন আইবেক, শিহাবুদ্দিন সুলায়মান শাহ, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর বিভিন্ন আমির এবং নগরীর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। রাজপ্রাসাদ হতে রাজপরিবারের একজন একজন করে আহ্বান করা হতো। যাকে আহ্বান করা হতো, সে তার স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে বের হয়ে এলে তাকে খিলাল কবরস্তানে নিয়ে যাওয়া হতো এবং বকরির ন্যায় জবাই করা হতো। তার কন্যা ও দাসীদের মধ্য হতে তাতাররা যাদেরকে নির্বাচন করত, তাদেরকে বন্দি করা হতো। বাগদাদের মহান শায়খ ও খলিফার রাজশিক্ষক সদরুদ্দিন আলি ইবনুন নাইয়ারকেও হত্যা করা হয়। বেছে বেছে হত্যা করা হয় খতিব, ইমাম ও কুরআনের হাফিজদেরকে। দীর্ঘ কয়েক মাস বাগদাদের মসজিদগুলো বিরান পড়ে ছিল। নামাজের জামাত বা জুমা কিছুই আদায় করা হয়নি। উজির ইবনুল আলকামি (আল্লাহ তাআলা তার অনিষ্ট করুন, তাকে অভিশপ্ত করুন) চেয়েছিল, বাগদাদের মসজিদ, মাদরাসা ও খানকাগুলো যেন বিরান হয়ে যায় আর মাজার ও রাফিজি মহল্লাগুলো যেন আবাদ থাকে। সে রাফিজিদের জন্য একটি বিশাল ও শানদার মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল, যেখান থেকে রাফিজিরা তাদের নীতি

ও আদর্শ প্রচার করবে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাকে সেই তাওফিক দান করেননি। বরং তার থেকে আপন নিয়ামত ছিনিয়ে নিয়েছেন এবং এই ঘটনার কয়েক মাসের মধ্যেই তাকে দুনিয়া থেকে তুলে নিয়েছেন। এর কিছুদিন পর তার পুত্রও পিতার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তর সম্পর্কে আল্লাহই সর্বজ্ঞ!

তাকদির-নির্ধারিত ধ্বংসযজ্ঞ যখন শেষ হয় এবং চল্লিশ দিন পূর্ণ হয়, বাগদাদ তখন বিরান। অতি অল্প সংখ্যক লোকই বেঁচে ছিল। পথেঘাটে টিলার ন্যায় লাশের স্তুপ পড়ে ছিল। এরপর বৃষ্টি হওয়ায় লাশগুলো বিকৃত হয়ে যায় এবং বাতাস লাশের দুর্গন্ধে ভারী হয়ে যায়। আবহাওয়া দূষিত হয়ে পড়ে এবং মহামারি ছড়িয়ে পড়ে। সুদূর শাম পর্যন্ত সকল এলাকার বাতাস দূষিত হয়ে পড়ে। আবহাওয়ার পরিবর্তন ও দূষিত বাতাসের কারণে বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক মানুষ মারা যায়। অনেক স্থানে দুর্মূল্য, মহামারি ও প্লেগের কারণে গণমৃত্যুর ঘটনা ঘটে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

এরপর যখন বাগদাদে নিরাপত্তার ঘোষণা প্রদান করা হয়, তখন বিভিন্ন গর্ত ও কবরস্তান থেকে লুকিয়ে থাকা মানুষেরা বের হয়ে আসে। তাদেরকে দেখে মনে হচ্ছিল, যেন মৃত মানুষ কবর থেকে বের হয়ে আসছে! একে অপরকে চিনতে পারছিল না। বাবা ছেলেকে, ভাই ভাইকে চিনছিল না। দূষিত আবহাওয়ার শিকার হয়ে তারাও মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং পূর্ববর্তীদের সঙ্গে মিলিত হয়। যারা এতদিন ভূপৃষ্ঠে একসঙ্গে জীবনযাপন করত; এবার তারা ভূগর্ভে মিলিত হয় সেই মহান সত্তার হুকুমে, যিনি গোপন ও অতি গোপন—সবকিছুই জানেন। আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই। তার আছে সুন্দরতম নামসমূহ।

বাগদাদে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাকারী তাতার সম্রাট হালাকু খান এ বছরের জুমাদাল উলা মাসে বাগদাদ ত্যাগ করে তার রাজধানীতে ফিরে যায়। আর উজির ইবনুল আলকামি; আল্লাহ তাআলা তাকে না ছাড় দিয়েছেন, না ছেড়ে দিয়েছেন। বরং মহা শক্তিমান আল্লাহ তাআলা জুমাদাল উখরার শুরুতেই তেষট্টি বছর

বয়সী ইবনুল আলকামিকে পাকড়াও করেছেন। ইবনুল আলকামির রচনা ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি ছিল। কিন্তু সে ছিল কট্টর শিয়া ও দুষ্ট রাফিজি। দুঃখ, পরিতাপ ও নিরাশাকে সঙ্গী করেই তার মৃত্যু হয় এবং দুর্যোগ তাকে যথাস্থানে পৌঁছিয়ে দেয়। তার মৃত্যুর পর তার পুত্র ইযযুদ্দিন ইবনুল ফজল মুহাম্মাদ উজিরের পদ গ্রহণ করে। কিন্তু একই বছর আল্লাহ তাআলা তাকেও তার পিতার সঙ্গে মিলিত করে দেন। যাবতীয় প্রশংসা ও দয়া আল্লাহরই।

আবু শামা, আমাদের শায়খ আবু আবদুল্লাহ যাহাবি ও কুতুবুদ্দিন ইউনিনি বর্ণনা করেন, এ বছরই (৬৫৬ হিজরি) শামের জনগণ কঠিন মহামারির শিকার হয়। তারা উল্লেখ করেন যে, ইরাকে প্রচুর মানুষ নিহত হওয়ার কারণে বাতাস ও আবহাওয়া দূষিত হয়ে পড়েছিল এবং দূষিত বাতাস শাম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।[১৪২]

* * *

---

১৪২. ইবনে কাছির দিমাশকি, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ১৩/১৭৯-১৮২।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

তাতারদের হাতে বাগদাদের পতন-পরবর্তী সময়ের মিশরকেন্দ্রিক আব্বাসি খলিফাগণের বিবরণ

[৬৫৯-৯২৩ হিজরি—১২৬১-১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দ]

খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠা[১৪৩]

৬৫৬ হিজরি সনের মুহাররম মাসে (১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে) হালাকু খানের হাতে বাগদাদের পতন ঘটে এবং আব্বাসি রাজপরিবার তাতারদের নির্মম হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়। রাজপরিবারের দুজন যুবরাজসহ হাতেগোনা অল্প কয়েকজন সদস্য এই গণহত্যা থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হন এবং ছদ্মবেশে ইরাকের বিভিন্ন মরু অঞ্চলে লুকিয়ে থাকেন। ৩৫নং আব্বাসি খলিফা আযযাহির মুহাম্মাদের পুত্র আবুল কাসিম আহমাদ[১৪৪] এবং ২৯ নং আব্বাসি খলিফা মুসতারশিদ বিল্লাহর চতুর্থ অধস্তন পুরুষ আবুল আব্বাস আহমাদ (বিন আবু আলি কুব্বি বিন আলি বিন আবু বকর বিন মুসতারশিদ) ছিলেন সেই দুই সৌভাগ্যবান যুবরাজ।

স্বাভাবিকভাবেই বাগদাদের আব্বাসি রাষ্ট্র ও আব্বাসি রাজপরিবারের পতনে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ সীমাহীন ব্যথিত হয়ে পড়ে। কারণ, যতই দুর্বল ও ক্ষয়িষ্ণু হোক না কেন, আব্বাসি খিলাফত ছিল বৃহত্তর মুসলিম উম্মাহর খিলাফত পরিচয়ের ধারক ও রক্ষক। অধিকন্তু খিলাফতব্যবস্থা হলো উম্মাহর ঐক্য, সম্প্রীতি ও অবিচ্ছিন্নতা রক্ষার অন্যতম চাবিকাঠি। আর তাই মুসলিম উম্মাহর অন্যান্য সদস্যের ন্যায় তৎকালীন মিশরকেন্দ্রিক মামলুক রাষ্ট্রের অধিপতি সুলতান রুকনুদ্দিন বাইবার্সও খিলাফতশূন্যতায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন এবং আব্বাসি রাজপরিবারের কোনো জীবিত সদস্যকে হন্যে হয়ে খুঁজছিলেন। অবশেষে বাগদাদে আব্বাসি রাষ্ট্রের পতনের প্রায় সাড়ে তিন বছর পর ৬৫৯ হিজরির রজব মাসে (১২৬১ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে) সুলতান বাইবার্স উল্লিখিত দুই যুবরাজের সন্ধান পেয়ে তাদেরকে মিশরে আগমনের আমন্ত্রণ জানান। তারা উভয়ে মিশরে উপস্থিত হলে সুলতান বাইবার্স আবুল কাসিম আহমাদকে 'আল-

---

১৪৩. পরিচ্ছেদটি অনুবাদক কর্তৃক সংযোজন করা হয়েছে।

১৪৪. বাগদাদে তাতারদের আগ্রাসন চলাকালে তিনি জেলে বন্দি ছিলেন। এ সময় কারারক্ষীরা কারাগারের দরজা উন্মুক্ত করে দিলে তিনি পালিয়ে মরুভূমি অঞ্চলে চলে যান। আইনে জালুতের প্রান্তরে তাতারদের বিরুদ্ধে মামলুকদের বিজয়ের সংবাদ পাওয়ার পর তিনি তার ভাই যুবরাজ আবুল আব্বাস আহমাদসহ কায়রোয় উপস্থিত হয়ে মামলুক সুলতানের সামনে নিজেদের বংশপ্রমাণ উপস্থাপন করেন। আরেক মতানুসারে স্বয়ং সুলতান বাইবার্স গুপ্তচরের মাধ্যমে তাদেরকে খুঁজে বের করেছিলেন।

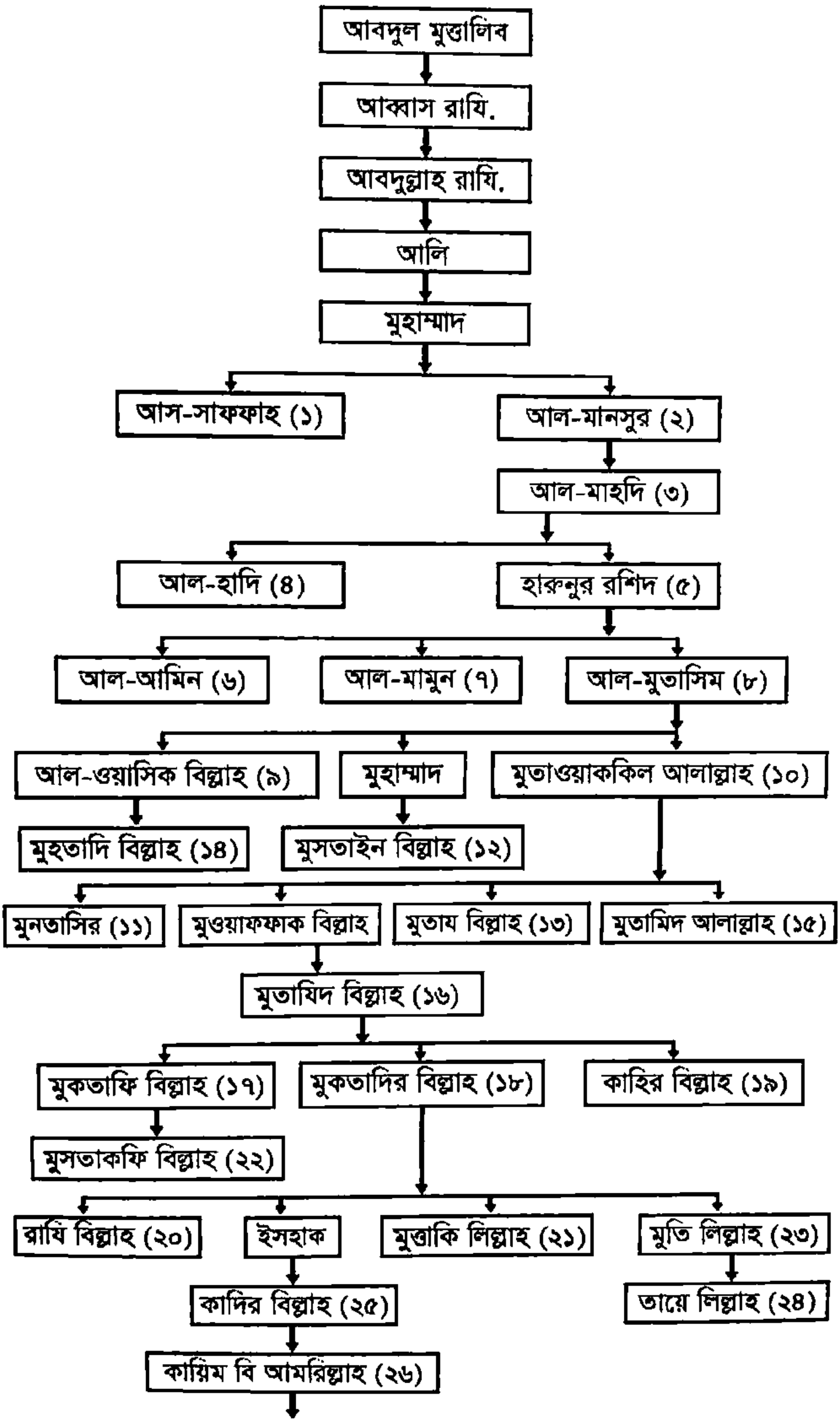
মুসতানসির বিল্লাহ' উপাধি দিয়ে মুসলিম জাহানের খলিফা ঘোষণা করেন। এর মাধ্যমে সাড়ে তিন বছরের বিরতির পর আবারও আব্বাসি খিলাফতের পথচলা শুরু হয় এবং বাগদাদের পর এবার মিশরকেন্দ্রিক আব্বাসি খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। ৬৬০ হিজরি সনে (১২৬২ খ্রিষ্টাব্দে) খলিফা (২য়) আল-মুসতানসির তাতারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করলে সুলতান রুকনুদ্দিন বাইবার্স অপর আব্বাসি রাজপুত্র আবুল আব্বাস আহমাদকে 'হাকিম বি আমরিল্লাহ' উপাধি দিয়ে পরবর্তী খলিফা ঘোষণা করেন। এরপর থেকে হাকিম বি আমরিল্লাহর বংশধরগরাই খলিফার দায়িত্ব পালন করতে থাকে।

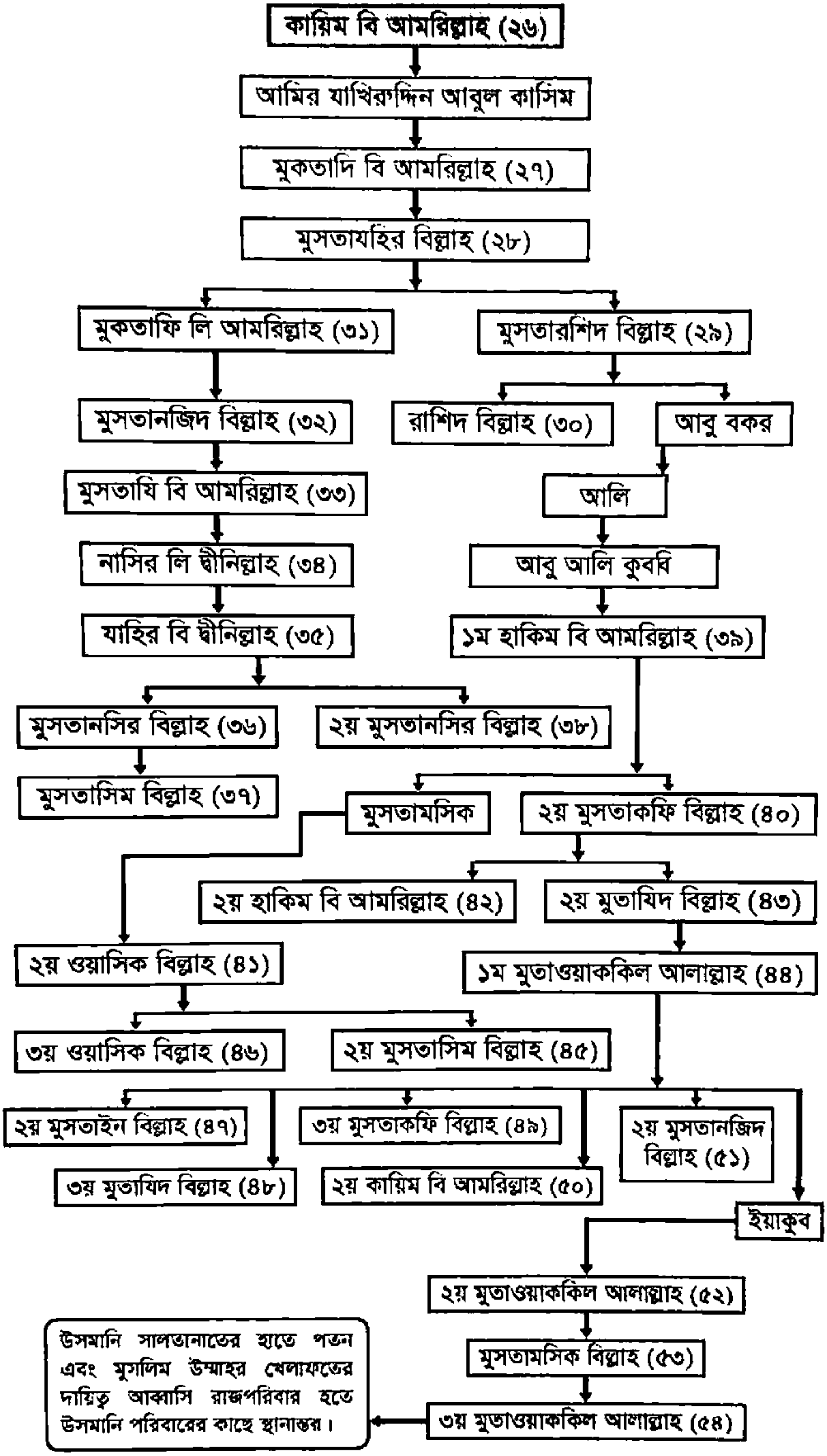
মিশরকেন্দ্রিক এই আব্বাসি খিলাফত আড়াই শতাব্দীর অধিক সময় টিকে ছিল। ৯২৩ হিজরি সনে (১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দে) উসমানি সুলতান ১ম সেলিম মিশর জয় করে তৎকালীন আব্বাসি খলিফা ৩য় মুতাওয়াককিলকে বন্দি করে ইস্তাম্বুলে নিয়ে যান। মুতাওয়াককিল সেলিমের কাছে এ মর্মে অসিয়ত করেন যে, তার মৃত্যুর পর মুসলিম উম্মাহর খিলাফতের দায়িত্ব আব্বাসি রাজবংশ হতে উসমানি পরিবারের কাছে স্থানান্তরিত হবে। খলিফা মুতাওয়াককিল নিজের কাছে সংরক্ষিত খিলাফতের বিভিন্ন নিদর্শনও সুলতান সেলিমের কাছে হস্তান্তর করেন। মূলত এর মাধ্যমেই আব্বাসি খিলাফতের চূড়ান্ত পতন ঘটে এবং উসমানি খিলাফতের সূচনা হয়। ৯৫০ হিজরি সনে (১৫৪৩ খ্রিষ্টাব্দে) মুতাওয়াককিলের মৃত্যু হলে কাগজে-কলমেও আব্বাসি খিলাফতের পতন ঘটে এবং উসমানি খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৩২ হিজরি সনে (৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে) প্রথম আব্বাসি খলিফা আস-সাফফাহর দায়িত্ব গ্রহণের মাধ্যমে যে শাসনব্যবস্থার সূচনা হয়েছিল, দীর্ঘ আট শতক পর ৯২৩ হিজরি সনে (১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দে) ৫৪ নং আব্বাসি খলিফা ৩য় মুতাওয়াককিলের পতনের মাধ্যমে তার সমাপ্তি ঘটে।

উল্লেখ্য, কায়রোকেন্দ্রিক আব্বাসি খিলাফতকালে খলিফা পদ নিছক ধর্মীয় সম্মানসূচক পদ হিসেবেই বিবেচিত হতো; মামলুক সুলতানগণই মূলত ক্ষমতার কলকাঠি নিয়ন্ত্রণ করতেন।

আব্বাসি খলিফাগণের বংশলতিকা





কায়িম বি আমরিল্লাহ (২৬)
আমির যাখিরুদ্দিন আবুল কাসিম
মুকতাদি বি আমরিল্লাহ (২৭)
মুসতাযহির বিল্লাহ (২৮)
মুকতাফি লি আমরিল্লাহ (৩১)
মুসতারশিদ বিল্লাহ (২৯)
মুসতানজিদ বিল্লাহ (৩২)
রাশিদ বিল্লাহ (৩০)
আবু বকর
মুসতাযি বি আমরিল্লাহ (৩৩)
আলি
নাসির লি দ্বীনিল্লাহ (৩৪)
আবু আলি কুব্বি
যাহির বি দ্বীনিল্লাহ (৩৫)
১ম হাকিম বি আমরিল্লাহ (৩৯)
মুসতানসির বিল্লাহ (৩৬)
২য় মুসতানসির বিল্লাহ (৩৮)
মুসতাসিম বিল্লাহ (৩৭)
মুসতামসিক
২য় মুসতাকফি বিল্লাহ (৪০)
২য় হাকিম বি আমরিল্লাহ (৪২)
২য় মুতাযিদ বিল্লাহ (৪৩)
২য় ওয়াসিক বিল্লাহ (৪১)
১ম মুতাওয়াককিল আলাল্লাহ (৪৪)
৩য় ওয়াসিক বিল্লাহ (৪৬)
২য় মুসতাসিম বিল্লাহ (৪৫)
২য় মুসতাইন বিল্লাহ (৪৭)
৩য় মুসতাকফি বিল্লাহ (৪৯)
২য় মুসতানজিদ বিল্লাহ (৫১)
৩য় মুতাযিদ বিল্লাহ (৪৮)
২য় কায়িম বি আমরিল্লাহ (৫০)
ইয়াকুব
২য় মুতাওয়াককিল আলাল্লাহ (৫২)
উসমানি সালতানাতের হাতে পতন এবং মুসলিম উম্মাহর খেলাফতের দায়িত্ব আব্বাসি রাজপরিবার হতে উসমানি পরিবারের কাছে স্থানান্তর।
মুসতামসিক বিল্লাহ (৫৩)
৩য় মুতাওয়াককিল আলাল্লাহ (৫৪)

আব্বাসি খলিফাগণের তালিকা

আব্বাসি খলিফাগণের শাসনকালের সূচনা-সমাপ্তি সময়কালসহ একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো

ক. ইরাক (বাগদাদ)-কেন্দ্রিক আব্বাসি খলিফাগণ

১ম স্তর : প্রতাপ ও সমৃদ্ধির আমলের আব্বাসি খলিফাগণ

০১.	আস-সাফফাহ আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ	:	রবিউস সানি ১৩২–জিলহজ ১৩৬ হি. ডিসেম্বর ৭৪৯–জুন ৭৫৪ খ্রি.
০২.	আল-মানসুর আবু জাফর আবদুল্লাহ	:	জিলহজ ১৩৬–জিলহজ ১৫৮ হি. জুন ৭৫৪–অক্টোবর ৭৭৫ খ্রি.
০৩.	আল-মাহদি আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ	:	জিলহজ ১৫৮–মুহাররম ১৬৯ হি. অক্টোবর ৭৭৫–জুলাই ৭৮৫ খ্রি.
০৪.	আল-হাদি আবু মুহাম্মাদ মুসা	:	মুহাররম ১৬৯–রবিউল আউয়াল ১৭০ হি. জুলাই ৭৮৫–সেপ্টেম্বর ৭৮৬ খ্রি.
০৫.	আর-রশিদ আবু জাফর হারুন	:	রবিউল আউয়াল ১৭০–জুমাদাল উখরা ১৯৩ হি. সেপ্টেম্বর ৭৮৬–মার্চ ৮০৯ খ্রি.
০৬.	আল-আমিন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ	:	জুমাদাল উখরা ১৯৩–মুহাররম ১৯৮ হি. মার্চ ৮০৯–সেপ্টেম্বর ৮১৩ খ্রি.
০৭.	আল-মামুন আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ	:	মুহাররম ১৯৮–রজব ২১৮ হি. সেপ্টেম্বর ৮১৩–আগস্ট ৮৩৩ খ্রি.
০৮.	আল-মুতাসিম বিল্লাহ আবু ইসহাক মুহাম্মদ	:	রজব ২১৮–রবিউল আউয়াল ২২৭ হি. আগস্ট ৮৩৩–জানুয়ারি ৮৪২ খ্রি.
০৯.	ওয়াসিক বিল্লাহ আবু জাফর হারুন	:	রবিউল আউয়াল ২২৭–জিলহজ ২৩২ হি. জানুয়ারি ৮৪২–আগস্ট ৮৪৭ খ্রি.
১০.	মুতাওয়াককিল আলাল্লাহ আবুল ফজল জাফর	:	জিলহজ ২৩২–শাওয়াল ২৪৭ হি. আগস্ট ৮৪৭–ডিসেম্বর ৮৬১ খ্রি.

২য় স্তর : তুর্কিদের প্রত্যক্ষ প্রভাব-নিয়ন্ত্রিত আব্বাসি খলিফাগণ

১১.	আল-মুনতাসির আবু জাফর মুহাম্মাদ	:	শাওয়াল ২৪৭–রবিউস সানি ২৪৮ হি. ডিসেম্বর ৮৬১–জুন ৮৬২ খ্রি.
১২.	মুসতাইন বিল্লাহ আবুল আব্বাস আহমাদ	:	রবিউস সানি ২৪৮–মুহাররম ২৫২ হি. জুন ৮৬২–জানুয়ারি ৮৬৬ খ্রি.
১৩.	আল-মুতায আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ	:	মুহাররম ২৫২–রজব ২৫৫ হি. জানুয়ারি ৮৬৬–জুলাই ৮৬৯ খ্রি.
১৪.	আল-মুহতাদি বিল্লাহ আবু ইসহাক মুহাম্মাদ	:	রজব ২৫৫–রজব ২৫৬ হি. জুলাই ৮৬৯–জুন ৮৭০ খ্রি.
১৫.	আল-মুতামিদ আলাল্লাহ আবুল আব্বাস আহমাদ	:	রজব ২৫৬–রজব ২৭৯ হি. জুন ৮৭০–অক্টোবর ৮৯২ খ্রি.
১৬.	আল-মুতাযিদ বিল্লাহ আবুল আব্বাস আহমাদ	:	রজব ২৭৯–রবিউস সানি ২৮৯ হি. অক্টোবর ৮৯২–এপ্রিল ৯০২ খ্রি.
১৭	মুকতাফি বিল্লাহ আবু মুহাম্মাদ আলি	:	রবিউস সানি ২৮৯–জিলকদ ২৯৫ হি. এপ্রিল ৯০২–আগস্ট ৯০৮ খ্রি.
১৮.	আল-মুকতাদির বিল্লাহ আবুল ফজল জাফর	:	জিলকদ ২৯৫–শাওয়াল ৩২০ হি. আগস্ট ৯০৮–নভেম্বর ৯৩২ খ্রি.
১৯.	আল-কাহির বিল্লাহ আবু মানসুর মুহাম্মাদ	:	শাওয়াল ৩২০–জুমাদাল উলা ৩২২ হি. নভেম্বর ৯৩২–এপ্রিল ৯৩৪ খ্রি.
২০.	রাযি বিল্লাহ আবুল আব্বাস আহমাদ	:	জুমাদাল উলা ৩২২–রবিউল আউয়াল ৩২৯ হি. এপ্রিল ৯৩৪–ডিসেম্বর ৯৪০ খ্রি.
২১.	আল-মুত্তাকি লিল্লাহ আবু ইসহাক ইবরাহিম	:	রবিউল আউয়াল ৩২৯–সফর ৩৩৩ হি. ডিসেম্বর ৯৪০–অক্টোবর ৯৪৪ খ্রি.

৩য় স্তর : শিয়া বুওয়াইহি পরিবার-নিয়ন্ত্রিত আব্বাসি খলিফাগণ

২২.	মুসতাকফি বিল্লাহ আবুল কাসিম আবদুল্লাহ	:	সফর ৩৩৩–জুমাদাল উখরা ৩৩৪ হি. অক্টোবর ৯৪৪–জানুয়ারি ৯৪৬ খ্রি.

২৩.	মুতি লিল্লাহ আবুল কাসিম ফজল	:	জুমাদাল উখরা ৩৩৪–জিলকদ ৩৬৩ হি. জানুয়ারি ৯৪৬–আগস্ট ৯৭৪ খ্রি.
২৪.	তায়ে লিল্লাহ আবু বকর আবদুল কারিম	:	জিলকদ ৩৬৩–শাবান ৩৮১ হি. আগস্ট ৯৭৪–অক্টোবর ৯৯১ খ্রি.
২৫.	আল-কাদির বিল্লাহ আবুল আব্বাস আহমাদ	:	শাবান ৩৮১–জিলহজ ৪২২ হি. অক্টোবর ৯৯১–নভেম্বর ১০৩১ খ্রি.
২৬.	আল-কায়িম বি আমরিল্লাহ আবু জাফর আবদুল্লাহ	:	জিলহজ ৪২২–শাবান ৪৬৭ হি. নভেম্বর ১০৩১–এপ্রিল ১০৭৫ খ্রি.

৪র্থ স্তর : তুর্কি সেলজুক পরিবার-নিয়ন্ত্রিত আব্বাসি খলিফাগণ

২৭.	মুকতাদি বি আমরিল্লাহ আবুল কাসিম আবদুল্লাহ	:	শাবান ৪৬৭–মুহাররম ৪৮৭ হি. এপ্রিল ১০৭৫–ফেব্রুয়ারি ১০৯৪ খ্রি.
২৮.	আল-মুসতাযহির বিল্লাহ আবুল আব্বাস আহমাদ	:	মুহাররম ৪৮৭–রবিউস সানি ৫১২ হি. ফেব্রুয়ারি ১০৯৪–আগস্ট ১১১৮ খ্রি.
২৯.	আল-মুসতারশিদ বিল্লাহ আবু মানসুর ফজল	:	রবিউস সানি ৫১২–জিলকদ ৫২৯ হি. আগস্ট ১১১৮–আগস্ট ১১৩৫ খ্রি.
৩০.	আর-রাশিদ বিল্লাহ আবু জাফর মানসুর	:	জিলকদ ৫২৯–জিলকদ ৫৩০ হি. আগস্ট ১১৩৫–আগস্ট ১১৩৬ খ্রি.
৩১.	মুকতাফি লি আমরিল্লাহ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ	:	জিলকদ ৫৩০–রবিউল আউয়াল ৫৫৫ হি. আগস্ট ১১৩৬–মার্চ ১১৬০ খ্রি.
৩২.	আল-মুসতানজিদ বিল্লাহ আবুল মুযাফফার ইউসুফ	:	রবিউল আউয়াল ৫৫৫–রবিউস সানি ৫৬৬ হি. মার্চ ১১৬০–ডিসেম্বর ১১৭০ খ্রি.
৩৩.	আল-মুসতাযি বি আমরিল্লাহ আবু মুহাম্মাদ হাসান	:	রবিউস সানি ৫৬৬–জিলকদ ৫৭৫ হি. ডিসেম্বর ১১৭০–মার্চ ১১৮০ খ্রি.
৩৪.	আন-নাসির লি দ্বীনিল্লাহ আবুল আব্বাস আহমাদ	:	জিলকদ ৫৭৫–রমজান ৬২২ হি. মার্চ ১১৮০–অক্টোবর ১২২৫ খ্রি.

৫ম স্তর : তাতারদের আগ্রাসন চলাকালীন আব্বাসি খলিফাগণ

৩৫.	আয-যাহির বি আমরিল্লাহ আবু নাসর মুহাম্মাদ	:	শাওয়াল ৬২২–রজব ৬২৩ হি. অক্টোবর ১২২৫–জুলাই ১২২৬ খ্রি.
৩৬.	আল-মুসতানসির বিল্লাহ আবু জাফর মানসুর	:	রজব ৬২৩–জুমাদাল উখরা ৬৪০ হি. জুলাই ১২২৬–ডিসেম্বর ১২৪২ খ্রি.
৩৭.	মুসতাসিম বিল্লাহ আবু আহমাদ আবদুল্লাহ	:	জুমাদাল উখরা ৬৪০–সফর ৬৫৬ হি. ডিসেম্বর ১২৪২–ফেব্রুয়ারি ১২৫৮ খ্রি.

খ. মিশর (কায়রো)-কেন্দ্রিক আব্বাসি খলিফাগণের তালিকা

৩৮.	২য় মুসতানসির বিল্লাহ আবুল কাসিম আহমাদ	:	৬৫৯-৬৬০ হি. (১২৬১-১২৬২ খ্রি.)
৩৯.	১ম হাকিম বি আমরিল্লাহ আবুল আব্বাস আহমাদ	:	৬৬০-৭০১ হি. (১২৬২-১৩০২ খ্রি.)
৪০.	২য় মুসতাকফি বিল্লাহ আবুর রবি সুলায়মান	:	৭০১-৭৪০ হি. (১৩০২-১৩৪০ খ্রি.)
৪১.	২য় ওয়াসিক বিল্লাহ আবু ইসহাক ইবরাহিম	:	৭৪০-৭৪২ হি. (১৩৪০-১৩৪১ খ্রি.)
৪২.	২য় হাকিম বি আমরিল্লাহ আবুল আব্বাস আহমাদ	:	৭৪২-৭৫৩ হি. (১৩৪১-১৩৫২ খ্রি.)
৪৩.	২য় মুতাযিদ বিল্লাহ আবুল ফাতাহ আবু বকর	:	৭৫৩-৭৬৩ হি. (১৩৫২-১৩৬২ খ্রি.)
৪৪. (ক)	১ম মুতাওয়াককিল আলাল্লাহ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ	:	৭৬৩-৭৭৯ হি. (১৩৬২-১৩৭৭ খ্রি.)
৪৫. (ক)	২য় মুসতাসিম বিল্লাহ আবু ইয়াহইয়া জাকারিয়া	:	৭৭৯-৭৭৯ হি. (১৩৭৭-১৩৭৭ খ্রি.)

৪৪. (খ)	১ম মুতাওয়াককিল আলাল্লাহ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ	:	৭৭৯-৭৮৫ হি. (১৩৭৭-১৩৮৩ খ্রি.)
৪৬.	৩য় ওয়াসিক বিল্লাহ আবু হাফস উমর	:	৭৮৫-৭৮৮হি. (১৩৮৩-১৩৮৬ খ্রি.)
৪৫. (খ)	২য় মুসতাসিম বিল্লাহ আবু ইয়াহইয়া জাকারিয়া	:	৭৮৮-৭৯১ হি. (১৩৮৬-১৩৮৯ খ্রি.)
৪৪. (গ)	১ম মুতাওয়াককিল আলাল্লাহ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ	:	৭৯১-৮০৮ হি. (১৩৮৯-১৪০৬ খ্রি.)
৪৭.	২য় মুসতাইন বিল্লাহ আবুল ফজল আব্বাস	:	৮০৮-৮১৬ হি. (১৪০৬-১৪১৪ খ্রি.)
৪৮.	৩য় মুতাযিদ বিল্লাহ আবুল ফাতাহ দাউদ	:	৮১৬-৮৪৫ হি. (১৪১৪-১৪৪১ খ্রি.)
৪৯.	৩য় মুসতাকফি বিল্লাহ আবুর রবি সুলায়মান	:	৮৪৫-৮৫৪ হি. (১৪৪১-১৪৫১ খ্রি.)
৫০.	২য় কায়িম বি আমরিল্লাহ আবুল বাকা হামযা	:	৮৫৪-৮৫৯ হি. (১৪৫১-১৪৫৫ খ্রি.)
৫১.	২য় মুসতানজিদ বিল্লাহ আবুল মাহাসিন ইউসুফ	:	৮৫৯-৮৮৪ হি. (১৪৫৫-১৪৭৯ খ্রি.)
৫২.	২য় মুতাওয়াককিল আলাল্লাহ আবুল ইয আবদুল আজিজ	:	৮৮৪-৯০৩ হি. (১৪৭৯-১৪৯৭ খ্রি.)
৫৩. (ক)	মুসতামসিক বিল্লাহ আবুস সবর ইয়াকুব	:	৯০৩-৯১৪ হি. (১৪৯৭-১৫০৮ খ্রি.)
৫৪. (ক)	৩য় মুতাওয়াককিল আলাল্লাহ মুহাম্মাদ	:	৯১৪-৯২২ হি. (১৫০৮-১৫১৬ খ্রি.)
৫৩. (খ)	মুসতামসিক বিল্লাহ আবুস সবর ইয়াকুব	:	৯২২-৯২৩ হি. (১৫১৬-১৫১৭ খ্রি.)
৫৪. (খ)	৩য় মুতাওয়াককিল আলাল্লাহ মুহাম্মাদ	:	৯২৩-৯২৩ হি. (১৫১৭-১৫১৭ খ্রি.)

বি. দ্র. ১

ইরাককেন্দ্রিক আব্বাসি খলিফাগণের মধ্যে ১৪, ১৯, ২১, ২২, ২৪ ও ৩০ নং খলিফা পদচ্যুত হয়েছিলেন, ১২ নং খলিফাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছিল এবং ২৩ নং খলিফা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছিলেন। বাকিরা আমৃত্যু খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন।

মিশরকেন্দ্রিক আব্বাসি খলিফাগণের মধ্যে ৪৪ নং খলিফা তিন মেয়াদে এবং ৪৫, ৫৩ ও ৫৪ নং খলিফা দুই মেয়াদে দায়িত্ব পালন করেন।

বি. দ্র. ২

আব্বাসি সাম্রাজ্যের প্রথম দারুল খিলাফাহ ও রাজধানী ছিল কুফা। প্রথম আব্বাসি খলিফা আস-সাফফাহর হাতে তার অনুসারীগণ ১৩২ হিজরি সনে কুফা নগরীতেই খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করেছিলেন। ১৩৪ হিজরি সনে আস-সাফফাহ আব্বাসি সাম্রাজ্যের দারুল খিলাফাহ বা রাজধানী 'আনবার' নগরীতে স্থানান্তর করেন। এর ১২ বছর পর ১৪৬ হিজরি সনে বাগদাদ নগরীর নির্মাণকাজ সমাপ্ত হলে দ্বিতীয় আব্বাসি খলিফা আল-মানসুর আব্বাসি সাম্রাজ্যের দারুল খিলাফাহ বাগদাদে স্থানান্তর করেন। তখন থেকে ৬৫৬ হিজরি সন পর্যন্ত সুদীর্ঘ পাঁচ শতাব্দী বাগদাদই ছিল আব্বাসি সাম্রাজ্যের রাজধানী। অবশ্য এ সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে দু-বার দারুল খিলাফাহ বাগদাদের বাইরে ছিল। প্রথমবার সপ্তম আব্বাসি খলিফা আল-মামুন তার খিলাফত আমলের প্রথম ছয় বছর মার্ভে অবস্থান করে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছিলেন। ২০৪ হিজরি সনে তিনি বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন এবং এরপর থেকে বাগদাদকেই সাম্রাজ্যের রাজধানী নির্বাচিত করেন। দ্বিতীয়বার অষ্টম আব্বাসি খলিফা মুতাসিম ২২১ হিজরি সনে (৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দে) সামাররা নগরীর পত্তন করেন এবং আব্বাসি খিলাফতের রাজধানী বাগদাদ হতে সামাররায় স্থানান্তর করেন। তখন থেকে সামাররাই ছিল

আব্বাসি সাম্রাজ্যের দারুল খিলাফাহ। অবশেষে ১৫ নং আব্বাসি খলিফা মুতামিদ (শাসনকাল : ২৫৬-২৭৯ হিজরি) তার শাসনামলের শেষদিকে পুনরায় দারুল খিলাফাহ বাগদাদে স্থানান্তর করেন।

অপরদিকে মিশরকেন্দ্রিক আব্বাসি খলিফাগণের সকলের দারুল খিলাফাহ ছিল কায়রো নগরী।

।। দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত ।।

ইতিহাসশাস্ত্রের ইসলামি গুরুত্ব

ইতিহাসশাস্ত্রের ইসলামি গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, অতীতের বিভিন্ন জাতির ঘটনাবলি কুরআনের প্রধান পাঁচটি আলোচ্য বিষয়ের অন্যতম। তবে আল-কুরআনের বর্ণনাভঙ্গি ও উপস্থাপনশৈলী অত্যন্ত অভিনব ও স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। কুরআনে অনেক ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণের পরিবর্তে খণ্ড খণ্ড অংশ বিভিন্ন কুরআনি বক্তব্যের অনুবর্তীরূপে উপস্থাপিত হয়েছে। বস্তুত এই অভিনব উপস্থাপনশৈলীর মাধ্যমে কুরআন আমাদেরকে ইতিহাসের আসল গুরুত্ব ও সার্থকতা কী—তা বুঝিয়ে দিয়েছে।

আল-কুরআন বলতে চায়—ইসলাম ও মানবজাতির কাছে নিছক কাহিনি হিসাবে বিগত জাতির ঘটনাবলির কোনোই আবেদন ও গুরুত্ব নেই; বরং চিন্তার মাধ্যমে পরিণাম ও পরিণতি থেকে শিক্ষাগ্রহণ ও উপদেশ লাভই হলো ইতিহাসের আসল উদ্দেশ্য ও মূল সার্থকতা। বিগত জাতির সৎকর্মের শুভ পরিণাম দেখে মানুষ অনুপ্রাণিত হবে এবং মন্দের মন্দ পরিণাম দেখে সতর্ক হবে; সেই সঙ্গে যুগের আবর্তন-বিবর্তন ও উত্থান-পতন দেখে মহাপ্রজ্ঞার অধিকারী আল্লাহর অসীম কুদরতে বিশ্বাসী হবে। তাহলেই সার্থক হবে ইতিহাসের উদ্দেশ্য।

— মাকামে সাহাবা
মুফতি মুহাম্মাদ শফি রহ.
(অনুবাদ : মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ দা. বা.)

B0070
ISBN
9 789848 012604